সাহিত্য

গল্পসম্ভার

ভবানী মুখোপাধ্যায়

পরিচয় পাবলিশার্স

প্রথম প্রকাশ :

৭ই সেপ্টেম্বর, '৬৫ ইং

প্রকাশক :

পরিচয় পাবলিশার্স

৩/১, নফর কোলে রোড,

কলিকাতা-১৫

মুদ্রাকর :

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নিরুপমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

৩/১, নফর কোলে রোড,

কলিকাতা-১৫

সূচিপত্র

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৯	কৃষ্ণমতী
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৬	চন্দ্রালোকে
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার	৪১	চৌকিদার
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৪৬	নূতন বাড়ি
জলধর সেন	৬৫	পাগল
বিজয়চন্দ্র মজুমদার	৭১	চপলা
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	৭৯	যুদ্ধ ও সন্ধি
শৈলেশচন্দ্র মজুমদার	৮৫	ইন্দু
যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	৯৪	আগন্তুক
দীনেন্দ্রকুমার রায়	১০২	বিদায়
সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৯	জলাঞ্জলি
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	১১৬	তীর্থের পথে
সরলাবালা দাসী	১২২	সঙ্গিনী
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	১৩১	আদরিনী
সরোজনাথ ঘোষ	১৪১	কুলরক্ষা
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৪৯	অনুপমার প্রেম
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১৬৮	ঋণ-পরিশোধ
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৫	মধুস্রবা
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৭৮	প্রতিশোধ
নিরুপমা দেবী	১৮৭	ব্রত-ভঙ্গ
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৯৭	নীরা
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	২০৫	জাপানি গল্প
গিরিবালা দেবী	২১৩	চিত্রলেখা
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২২০	পরাজয়
নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য	২২৭	তিনুর বুদ্ধি

সাহিত্য।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত।

প্রথম বর্ষ

১২৯৭।

কলিকাতা।

৩ নং বিডন স্কোয়ার, নূতন কলিকাতা প্রেস,

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিহারীলাল দাস কর্তৃক মুদ্রিত

১২৯৭।



সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি



সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য পত্রিকার কয়েকজন লেখক



জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর



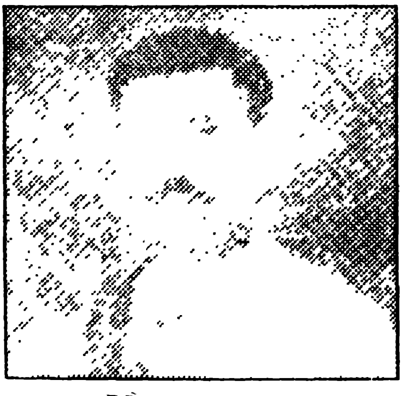
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার



নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত



চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্য পত্রিকার কয়েকজন লেখক



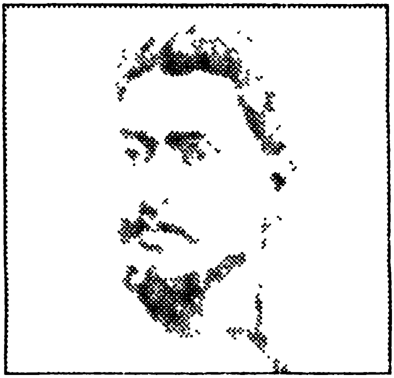
পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



শৈলেশচন্দ্র মজুমদার



জলধর সেন



হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ



উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



নিরুপমা দেবী

সাহিত্য পত্রিকার কয়েকজন লেখক



গিবিবালা দেবী



দীনেন্দ্রকুমাব রায়



প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায



সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুব



ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায



বিজযচন্দ্র মজুমদার

ভূমিকা

আমাদের সাহিত্য কম সমৃদ্ধ নয়। বাংলা সাহিত্যের এই সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে সাময়িকপত্রের সুগভীর অবদান, উজ্জ্বল ভূমিকা। বাংলা সাহিত্য বরাবরই সাময়িকপত্র-নির্ভর। লেখক তৈরি, সৎ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা, এমনকি পাঠকরুচি শোভন-সুন্দর করে তোলার ক্ষেত্রে সাময়িকপত্রের গুরুদায়িত্ব রয়েছে। এই গুরুদায়িত্ব যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই পালন করা হতো, এখনও কম বেশি পালন করা হয়। প্রসঙ্গত ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরের কথা বলা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যে প্রভাকরের প্রভাব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তা বঙ্কিমচন্দ্রের এক মন্তব্য থেকে উপলব্ধি করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'বাংলা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু একদিন প্রভাকর বাংলা সাহিত্যের হর্তাকর্তা বিধাতা ছিলেন।'

প্রভাকর প্রকাশের তেরো বছর আগে, ১৮১৮-তে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের উদ্যোগে বাংলাভাষার প্রথম পত্রিকা দিগ্‌দর্শন প্রকাশিত হয়। সেই শুরু—এক-এক করে বেরিয়েছে অনেকানেক পত্রিকা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৮ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত বিরাশি বছরের যে পত্রিকা-বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, সেই বিবরণে সহস্রাধিক পত্রিকার নামোল্লেখ রয়েছে। উল্লিখিত সহস্রাধিক পত্রিকার অধিকাংশই নতুনত্বের বার্তাবহ নয়, পত্রিকা প্রকাশের প্রবহমানতা বজায় রেখেছে মাত্র। এরই মাঝে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তও কিছু আছে। কয়েকটি পত্রিকা স্বকীয়তায়, নিজস্বতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। চিন্তার প্রসারতা ও স্বচ্ছতার জন্য সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্থায়ী ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছে।

জন ক্লার্ক মার্শম্যানের দিগ্‌দর্শন ও সমাচার দর্পণের কাল পেরিয়ে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের সমাচারচন্দ্রিকা, তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সোমপ্রকাশ, বিহারীলাল চক্রবর্তীর পূর্ণিমা, প্যারীচাঁদ মিত্রের মাসিক পত্রিকা, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের অবোধবন্ধু, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রহস্য সন্দর্ভ। এগুলি সবই ঊনবিংশ শতাব্দীর ছ'য়ের দশকের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

নদী ছুটতে-ছুটতে বাঁক নেয়, সাহিত্যও তেমনই বাঁক নেয়, নতুনতর পথ খুঁজে পায়। সাতের দশকের প্রথম দিকে, ১৮৭২-এ প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শন, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায়। বঙ্গদর্শন জন্মলগ্ন থেকেই ব্যতিক্রমী। পত্রিকাটির অনন্য-সাধারণত্বের কথা সুবিদিত।

প্রথম পর্যায়ের বঙ্গদর্শন দীর্ঘজীবী হয়নি। ১৮৭৬-এ বন্ধ হয়ে যায়। পরের বছর, ১৮৭৭-এ প্রকাশিত হয় ঠাকুরবাড়ির ভারতী। প্রায় ছেচল্লিশ বছর, ১৯২৩ পর্যন্ত, প্রকাশিত হয়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সম্পাদনায় সাহিত্য প্রকাশিত হয় ১৮৯০-এ। পরের বছর ঠাকুরবাড়ি থেকে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় সাধনা। ভারতী-র প্রথম সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথের পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রনাথ। ভারতী ও সাধনা দুটি পত্রিকাই কিছুকাল সম্পাদনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সাধনা দীর্ঘজীবী হয়নি, বছর চারেক বেঁচেছিল। দীর্ঘায়ু ভারতী ও সাহিত্য একই বছরে, ওই ১৯২৩-এ, বন্ধ হয়। ভারতী ও সাহিত্য সমসাময়িক এই দুটি সাময়িকপত্র একই ধারায় প্রবাহিত হয়নি। ভিন্নতর ধারায় প্রবাহিত পত্রিকা দুটি প্রথম থেকেই স্বাতন্ত্র্যে, নিজস্বতায় উজ্জ্বল। ভারতীতে সঙ্গত কারণেই প্রাধান্য পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রময় ভারতী।

অপর দিকে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির রবীন্দ্র-বিরোধিতা সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে এসবও মূল্যবান। ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

প্রদীপ জ্বালানোর আগে থাকে সলতে পাকানোর পর্ব। সাহিত্য প্রকাশের উৎস লুকিয়ে রয়েছে সাহিত্য কল্পদ্রুমে। ১৮৮৯ সালের জুলাইতে (শ্রাবণ, ১২৯৬) পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ৩, বিডন স্কোয়ার থেকে প্রকাশিত সাহিত্য কল্পদ্রুমের সম্পাদনা করতেন শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী ছিলেন উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পরবর্তিকালে বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সারস্বতসমাজে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

সাহিত্য কল্পদ্রুমের সম্পাদনাকর্মে নানা শিথিলতা ছিল। দ্বিতীয় সংখ্যা বিলম্বে যুগ্মসংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়। খুব সঙ্গত কারণেই সম্পাদক শিবাপ্রসন্নর কাজে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কয়েক সংখ্যা পর, মাঘ ১২৯৬ থেকে, সম্পাদক পরিবর্তন করেছেন তিনি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি পেয়েছেন সম্পাদনার দায়িত্ব। সুযোগ্য ব্যক্তির হাতেই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, যথার্থ নির্বাচন, অচিরেই তা প্রমাণিত হয়।

সুরেশচন্দ্রের একটি রচনা থেকে সাহিত্য সম্পাদনার প্রেক্ষাপটটি জেনে নেওয়া যেতে পারে। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হওয়ার পর এক স্মৃতিমিশ্রিত রচনায় সুরেশচন্দ্র পুরানো সেই দিনের কথা স্মরণ করেছেন। উপেন্দ্রনাথ প্রয়াত হন ১৭ চৈত্র, ১৩২৫। রচনাটি প্রকাশিত হয় সাহিত্যের পরবর্তী সংখ্যা বৈশাখ, ১৩২৬-এ। সুরেশচন্দ্র লিখেছেন, 'শিবাপ্রসন্নবাবু চারি-পাঁচ মাস সাহিত্য কল্পদ্রুমের সম্পাদক ছিলেন। তাহার পর তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন। বোধহয় অগ্রহায়ণ মাসে সাহিত্য কল্পদ্রুম আমার চোখে পড়ে, এবং আমি উপেনবাবুর সহিত পরিচিত হই। উপেন্দ্রবাবুর অনুরোধে, এবং বর্তমান পাটনা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল, আমার অগ্রজতুল্য সুহৃৎ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহের প্রেরণায়, আমি সাহিত্য কল্পদ্রুমে-র সম্পাদকের পদ গ্রহণ করি। আমার সহিত কল্পদ্রুমের কোনও আর্থিক সম্বন্ধ ছিল না। প্রথম বর্ষের সাহিত্য কল্পদ্রুম নয় মাসে সমাপ্ত হয়। চৈত্র মাসে প্রথম খণ্ড শেষ করিয়া আমি বৈশাখ হইতে বর্ষ-গণনার ও নাম পরিবর্তনের ব্যবস্থা করি, এবং কল্পদ্রুম বর্জন করিয়া সাহিত্য নাম রাখি।'

সূচনা-পর্যায়ে উপেন্দ্রনাথ সাহিত্যেরও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। অচিরেই তিনি 'সাহিত্যের স্বত্ব ও স্বামিত্ব' ত্যাগ করেছেন। ১২৯৮ থেকে স্বত্বের অধিকারী হয়েছেন সুরেশচন্দ্র। সাহিত্যের প্রতি তাঁর যে সুগভীর ভালোবাসা ছিল, সেই ভালোবাসা কখনও ভাঁটার টান লক্ষ করা যায়নি। সুরেশচন্দ্র ওই রচনায় তেমনই এক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন : 'গত বৎসর কাগজের অভাবে সাহিত্য বন্ধ হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। শত কার্যে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিয়াও উপেন্দ্রনাথ সাহিত্যের জন্য কাগজের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সাহিত্য ও তাহার সম্পাদক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।'

মহতী উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্য-র আত্মপ্রকাশ। প্রথম সংখ্যায় সূচনা-অংশে লেখা হয়, 'বাংলা সাহিত্যের সেবার জন্য, সাহিত্য-র জন্ম হইল। জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর, সাহিত্যে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।' এই মহতী উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্যে-র প্রথম সংখ্যা (এপ্রিল ১৮৯০, বৈশাখ ১২৯৭) ৫৪ কলেজ স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্র থেকে জানা যায়, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য-র প্রথম সংখ্যাটি ৩ নং বিডন স্কোয়ারে অবস্থিত 'নূতন কলিকাতা যন্ত্রে' মুদ্রিত হয়েছিল। মুদ্রক ছিলেন বিহারীলাল দাস।

দ্বিতীয় বর্ষে উপেন্দ্রনাথ স্বত্বাধিকার ত্যাগ করার পর পত্রিকার কার্যালয়ও পরিবর্তিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কার্যালয় হিসাবে দুটি ঠিকানা মুদ্রিত হয়েছে : ২৫ বৃন্দাবন মল্লিক লেন ও ৩৮ শিবনারায়ণ দাস লেন। দ্বিতীয় বর্ষে পত্রিকার আকার-আয়তনও বাড়ে।

পাঠকমহলে সমাদর-স্বীকৃতিলাভ ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের ফলেই এই পরিবর্তন, আকার-আয়তন বৃদ্ধি সম্ভব হয়। প্রথম বর্ষের শেষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'দ্বিতীয় বর্ষের বিজ্ঞাপন'টি ছিল এই রকম, 'দ্বিতীয় বৎসরে সাহিত্যের আকার বর্ধিত হইতেছে, সাহিত্য ডিমাই পাঁচ ফর্মা ছিল, ছয় ফর্মা হইবে। কিন্তু মূল্য বাড়িল না। শহর, কি মফস্বল, সর্বত্রই অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে সাহিত্য পাঠান হইবে না।'

সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি খ্যাতনামা লেখককুলের রচনা সংগ্রহে বেশি তৎপর না হয়ে প্রথম থেকেই নব্য লেখকদের প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। পত্রিকাটিকে ঘিরে একটি লেখকগোষ্ঠী তৈরি করতে চেয়েছিলেন তিনি। নিজস্ব লেখকগোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারলে পত্রিকার ভাবাদর্শ রক্ষা করা অনেক সহজ হয়ে ওঠে। তাই পত্রিকার সূচনালগ্নে সুরেশচন্দ্র 'শিক্ষিত যুবকগণকে এই নূতন সাহিত্যের আসরে আহ্বান' করেছিলেন। আন্তরিক আহ্বানে সাড়া মিলেছে যথেষ্ট। খ্যাতনামা লেখকদের পাশাপাশি স্বল্পখ্যাত ও অখ্যাত লেখকদের সহাবস্থান পত্রিকাটিকে স্বতন্ত্র-রূপ দিয়েছে। প্রথম বর্ষের শেষে সগর্বে জানানো হয়েছে, 'প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখকগণের মধ্যে অনেকে সাহিত্যে লিখিয়াছেন, আর বোধ হইতেছে, আমাদের একটি উদ্দেশ্য সফল হইবে,— অনেক নূতন লেখক সাহিত্যে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন . ।'

অনেক লেখার ভেতর থেকে প্রকৃত ভালো লেখাটি নির্বাচন করা, প্রয়োজনে পরিবর্তন-পরিমার্জন, এসব সহজ কাজ নয়। সুরেশচন্দ্র সম্পাদনার এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতেন অনায়াস-দক্ষতায়। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চলমান জীবন' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে সুরেশচন্দ্র সম্পাদন-দায়িত্ব পালন করতেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি জানিয়েছিলেন, 'সাহিত্য-এর জন্য যে সমস্ত লেখা আমার কাছে আসে, সবগুলিই মন দিয়ে পড়তে হয়। নির্বাচনও কঠিন ব্যাপার। আর যে সব রচনার মধ্যে বস্তু আছে অথচ প্রকাশের ত্রুটিতে তা দোষদুষ্ট, সে সব ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করি লেখককে ডেকে তার ত্রুটি বুঝিয়ে দিতে। আমার মনে হয়, এমনি করেই অনেক কাঁচা মাটি থেকে পাকা সাহিত্যিক তৈরি করা যায়।'

সুরেশচন্দ্রের এই প্রয়াসে কোনো ফাঁকি ছিল না। ফলে বহু সম্ভাবনাময় লেখক আলোকিত হয়েছেন। সাহিত্যকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। সুরেশচন্দ্র অবশ্য সৃজন- মূলক রচনার তুলনায় গবেষণামূলক প্রবন্ধের বেশি পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। প্রবন্ধের প্রতি সাহিত্যের বাড়তি আগ্রহ-অনুরাগ ছিল, তা যে কোনও একটি সংখ্যার সূচিতে চোখ বোলালেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রসিদ্ধ প্রাবন্ধিকদের পাশাপাশি নব্য প্রাবন্ধিকের বলিষ্ঠ রচনাটিও সাহিত্যে সমান গুরুত্ব পেয়েছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, গিরিশচন্দ্র রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ সোম, নিখিলনাথ রায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, মন্মথনাথ ঘোষ, রজনীকান্ত গুপ্ত, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রাণ গুপ্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও হরিসাধন মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-র পাতায় অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধগুলি বিষয় বৈচিত্র্যে অনন্য। সুরেশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি যে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত ও বিস্তৃত ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান, এমনকী বানান প্রসঙ্গেও প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে। ভাদ্র, ১৩১৮ তে 'বানান সমস্যা' নিয়ে লিখেছিলেন ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্যে বিজ্ঞান নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 'ভূ-কম্পন তত্ত্ব' থেকে শুরু করে 'শক্তির অপচয়'—এমনতর বহু কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় নিয়ে লিখেছেন জগদানন্দ রায়। বিবিধ-বিচিত্র বিষয়, 'মঙ্গলগ্রহের জীব' প্রসঙ্গে প্রবন্ধ রচনা সেকালের বিচারে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই প্রবন্ধটিরও রচনাকার জগদানন্দ রায়। 'বৈজ্ঞানিক সার সংগ্রহ' শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান-ফিচার আষাঢ় ১৩০১ থেকে প্রায় নিয়মিত বেশ কিছুকাল লিখেছেন

তিনি। সাহিত্যের পাতায় জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরাও লিখেছেন।

চিত্রকলা সম্পর্কে সুরেশচন্দ্রের অপরিসীম আগ্রহ ছিল। 'চিত্রশালা' নামাঙ্কিত বিভাগে ভারতীয় ও ইউরোপীয় চিত্রকলা সংক্রান্ত বহু আলোচনা প্রকাশ করেছেন। ১৩০০ সালের বৈশাখ সংখ্যা থেকে শুরু হয় আরেকটি নিয়মিত বিভাগ—'সহযোগী সাহিত্য', নিরবচ্ছিন্নভাবে পত্রিকার অন্তিম সংখ্যা পর্যন্ত তা প্রকাশিত হয়েছে। বিষয় নির্বাচন, লেখা তৈরি—এই বিভাগের যাবতীয় দায়িত্ব দীর্ঘকাল সম্পাদক স্বয়ং পালন করেছেন। ১৩১৭ সাল থেকে সহযোগী সাহিত্য বিভাগে রচনার সঙ্গে লেখক-নামও মুদ্রিত হতো। সেই সময় থেকে শুধু সম্পাদক নন, পত্রিকাগোষ্ঠীভুক্ত সরোজনাথ ঘোষ, অনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী, মুণীন্দ্রনাথ ঘোষ বা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখকরাও লিখেছেন। এই বিভাগে প্রকাশিত দেশি-বিদেশি পত্রিকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে লেখা রচনাগুলিতে সাহিত্য-সমাজ-ধর্ম, কখনও বা রাজনৈতিক প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। বিশিষ্টজনের কোনও সাফল্য বা প্রয়াণকে কেন্দ্র করে তাঁকে নিয়েও আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য সাহিত্যকেন্দ্রিক আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। সূচনাকালে এই বিভাগ সংযোজনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়, 'রাজনীতি অপেক্ষা সাহিত্যই যে আমাদের সবিশেষ লক্ষ্য হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।'

সাহিত্যে গ্রন্থ-সমালোচনা নিয়মিত ছাপা হতো। অধিকাংশই বিশদ-বিস্তারিত নয়, 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'। কোনও লেখকের প্রয়াণ-সংবাদের সঙ্গে ছবি ছাপা স্বাভাবিক ঘটনা। সাহিত্যের সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় তো বটেই, পরবর্তিকালেও এই রীতি অনুসৃত হয়েছে। সেই সময়ের বিচারে বিস্ময়কর, সাহিত্যে জীবিত লেখকদের ছবি অজস্র ছাপা হয়েছে। প্রমীলা নাগ (শ্রাবণ ১৩০৫) বা চন্দ্রনাথ বসুর (পৌষ ১৩০৬) মতো বহু বিস্মৃত লেখকের ছবি জীর্ণ সাহিত্যের পাতায় লুকিয়ে রয়েছে।

সাহিত্যে প্রথম থেকেই প্রবন্ধের প্রাধান্য, শুধু প্রবন্ধ নয়, ছোটগল্প প্রকাশেও সম্পাদক সুরেশচন্দ্র যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। কবিতা প্রকাশে অবশ্য তাঁর তেমন আগ্রহ লক্ষ করা যায়নি। বলা যায়, কিঞ্চিৎ নির্লিপ্ত-উদাসীন ছিলেন। সমকালের প্রধান কবিরা অনেকেই সাহিত্যে লেখেননি। কয়েকজন সুনির্দিষ্ট কবির কবিতাই ঘুরে-ফিরে ছাপা হয়েছে। সমকালের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়াল, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও দেবেন্দ্রনাথ সেন বহু কবিতা লিখেছেন। কিছু লিখেছেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। প্রমীলা নাগ, রমণীমোহন ঘোষ বা মুণীন্দ্রনাথ ঘোষের মতো অপ্রধান কবিরা কেউ-কেউ প্রায় নিয়মিত লিখেছেন। ১৩১৫-তে সারা বছরে। মুণীন্দ্রনাথের কবিতা ছাপা হয়েছে সতেরোটি। কোনও-কোনও সংখ্যায় যে তাঁর একাধিক কবিতাও ছিল, তা আর বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। নাট্য-বিষয়ক প্রবন্ধ সাহিত্যে কদাচিৎ ছাপা হলেও কখনও নাটক ছাপা হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বেশ কিছু ধারাবাহিক প্রবন্ধ সাহিত্যে ছাপা হয়েছে। যেমন, গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ আঠেরো কিস্তিতে লিখেছেন 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়'। এটি একটি উদাহরণ মাত্র। এমন দৃষ্টান্ত আরও আছে। ধারাবাহিক প্রবন্ধ ছাপা হলেও ধারাবাহিক উপন্যাস খুব বেশি ছাপা হয়নি। জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'ন্যায়রত্নের নিয়তি', শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'প্রতিশোধ' বা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাধুরী'-র মতো কয়েকটি উপন্যাস ছাপা হয়েছে। দীর্ঘায়ু সাহিত্যে প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্তই সামান্য। আসলে প্রথম থেকেই প্রবন্ধের প্রতি সুরেশচন্দ্রের বেশি মনোযোগ। প্রবন্ধের পরই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে ছোটগল্প। বিশুদ্ধ ছোটগল্পের পাশাপাশি আখ্যানধর্মী লেখাও বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন তিনি।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি নিজেও গল্প-লেখক হিসাবে সমকালে প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন। তাঁর

অধিকাংশ গল্পই সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক বা আধা-ঐতিহাসিক গল্প রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অবশ্য তাঁর গল্পে বিষয়-বৈচিত্র্য যথেষ্ট লক্ষ করা যায়। শোকবিজয় ও লালসা ও সংযমের মতো বৌদ্ধকাহিনি নির্ভর গল্প যেমন লিখেছেন, তেমনই আবার প্রভা-র মতো বিশুদ্ধ প্রেমের গল্পও লিখেছেন। সুরেশচন্দ্রের লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্ততা। অকারণে দীর্ঘ নয়, এমনকী নায়ক-নায়িকার নাম-নির্বাচনেও এই সংক্ষিপ্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই তাঁর নায়কের নাম হয়—হেম, নায়িকা—প্রভা। সাহিত্যের ১৩০৬ ভাদ্র সংখ্যায় 'সহযোগী সাহিত্য' পর্যায়ে ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গ তিনি লিখেছিলেন, 'আমাদের দেশে এখন বক্তৃতা মঞ্চে রসালো ছোটগল্প শুনিতে পাই। সে আশার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু আবার যখন দেখি, আমাদের যে ছোটগল্প সদা-সর্বদা দেখিতে পাই, তাহার প্রধান দোষ অতিবিস্তৃতি, তাহাতে কেবলই ফেনা, তখন বড় আশঙ্কা হয়।'

নিজে গল্প-লেখক, সমালোচকও বটে, ফলে ছোটগল্প সম্পর্কে সুরেশচন্দ্রের ধারণা ছিল স্পষ্ট। বিদেশি সাহিত্য নিয়ে তাঁর সুগভীর পড়াশোনা ছিল। ছোটগল্পের যাঁরা বড় লেখক, তাঁদের গল্প অনুবাদ করিয়ে সাহিত্যে প্রকাশ করতেন নিয়মিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—এঁরা কেউ একটি, কেউ বা একাধিক গল্পের অনুবাদ করেছেন। এক সময়ে অনুবাদের কাজটি নিয়মিত করতেন সরোজনাথ ঘোষ। নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় সাহিত্যের পাতায় প্রথম অনুবাদ-গল্প লেখেন। পরে এই কাজটি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে নিরন্তর করেছেন সরোজনাথ ঘোষ।

সুরেশচন্দ্র বড় আন্তরিকভাবে অনুবাদ-গল্প প্রকাশে এগিয়ে এসেছিলেন। নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুবাদ-গল্প প্রকাশ করেছেন। নলিনীকান্ত চক্রবর্তীকে লেখা এক চিঠিতে (সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩২৮) এ-বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন, 'আমি রক্ষণশীল, কিন্তু বিদেশি ভাষায় রচিত সুন্দর ভাবপূর্ণ কবিতা প্রবন্ধ ও গল্পাদি যে বাংলা ভাষায় রচিত হয়, ইহাও আমার একান্ত ইচ্ছা—কিন্তু অনুবাদের ভাষা খাঁটি বাংলাভাষা হওয়া চাই। এজন্য আমি মাঝে-মাঝে সাহিত্যে বিদেশি গল্পের অনুবাদ ছাপিয়া থাকি।'

বিদেশি গল্প বাংলাভাষায় বাঙালির হাতে পৌঁছে যাওয়ার ফলে ভালো গল্পের যেমন পাঠক তৈরি হয়েছে, তেমনই ভালো গল্প লিখতেও লেখকরা অনেকে প্রয়াসী হয়েছেন। সাগরপারের সোনালি ফসল, সমৃদ্ধ ছোটগল্পের হদিশ পেয়ে বাংলা গল্পের রচনাধারা যে উন্নত হয়েছে, তা-নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বাংলা ছোটগল্পের বিকাশ ও বিস্তারের কালে সুরেশচন্দ্রের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-নিয়ে কোনও আলোচনা হয় না।

বিদেশি গল্পের দরজা-জানলা খুলে যাওয়ার ফলে সাহিত্যে প্রকাশিত মৌলিক গল্পগুলি সহসা পরিবর্তিত, আধুনিক হয়ে উঠেছে, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। অনুবাদ-গল্প নিয়মিতভাবে সাহিত্যে ছাপা শুরু হয় ১৩১৭ সাল নাগাদ।

অধুনা বিস্মৃত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য সাহিত্যে বহু স্মরণীয় গল্প লিখেছেন। গড্ডলিকা প্রবাহে সামিল না হয়ে সতত তাঁরা নতুনতর বিষয়-ভাবনায় ভাবিত হয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথের গল্পে যুবতী-বিধবার প্রেম ও বিবাহের যে ছবি রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী। নারায়ণচন্দ্র তাঁর গল্পে অন্ত্যজজনের দুঃখ-বেদনার বারমাস্য ভাবি মরমী ভাষায় তুলে ধরেছেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, জলধর সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেন্দ্রকুমার রায়, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, সরোজনাথ ঘোষ—অনেকেই সাহিত্যে গল্প লিখেছেন। আখ্যায়িকাধর্মী কাহিনির সংখ্যাও কম নয়। প্রথম দিকের সাহিত্যে আখ্যায়িকাধর্মী

বচনা বেশ কিছু প্রকাশিত হয়েছে। ছোটগল্প আকস্মিক সৃষ্টি হয়নি। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা নগেন্দ্রনাথ গুপ্তব লেখা আখ্যায়িকাগুলির মধ্য দিয়ে বাংলা ছোটগল্পেব প্রাক সূচনাপর্ব সম্পর্কে সহজেই ধারণা করা যায়।

প্রদীপ জ্বালানোর আগে যে সলতে পাকাতে হয়, সেই সলতে পাকানোব কাজটি কবেছিল সাহিত্য। অচিবেই প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়েছে, ছোটগল্পের সোনালি ফসলে এদেশের সাহিত্য-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সুরেশচন্দ্রের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি বঙ্কিম-প্রসঙ্গ নামে একটি গ্রন্থও সম্পাদনা করেছিলেন। বঙ্গদর্শন-সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতেন। কী কবে পত্রিকাব মান বৃদ্ধি হয়, এই বিষযে অভিজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে জানিযেছিল, 'সাহিত্যে-ব দাম তিন টাকা করিযা দাও। যাহাবা দুই টাকা দিতে পাবে, তাহাবা তিন টাকাও দিতে পাবে। যাহাবা তিন টাকা, দুই টাকা, কিছুই দিতে পারে না, তাহাবা কিছুই কেনে না। বঙ্গদর্শনের সমযেও দেখেছি, প্রচাবেও দেখিযাছি, দেখেছি। যে শ্রেণীব লোক গ্রাহক হয়, দুই এক টাকায তাহাদের আসে যায না।'

অভিজ্ঞতার আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র এমন নানান সুপবামর্শ সুবেশচন্দ্রকে দিতেন। সাহিত্য তাঁব পছন্দেব পত্রিকা ছিল। আবেগ-আপ্লুতা কণ্ঠে 'তোমাদের কাগজ তো বেশ হইতেছে' বলেই তিনি থামেন নি, বলেছেন, 'আব লিখিযা উঠিতে পারি না। তোমাদের কাগজখানির সুন্দর ছাপা, দেখিযা লোভ হয়। লিখিতে ইচ্ছা কবে।'

সাহিত্যে (ফাল্গুন ১২৯৯) 'বঙ্কিমচন্দ্র' শিবোনামে অনেকগুলি সনেট ছাপা হয়েছিল। বঙ্কিম-উপন্যাসেব নাযক-নাযিকাদের নিয়ে লেখা এই সনেটগুচ্ছে রচযিতাব নাম ছিল না। সুবেশচন্দ্র চিত্তবঞ্জন দাসেব নাযাযণ পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামাঙ্কিত স্মৃতিকথায কৌতুককর সেই ঘটনাটিব বর্ণনা দিয়েছেন। ঘটনাটি যথেষ্ট উপভোগ্য, সুরেশচন্দ্রেব বচনা থেকে একটু উদ্ধৃতি দেওযা যেতে পাবে, 'একদিন অপবাহ্ণে বঙ্কিমবাবুব সহিত দেখা কবিতে গিযাছি। তখন একটু প্রশ্রয় পাইযাছি। সাহস হইযাছে। মাঝে-মাঝে দেখা কবিতে যাই। বঙ্কিমবাবু সে দিন পূর্বকথিত বৈঠকখানায় বসিযাছিলেন। আমাকে দেখিযাই বলিলেন—এসো ভালো তো? আমি প্রণাম করিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র আমাব বেশ লাগিযাছে।... তুমি তো বেশ কবিতা লিখিতে পাব। একথা তো আগে আমায বলো নাই?'

কবিতার প্রশংসা শুনে সুবেশচন্দ্র অস্বস্তিতে পড়েছেন। কাবণ, সাহিত্যে প্রকাশিত ওই কবিতাগুলি আদৌ তাঁব লেখা নয। এই অস্বস্তি কাটাতে দ্রুত জানিয়েছেন, 'পুঁটিব লেখা।' নামটি শুনে বিস্মিত বঙ্কিম হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'পুঁটি? পুঁটি কে?'

সহজেই এক কৌতুকাবহ সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত সুবেশচন্দ্রেব বচনা থেকে উদ্ধৃতি দেওযা যেতে পাবে, 'আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, সবোজকুমাবী দেবীর লেখা, বাড়িতে পুঁটি বলিযা ডাকে,—মুন্নীব বোন। বঙ্কিমবাবু খুব আনন্দ প্রকাশ কবিলেন, বলিলেন, বেশ ক্ষমতা আছে, বীতিমতো চর্চা বাখলে—ভবিষ্যতে ভালো হবে। তুমি তাকে বলো, আমাব খুব ভালো লেগেছে। আমাব বইগুলি এত ভালো কবে পড়েছে; আমাব উপন্যাসেব নাযক-নাযিকাদের নিয়ে এতগুলি কবিতা লিখেছে, এতে আমাব আনন্দ হবে, এ কিছু বেশি কথা নয; আমার নিজের কথা এমন কবে কেউ লিখলে, খাবাপ হলেও হয়তো ভালো লাগত, কি বলো? সেজন্য তো আমার আহ্লাদ হবেই, আব তা বলতেই বা দোষ কি? কিন্তু আমি সে কথা বলছি না, সত্যই এর কবিতা লেখবার ক্ষমতা আছে, কবিতাগুলি বেশ হযেছে; তুমি তোমাদের পুঁটিকে বলো, আমাব খুব ভালো লেগেছে। আমাব আশীর্বাদ জানিও।'

সাহিত্যসম্রাটেব এই আনন্দ-আহ্লাদ আমাদেব বুঝিয়ে দেয় সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁব

কতখানি স্নেহময় আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। সম্পকটি তেমন আন্তবিক না হলে এভাবে তিনি নিজেকে মেলে ধরতে পারতেন না।

সুরেশচন্দ্রের সামনে ছিল বঙ্গদর্শনের আদর্শ, বঙ্কিমচন্দ্রের পবামর্শ। সাহিত্যেব সাফল্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পরোক্ষ ভূমিকা ছিল, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে লেখাব বাসনা প্রকাশ করলেও সেভাবে লেখেননি। দীনেশচন্দ্র সেন উদ্যোগী হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বর্ষায় মানভঞ্জন' (শ্রাবণ, ১৩০১) প্রকাশ করেছিলেন। নিতান্তই বালক বয়সে লেখা এই বঙ্কিম-কবিতার প্রাবন্তে দীনেশচন্দ্র জানিয়েছেন, 'এই কবিতাটি হুগলী কলেজে অধ্যয়ন কবিবাব সময় বঙ্কিমবাবু রচনা করিয়াছিলেন। ইহা আমার পিতৃদেব ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয়েব হস্তলিখিত নোটবুকে পাইযাছি।' বঙ্কিমচন্দ্র শেষ-জীবনে 'নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী' নামে একটি রচনা সাহিত্যের জন্য লিখতে শুরু করেছিলেন। সে লেখা অবশ্য শেষ করতে পারেননি। আকস্মিক প্রয়াত হন তিনি।

ভারতীগোষ্ঠীর কেউ-কেউ (যেমন, সৌবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়) সাহিত্যে লিখেছেন। এমনকী ঠাকুব পবিবাবেব কোনও কোনও সদস্যও (যেমন, জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ) সাহিত্যে লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথেব স্নেহভাজন কাবও কারও সঙ্গে (যেমন, প্রমথ চৌধুরী) সুরেশচন্দ্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুরেশচন্দ্রের সুসম্পর্ক ছিল না। বরং সমকালে দ্বিজেন্দ্রলালেব মতো সুরেশচন্দ্রও রবীন্দ্র-বিরোধী হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। সাহিত্যে ববীন্দ্রনাথকে নিয়ে বেশ কিছু নিন্দাত্মক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি দু-একটি প্রশংসাসূচক বচনাও অবশ্য ছাপা হযেছে। সাহিত্যেব রবীন্দ্র-বিরোধিতা, নিন্দাত্মক রচনা প্রকাশের সূত্রপাত হয় গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর আক্রমণাত্মক একটি রচনার মধ্য দিযে। বৈশাখ, ১২৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত এই রচনাটি গিরীন্দ্রমোহিনী স্বনামে লেখেননি, লিখেছিলেন 'কোনও সম্ভ্রান্ত মহিলা' নামে।

সুরেশচন্দ্র তো কবির উদ্দেশে নিযমিত নিবন্তর আক্রমণ হেনেছেন। ববীন্দ্র-বচনাকে কেন্দ্র করে তাঁর অধিকাংশ মন্তবাই যুক্তিহীন, হাস্যকব মনে হয়। এমনতর অজস্র আক্রমণাত্মক রচনা থেকে দুটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল! যেমন, ভাবতীতে প্রকাশিত সুখ্যাত রবীন্দ্র-কবিতা 'নববর্ষা' সম্পর্কে সুরেশচন্দ্রের তাৎক্ষানিক প্রতিক্রিযা ছিল এই রকম, 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি কবিতা; —ধেয়ে চলে আসে. গগনে গগনে অতি সুন্দব। কিন্তু অবশিষ্ট ভাষা অত্যন্ত সাধারণ; কৃত্রিমতা দুষ্ট ও কেবল শব্দ ঝঙ্কারে মুখরিত। বিশেষত হৃদয় ময়ূবেব দেখিযা হাস্যরসেব উদ্রেক হয়।' ভারতীতে প্রকাশিত আরেকটি রবীন্দ্র-কবিতা 'সাগরসঙ্গমে' প্রসঙ্গেও সুবেশচন্দ্র এমনই গভীরতাহীন মন্তব্য কবেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে 'রবীন্দ্রবাবু আজকাল ভাবের মায়া কাটাইয়া নিপুণ শিল্পীর মতো কবিতার প্রত্যেক চরণ অনবরত পালিশ করিতেছেন। তাহার ফলে কবিতাগুলি চকচকে ঝকঝকে হইতেছে বটে, কিন্তু ভাব বেচারীর চক্ষে জল দেখিয়াও কি তাঁহার. কবিহৃদয়ে করুণার উদ্রেব হয় না?' সুরেশচন্দ্র তাঁর মাতামহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত রবীন্দ্র-প্রবন্ধটি প্রসঙ্গে অবশ্য প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন। চিবাচবিত নিন্দায় মুখরিত না হয়ে সৎ সমালোচকের মতো যথার্থ বলেছেন তিনি, 'জীবনচবিতেব আলোচনা যে রূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি, উদার সহানুভূতি, তীক্ষ্ণ বিচাব বুদ্ধি, উন্নত বর্ণনা-কৌশল ও পবিণত লিপি কুশলতাব আবশ্যক, ববীন্দ্রবাবুর এই প্রবন্ধ পড়িযা বোধ হয তাঁহার সে সংস্থান যথেষ্ট আছে।'

যে পত্রিকায় চলেছে নিরন্তব রবীন্দ্র-বিরোধিতা, অর্থহীন, যুক্তিহীন আক্রমণই যে পত্রিকা-সম্পাদকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ, সেই পত্রিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন, একথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। সাহিত্যের একেবারে প্রথম দিকে বেশ কয়েকটি ববীন্দ্র-বচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সুরেশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল বা চিত্তরঞ্জন প্রকাশ্যে রবীন্দ্র-বিরোধিতা কবে সম্ভবত নিজেদেবই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠানেব বিরোধিতা হযতো প্রতিষ্ঠাবই এক ভিন্নতব পথ। সুখেব কথা,

জীবন-সায়াহ্নে দ্বিজেন্দ্রলালের মতো তিনিও নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। বেলা শেষের রচনায় কবিকে প্রাপ্য স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

সুরেশচন্দ্র প্রয়াত হন ১৩২৭-এর পৌষ মাসে। সাহিত্য অবশ্য বন্ধ হয়নি। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনায় ১৩৩০-এর বৈশাখ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। সুরেশ-প্রয়াণের পর সাহিত্যের ফাল্গুন-চৈত্র (১৩২৭) সংখ্যায় প্রয়াত সম্পাদকের কর্মধারার, তাঁর দক্ষতা-বিচক্ষণতার যথার্থ মূল্যায়ন করেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। অক্ষয়কুমারের মূল্যায়নে আবেগ রয়েছে সত্য, যুক্তিও কম নেই। তাঁর সেই সুরেশ-মূল্যায়নের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, 'প্রবন্ধ নির্বাচনের কড়াকড়ি 'সাহিত্য'কে এই অসাধারণ গৌরব দান করিয়াছিল। এখন লেখকের সংখ্যা অসংখ্য, বুঝি বা পাঠকের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। এমন দিনে যে কেহ লিখিতেছেন, যাহা ইচ্ছা লিখিতেছেন, বিষয় বিন্যাসে ও বচনবিন্যাসে স্বেচ্ছাচার সমানভাবে প্রশ্রয় লাভ করিতেছে। এমন দিনে প্রবন্ধ নির্বাচন করা যে কত কঠিন, তাহা সাহিত্য সম্পাদককে সর্বদা স্বীকার করিতে হইত। তথাপি দৃঢ়তা তাঁহার রক্ষাকবচ ছিল।... বিদেশের সাহিত্যে যাহা কিছু ভালো বাহির হইত, বিদেশি বর্জনের তুমুল আন্দোলনের দিনেও, তাহা সাদরে সাহিত্যে স্থান লাভ করিত।... সাহিত্যকে অনাবিল রসের আধার করিবার আন্তরিক আকুলতাই সাহিত্য-সম্পাদককে সমালোচনায় সীমাশূন্য, ক্ষমাশূন্য কশাঘাত প্রকাশ কবিতে অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।'

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অভিজ্ঞ ও দক্ষ সম্পাদক। বঙ্গবাসী যেমন এক সময় সম্পাদনা করেছেন, তেমনই বিপরীত আদর্শ, বিপরীত মতের ও পথেব পত্রিকা বসুমতীও সম্পাদনা করেছেন। তাঁর কাজে ছিল পেশাদাবি দক্ষতা। সুরেশচন্দ্র সুদীর্ঘকাল ধবে সাহিত্যের যে চরিত্রটি তৈরি করেছিলেন, তা দক্ষ হাতে রক্ষা করেছিলেন তিনি। পৌষ-মাঘ, ১৩২৭ সংখ্যায় 'আমার কথা' শীর্ষক রচনায় তিনি লিখেছিলেন, 'জানি না এভার বহনের যোগ্যতা আমার আছে কিনা, —আমি সুরেশের সাহিত্য পত্রকে নিষ্কলঙ্ক ও নিরাবিলভাবে রক্ষা করিতে পাবিব কি না!' সন্দেহ নেই যে, এই কাজটি তিনি পরম দক্ষতায় ও সুগভীর নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন। সুরেশহীন সাহিত্যে হারানো সুরের রেশ আশ্চর্য দক্ষতায় ধরে রেখেছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য পত্রিকা থেকে গল্প সংকলনের এই প্রয়াসের মধ্য দিয়ে বাংলা গল্পের সূচনাপর্বটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যাবে। রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের বাইরে দাঁড়িয়ে যাঁরা লিখেছেন, তৎকালে খ্যাতি পেলেও বর্তমানে তাঁরা অনেকেই বিস্মৃত, তাঁদের সম্পর্কেও প্রাথমিক ধারণা লাভ কবা যাবে।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি, চন্দননগর পুস্তকাগার ও বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদেব সহযোগিতা ছাড়াও অশোককুমাব রায়ের সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

সংকলিত গল্পগুলির বানান পুরোপুরি না-হলেও অনেকাংশে আধুনিক করা হয়েছে।

পত্র ভারতীর কর্ণধাব ও কিশোর ভারতীর সম্পাদক সুলেখক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় বইটি যত্ন করে প্রকাশ করলেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। পত্র ভারতীর কর্মীবন্ধুদের সহযোগিতা ভোলার নয়। তাঁদের ধন্যবাদ।

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়



কৃষ্ণমতী

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

।। প্রথম পরিচ্ছেদ ।।

শ্যামসুন্দরের মন্দিরের মাসির সমভিব্যাহারে কৃষ্ণমতী ঝুলন দেখিতে গিয়াছিল। শ্যামসুন্দরের মন্দির অদ্য রাত্রিতে আলোকে উজ্জ্বলিত, কিন্তু দশম-বর্ষীয়া বালিকা কৃষ্ণমতীর প্রবেশমাত্রে মন্দির যেন আরও উজ্জ্বল হইল। দর্শকেরা কৃষ্ণমতীকেই দেখিতে লাগিল, কৃষ্ণমতী যেখানে যায় রূপে আলো করে।

নীলাপুরে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে বড় ধুম। মন্দিরের ভিতরে ঝাড়ের আলো, ছবি ও ফুলেব মালায় সুসজ্জিত; মন্দিরের বাহিবে ছোট-ছোট শিশির আলোতে নীলাপুর গ্রামের অনেকদূর পর্যন্ত রোশনাই হইয়াছিল। মন্দিবের সম্মুখে প্রশস্ত রাস্তার উভয়পার্শ্বে দোকান বসিয়াছে, তাহাও উজ্জ্বলিত। মন্দিরেব ছাদের উপরে চতুর্দিকে বিশ-হাত অন্তরে বড়-বড় লাল নিশান উড়িতেছে। মন্দিরের ফটকের উপরে নহবত খানায় নহবত বাজিতেছে।

অদ্য সন্ধ্যার পর মন্দিরের ভিতরে কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। সুসজ্জিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণে নীলাপুরের ও পার্শ্বস্থ গ্রামের বহুসংখ্যক ভদ্রলোক বসিয়া কীর্তন শুনিতেছেন; মধ্যস্থানে পৃথগাসনে নীলাপুরের জমিদার বংশধর, নীলাপুরের কুলাঙ্গার, শয়তানের অবতার, অষ্টাদশবর্ষীয় শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বাবু বিরাজমান। কীর্তনী সুরূপা নহে, কিন্তু সুগায়িকা। শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধাপ্যারীর প্রথম সন্দর্শন কিরূপে এবং কি অবস্থাতে হইয়াছিল তাহাই কীর্তন করিতেছিল। শ্রোতাবৃন্দ একাগ্রমনে শুনিতেছিল, কিন্তু এই দেবালয়ের অধিকারী জমিদার-পুত্রের মন অন্যদিকে ছিল। গ্রামের কুলাঙ্গনাগণ শ্যামসুন্দর দর্শনের জন্য যে পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল সেই দিকে তাঁহার চক্ষু ছিল। হঠাৎ তিনি উঠিয়া গেলেন।

মন্দিরের বাহিরে বড় গুলজার, মেলা বসিয়াছে, নানা প্রকাব দ্রব্যাদিতে দোকান সাজাইয়াছে; তন্মধ্যে পানের ও ফুলের মালার দোকানে জনতা বেশি। একটা মশলার দোকানে কৃষ্ণমতীর মাসি মশলার দর করিতেছিলেন; কৃষ্ণমতী তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চারিদিক দেখিতেছিল। দশমবর্ষীয়া বালিকা (দেখিতে যেন দ্বাদশবর্ষীয়া) অঞ্চলের কিয়দংশ দ্বারা মাথা ও মুখ আবৃত করিয়া কেবলমাত্র চক্ষু দুইটি বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, হঠাৎ তাহার দৃষ্টি একস্থানে স্থাপিত হইল। সন্নিহিত একটি ফুলের মালার দোকানে পঞ্চদশবর্ষীয় একটি সুকুমার কিশোর বালক ফুলের মালা কিনিতেছিল। কৃষ্ণমতী তাহাকেই একদৃষ্টে দেখিতেছিল। এমন সময়ে কে একজন তাহার পশ্চাৎ হইতে বলিল,—''কৃষ্ণমতী'

'আমি তোমার জন্য শ্যামসুন্দরের প্রসাদী মালা আনিয়াছি এই লও, গলায় পর''। কৃষ্ণমতী ভ্রূভঙ্গি করিয়া মাথার আরও কাপড় টানিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। অসিতকুমারবাবু অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, তবু মালা লইল না। তাহার মাসি উহা দেখিয়া বড় রাগ করিলেন; বালিকা কৃষ্ণমতী জমিদার-পুত্রের অপমান করাতে তাঁহার একটু ভয়ও হইল। কৃষ্ণমতীকে ভৎর্সনা করিতে-করিতে তিনি অন্য মশলার দোকানে গেলেন, কৃষ্ণমতী ধমক খাইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। ইতিমধ্যে সেই অপরিচিত কিশোর বালক তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল—'এই মালা ছড়াটি তোমার জন্য কিনিয়াছি, তুমি ইহা লও''। বলিয়া কৃষ্ণমতীর হাতে উহা দিতে গেল, কৃষ্ণমতী হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। কিন্তু যখন অপরিচিত কিশোর বলিল, 'মালা ছড়াটি না লইলে আমি বড় দুঃখিত হইব, আমি তোমাদের জানি,'' তখন কৃষ্ণমতী আর থাকিতে পারিল না, হাত পাতিয়া মালা লইয়া তাহার অঞ্চলে বাঁধিয়া মাসির নিকেট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল ''মাসি, উনি কে?''

মা। কে—জান না—আমাদের জমিদার-পুত্র অসিতকুমারবাবু।

কৃ। না, না, আমাকে যিনি মালা দিয়া গেলেন।

এই বলিয়া অঞ্চল হইতে একছড়া জুঁই ফুলের গড়েমালা মাসিকে দেখাইল।

মা। ও পোড়ারমুখী, তুমি অসিতকুমারের মালা ত্যাগ করিয়া একজন অজ্ঞাত, অপরিচিত দুষ্ট লোকের মালা লইয়াছ।

কৃষ্ণমতী লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

এই দুই ব্যক্তি কৃষ্ণমতীকে আদর করিয়া মালা দিতে যায় কেন? ইহারা উভয়ে রূপে মুগ্ধ। কৃষ্ণমতী অসামান্য সুন্দরী।

মাসির সহিত কৃষ্ণমতী বাটী ফিরিল, পথিমধ্যে মাসি অতি মৃদু স্নেহব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—''তুমি অসিতকুমারের মালা ত্যাগ করে একজন অপরিচিত লোকের মালা লইলে কেন?'' কৃষ্ণমতী উত্তর করিল,—''কি জানি।'' কৃষ্ণমতী বালিকা, আপনার ভাব বুঝিতে না পারিয়া ওইরূপ উত্তরে দিয়াছিল। মনুষ্যহৃদয় মধ্যে যত প্রকার ক্রিয়া জন্মে, তন্মধ্যে দুই প্রকাব ক্রিয়া জীবনে বড় অশুভকর হয়, প্রথমটি কোনও-কোনও ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিতে হয়; দ্বিতীয়টি কোনও-কোনও ব্যক্তিকে দেখিয়া আবার দেখিতে ইচ্ছা করে। প্রথমটাব নাম ''ঘৃণা'', দ্বিতীয়টার নাম ঠিক বলিতে পারিলাম না। এই দুই ব্যক্তিকে দেখিয়া কৃষ্ণমতীর হৃদয়ে এইদুই প্রকার ক্রিয়া জন্মিয়াছিল। অসিতকুমারকে দেখিয়া ঘৃণা, ও অপরিচিত কিশোরকে দেখিয়া কি একটা সুখানুভব করিযাছিল। সেই জন্য প্রথমের মালা লইল না, দ্বিতীয়ের মালা লইল। এই দুইটি হৃদয়ের ক্রিয়াতে কুসুমকলিকা বালিকা কৃষ্ণমতীর ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপ হইয়াছিল, তাহা এই আখ্যায়িকাতে ক্রমশ প্রকটিত হইবে।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

কৃষ্ণমতী দরিদ্র-কন্যা। বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীনা হইয়া, বিধবা মাসির দ্বারা প্রতিপালিত হয়। তাহার মাসিরও তাহার ন্যায় তিন কূলে কেহ ছিল না। তিনি স্বামীর কিছু সঞ্চিত ধন সুদে খাটাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন ও কৃষ্ণমতীকে প্রতিপালন করিতেন। মৃত্তিকানির্মিত প্রাচীর-বেষ্টিত একখানি মেটে ঘরে দুইজনে বাস করিতেন। কিন্তু এই মেটে-ঘরের প্রতি দেশের লোকের লক্ষ্য ছিল, কেন না এই মেটে-ঘবে অতুল্য রূপরাশি বিরাজ করিত। কৃষ্ণমতীর রূপ দেখিয়া জানানা মিশনের বিবিবা বিনা বেতনে অতি যত্ন সহকারে

তাহাকে শিক্ষা দিতেন। ওইরূপ একজন গুরুমা বাঙালা পড়াইতেন; কৃষ্ণমতী একদিনে ক, খ, শিখিয়াছিল।

কৃষ্ণমতীর বিবাহ সময় উপস্থিত, কিন্তু বিবাহ হয় না। গ্রামের সকল গৃহস্থ ও গৃহিনীর ইচ্ছা যে কৃষ্ণমতীকে পুত্রবধূ করেন। সকল যুবকেব ইচ্ছা যে কৃষ্ণমতীকে বিবাহ করে; কিন্তু দুষ্প্রাপ্য, বহুমূল্য বস্তু কেবল ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের অদৃষ্টেই ঘটে। কৃষ্ণমতীকে পুত্রবধূ করিবার জন্য গ্রামের প্রধান দুই জমিদাবের মধ্যে লাঠালাঠি বাধিবার উপক্রম হইল।

নীলাপুব একটি গণ্ডগ্রাম। উহাতে অনেক ধনী লোকেব বাস ছিল। বহুসংখ্যক বৃহৎ শ্বেত অট্টালিকায় গ্রাম পরিপূর্ণ। উল্লিতি জমিদাবদ্বয় সর্বাপেক্ষা ধনী। একজনের নাম বোহিণীকুমার রায়, অপবের নাম রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। বোহিণীকুমাব বায বুনিযাদী বড় মানুষ, পাঁচ পুরুষে জমিদাব, কিন্তু অশিক্ষিত—চাল-চলন সেকেলে জমিদারেব ন্যায়, আবার তিনি দুঁদে ও দুর্দান্ত জমিদাব ছিলেন। পুত্র-সন্তান না হওযায় ইনি ক্রমে-ক্রমে তিনটি দারপরিগ্রহ কবিবাছিলেন। অবশেষে অনেক যাগ-যজ্ঞের পব কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে তাঁহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছিল। এই পুত্রেব নামকবণ হইল অসিতকুমাব।

গ্রামের দ্বিতীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি বাসবিহাবী বন্দ্যোপাধ্যায। তিনি স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন, সামান্য গৃহস্থের সন্তান, কৃতবিদ্য হইয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া প্রভূত ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় কবিযা স্বদেশে অনেক তালুক-মুলুক খবিদ কবিযা ঐশ্বর্যে রোহিণীকুমার রায়ের সমকক্ষ হইলেন, কিন্তু তিনি কখনও দেশে আসিতেন না, তাঁহাব একজন জ্ঞাতি-ভাই নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যাযকে ম্যানেজাব নিযুক্ত কবিযা তাঁহাকে সকল বিষয়ে তাঁহাব প্রতিনিধি করিয়াছিলেন। রাসবিহারীবাবুব এক স্ত্রী, ও এক পুত্র, নাম বনবিহারী, বড় ভালো ছেলে, ভালোরূপ লেখাপড়া শিখিতেছে। ইতিপূর্বে রাসবিহাবীবাবু সপরিবাবে বাটী আসিযাছিলেন, কৃষ্ণমতীকে দেখিযা বনবিহারীর সহিত বিবাহ দিতে তাঁহাব স্ত্রীর বড় সাধ হইয়াছিল। সেজন্য তিনি ম্যানেজার নবীনবাবুব স্ত্রীকে বিশেষ করিযা অনুরোধ করিযা গেলেন। এদিকে অসতকুমাবের মাতা ও দুই বিমাতা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই মেয়েকে পুত্রবধূ করিয়া ঘরে আনিনে। সেজন্য জমিদাববাবু ও নবীনবাবুব মধ্যে লাঠালাঠি আবম্ভ হইল, সে সকল ঘটনা এ স্থলে বিবৃত কবিবার আবশ্যকতা নাই।

এইরূপ গোলমালে কৃষ্ণমতীব বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসব হইল, কিন্তু দেখিতে যেন চতুর্দশ বৎসর, সে জন্য কৃষ্ণমতীর মাসি বড় গোলে পড়িলেন। আবাব এদিকে দুইজন দেশের বড় লোক কৃষ্ণমতীর জন্য লাঠালাঠি আরম্ভ করিলেন। একবাব ভাবিলেন,—"মেয়েটাকে নিয়ে কাশী পলাইয়া যাই।" কিন্তু তাঁহার একজন মুরুব্বি ছিলেন, তিনি অন্যরূপ পরামর্শ দিলেন। দেবনাথ ঘোষাল অতি প্রাচীন লোক, নিরীহ ভালো মানুষ, হরিনাম জপ কবিয়া কালাতিপাত করিতেন। তিনি বলিলেন,—"তোমাব কৃষ্ণমতী যেমন সুন্দবী ও গুণবতী রাসবিহারীব পুত্রও সেই রূপ গুণবান ও রূপবান। অতি অল্প বয়সে দুইটা পাশ করিয়াছে, দুইটাতে জলপানি পাইয়াছে। আর জমিদারপুত্র অসিতকুমার অপাত্র, তাহাব সহিত বিবাহ হইলে কৃষ্ণমতী চিবদুঃখিনী হইবে, বনবিহারীর সহিত বিবাহ হইলে চিবদিন সুখী হইবে।"

মাসি। তাতো বুঝলুম, কিন্তু রাত্রে যদি আমাদেব ঘরে আগুন দিযা পোড়াইয়া মাবে?

দেব। বটে, বটে, যে দুর্দান্ত জমিদার, সকলি পারে। শুন, তোমাব যদি মত থাকে, তবে অতি শীঘ্র বনবিহারীর সহিত কৃষ্ণমতীর বিবাহ দিবাব বন্দোবস্ত করিব, বিবাহেব পব

তুমি কাশী চলিয়া যাইও। তোমার মেটে-ঘর আমি বিক্রয় করিয়া দিতেছি, তুমি দেনাদারের নিকট কাঁদাকাটা করিয়া তোমার টাকাগুলি আদায় করিয়া লও; বিবাহ গোপনে আমার বাটীতে হবে, বিবাহের পর দিন হইতে তুমি রাসবিহারীর বাটীতে থাকিও, তোমার কেহ অনিষ্ট কবিতে পারিবে না, পরে তাহাদের সহিত কাশী যাইও।

তাহাই হইল। প্রাচীন দেবনাথ নবীনবাবু ম্যানেজারের সহিত দেখা করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিলেন। বিবাহ গোপনে হইবে, কেননা জমিদার কি তাহার পুত্র উহা জানিতে পারিলে, লাঠালাঠি করিয়া বিবাহ বন্ধ করিবে। রাসবিহারীবাবু সপরিবারে বাটী আসিলেন, জমিদার তাঁহার বিরুদ্ধে একটা বড় মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন, সেই উপলক্ষে আসিলেন।

বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। দেবনাথের বিধবা কন্যা কৃষ্ণমতীর মাসিকে বলিল, 'হ্যাঁ—গা, আমি কয়দিন ধবিযা দেখিতেছি বিবাহেব কথা উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণমতীর মুখখানি শুকাইযা যায় কেন—গা?

মাসি বলিলেন,—হ্যাঁ—মা, আমিও উহা লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু কেন তাহা বুঝিতে পারি নাই।

কিন্তু আমরা বুঝিযাছি কেন। সেই যে, ঝুলনযাত্রাব রাত্রে একটি পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর কৃষ্ণমতীকে মালা দিয়াছিল, তাহার মুখখানি কৃষ্ণমতীর হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল, কৃষ্ণমতী যেই মুখখানি ভুলিতে পাবে নাই। বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলে সেই মুখখানি আরও উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত, সেইজন্য কৃষ্ণমতীব মুখ ম্লান হইত। যাহা হউক, বিবাহের দিনে গাত্র-হরিদ্রা ও অন্যান্য কৌলিক কার্যসকলই গোপনে সম্পাদিত হইল। রাত্রে পাত্রকে দেবনাথের বাটীতে গোপনে আনিয়া একটি নিভৃত কক্ষে বিবাহ আরম্ভ হইল, সে ঘবে কেবলমাত্র পাঁচ-ছয়টি স্ত্রীলোক ছিল। কৃষ্ণমতী সাত হাত ঘোমটা দিযা মুখখানি তোলো-হাঁড়ি কবিয়া বিবাহ করিতে বসিল; কিন্তু যখন শুভদৃষ্টিব জন্য যে আচ্ছাদন দ্বারা বর-কনেকে ঢাকিযাছিল উহা উঠাইযা লওয়া হয়, তখন স্ত্রীলোকবা দেখিল কৃষ্ণমতী মৃদু-মৃদু হাসিতেছে। অসাবধানতাবশত ঘোমটা টানিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, পরে আবার সাতহাত ঘোমটা দিয়া বসিল, স্ত্রীলোকেরা আরও দেখিল যে, বর বনবিহারী ওইরূপ হাসিতে-হাসিতে ঘাড় হেঁট করিল। স্ত্রীলোকেরা উহা দেখিযা আশ্চর্য হইল। বর-কনে চোখাচোখি করিযা হাসিল কেন? কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না। বোধহয় পাঠকদিগকে বুঝাইতে হইবে না, এ বব কে। সেই যে কিশোর-বালক ঝুলনযাত্রার রাত্রে কৃষ্ণমতীকে মালা দিয়াছিল, তাহাবি সহিত চোখাচোখি করিয়া কৃষ্ণমতী হাসিয়াছিল। তিনি রাসবিহারীব পুত্র বনবিহারী, আজ তিনিই কৃষ্ণমতীব পাণিগ্রহণ করিলেন। শুভদৃষ্টিব সময় কৃষ্ণমতী তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ঈষৎ হাসিয়াছিল, এবং আনন্দে ঘোমটা টানিতে ভুলিযা গিযাছিল, সেজন্য স্ত্রীলোকেরা তাহাব হাসি দেখিতে পাইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে এ বিবাহ গ্রামে প্রচারিত হইল, অসিতকুমার ক্রোধে আচড়াপিচড়ি কবিতে লাগিল; চাকর-বাকরদের মারধর করিতে লাগিল, সম্মুখে যাহা পাইল তাহাই ভাঙিতে লাগিল। এইরূপে জমিদারবাবুর অনেক ক্ষতি করিল, অবশেষে পিতামাতা ও বিমাতাদের গালি পাড়িতে লাগিল। ক্রমে ক্রোধের শমতা হইলে, বয়স্যদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিল, যেরূপেই হউক কৃষ্ণমতীকে সে কাড়িয়া লইবে।

কিছুদিন পরে রাসবিহারীবাবু সপরিবারে এলাহাবাদে যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণমতীব মাসি তাঁহাদেব সহিত কাশী যাইলেন।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

বহুকালের পর নীলাপুরের লোক কৃষ্ণমতীকে আবার দেখিতে পাইল। দশবৎসর পরে রাসবিহারীবাবু সপরিবারে নীলাপুরের বাটিতে আসিলেন। তাঁহার বর্ষীয়সী জননী পীড়িতা হইয়া এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, নীলাপুরের গঙ্গাতীরে যেন তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই জন্য রাসবিহারীবাবু সপরিবারে নীলাপুরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু জননীর না-এদিক-না ওদিক, মরিবেনও না বাঁচিবেনও না, কেবল শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। সুতরাং রাসবিহারীবাবুকে অনেকদিন নীলাপুরের বাটীতে বাস করিতে হইল। কৃষ্ণমতীকে দেশের লোক দলে-দলে দেখিতে আসিল। তাঁহার এক্ষণে দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই; স্বামী বনবিহারী কৃতবিদ্য হইয়া পিতার সহিত ওকালতি করিয়া যথেষ্ট উপার্জন করিতেছেন। এই দম্পতিকে দেখিয়া সকলেই মনে করিত ইহারাই সুখী। বাস্তবিক যদি কেহ এই পৃথিবীতে সুখী থাকে তবে ইঁহারা দুইজন। কৃষ্ণমতী সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া যে দুঃখিতা, তাহা নহে, সে জন্য তাহার শ্বশুর-শাশুড়ি দুঃখিত। কৃষ্ণমতীকে যে দেখিত সে বলিত,—'কি রূপ গা! এমন রূপ তো কখনও দেখি নাই।'' যাহা হউক, কৃষ্ণমতীর রূপের ও গুণের কথা লইয়া দেশে হই হই পড়িয়া গেল, যেখানে দুই-চারিজন স্ত্রীলোক জমিত সেইখানেই কৃষ্ণমতীর কথা হইত।

একটি মনোহর উদ্যানবাটীতে বয়স্যদিগের সহিত সুরাপান করিতে-করিতে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বাবু কৃষ্ণমতীর রূপের কথা শুনিলেন, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ওষ্ঠাধর দংশন করিতে লাগিলেন। বয়স্যগণ বুঝিল বনবিহারী ও কৃষ্ণমতীর বড় বিপদ, কেননা অসিতকুমারের অসাধ্য কোনও কাজ নাই। কিছুদিন ধরিয়া অসিতকুমার তাঁহার দুইজন প্রিয় বয়স্যের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কি পরামর্শ তাহা কেহ জানিতে পারিল না। ইহার সঙ্গে কৃষ্ণমতীকে একবার দেখিবার বাসনা জন্মিল, তাহার সুযোগও হইল। রামচরণ ঘোষাল তাঁহার পৌত্রীর বিবাহোপলক্ষে রাসবিহারীবাবুর বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে আনিবার চেষ্টা করিলেন, সফলও হইলেন, কেননা তিনি ম্যানেজার নবীনবাবুর শ্যালক। শাশুড়ি ও অন্যান্য পৌরস্ত্রীর সহিত কৃষ্ণমতী অলঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া রামচরণবাবুর বাটী আসিলেন। অসিতকুমার এই সংবাদ তাঁহার গুপ্তচরের মুখে শুনিলেন। তাঁহার একটা বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি স্ত্রীলোক বেশ ধারণ করিতে শিখিয়াছিলেন, তজ্জন্য গোঁফ-দাড়ি রাখিতেন না। রাসবিহারীবাবুর বাটীর মেয়েরা আসিয়াছে, সুতরাং স্ত্রী-আচারের সময়ে অন্তঃপুরে কোনও পুরুষের যাইবার হুকুম ছিল না, কিন্তু অসিতকুমার রমণীবেশে সামান্য অলঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া ঘোমটা টানিয়া যে স্থানে কৃষ্ণমতী বরের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া স্ত্রী আচার দেখিতেছিলেন, তাহারই নিকট দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। কৃষ্ণমতী মুখের কাপড় কিঞ্চিৎ খুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বরকে কেহ কান মলিয়া দিতেছিল, কেহ বা গুম-গুম করিয়া পিঠে কিল মারিতেছিল, তাহা দেখিয়া হাসিতেছিলেন ও সঙ্গিনীদিগকে কি বলিতেছিলেন। অসিতকুমার এইরূপে অনেকক্ষণ কৃষ্ণমতীকে দেখিতে লাগিলেন, পরে স্ত্রী-আচার শেষ হইলে, তিনি আর সে বাটীতে থাকিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু কৃষ্ণমতীকে, দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইলেন, বাটী ফিরিলেন না, দুই-তিনজন বয়স্য লইয়া বাগান-বাটীতে সুরাপান করিতে-করিতে কৃষ্ণমতীর কথা কহিতে লাগিলেন, সে রাত্রে অধিক পরিমাণে সুরাপান করিলেন।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

রাসবিহারীবাবুর বাটীর সদর অন্দরে লোক গিসগিস করিতেছে। বনবিহারী একমাত্র সন্তান, বড় আদরের সন্তান, তাহার জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব হইতেছে। সাতখানা গ্রামের লোক নিমন্ত্রিত, কি ভদ্র কি ইতর সকল শ্রেণীর লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছে; ওই অঞ্চলের যত কাঙাল-গরীব আছে তাহাদের একদিন ভোজন করানো হইবে, ও কিছু-কিছু নগদ ও এক-একখানা শীতবস্ত্র দান করা হইবে। এই উপলক্ষে রাসবিহারীবাবুর বাটীতে একসপ্তাহ ধুমধাম চলিবে, অদ্য হইতে উহা আরম্ভ হইল। অবশেষে একরাত্রি নাচ ও একরাত্রি থিয়েটার হইবে। কিরূপে এই কার্য সম্পাদিত হইল, তাহা এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাতে বিবৃত করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রথম দিবসের রাত্রি সাত-আটটার সময় একটি নিভৃত কক্ষে অনেকগুলি সমবয়স্কা লইয়া কৃষ্ণমতী পান সাজিতেছিলেন, নানা বিষয়ের গল্প চলিতেছিল, কৃষ্ণমতীর গল্পে সকলেই হাসিতেছিল, কথায়-কথায় দুই-একটি বালিকার বিবাহের কথা উত্থাপিত হইল। রঙ্গমতী নামে একটি বধূ জিজ্ঞাসা করিল,—"উদ্ধারিণীর বিয়ে কবে হবে?" জ্যোৎস্নাবতী বলিল,—"তার বিয়ে হবে না।"

রঙ্গ। —কেন?

জ্যোৎ। —টাকা কোথায়? গরীব বিধবার মেয়ে, একটি মাত্র রোজগারে ভাই, কলেতে কাজ করে দশটি টাকা পায়, আপনি খায় আর মা বোনকে খাওয়ায়। একটা ছেলে ওই কলে কাজ করে, সে বিবাহ করতে রাজি হয়েছে বটে, কিন্তু দুশো টাকা চায়।

কৃষ্ণমতী। —কেন? এত টাকা কেন? বর-কনে দুজনে তো গরীব তবে এত টাকা চায় কেন?

জ্যোৎ। —সে যে কুলীন।

কৃষ্ণ। —কুলীন বর ছেড়ে অন্য বরকে দিক না কেন?

জ্যোৎ। —না তা দিবে না। উদ্ধারিণীর বাপ মৃত্যুর সময় তার মাকে বলে গেছে যে মেয়েটাকে অঘরে দিয়ো না।

কৃষ্ণমতী কিছুক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উদ্ধারিণীর মা রমণী মাসি কোথায়?"

জ্যোৎ। —তোমাদেরই বাটীতে এয়েছেন।

কৃষ্ণমতী বাহিরে আসিয়া উদ্ধারিণীর মাতাকে খুঁজিয়া একটি ঘরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যাঁ গা মাসি, উদ্ধারিণীর বিয়ে দিচ্ছ না কেন?" উদ্ধারিণীর মাতা কাঁদিতে-কাঁদিতে সব কথা বলিল।

কৃষ্ণ। —কত টাকা হলে বিয়ে হয়?

রমণীমাসি। —বরকে দুশ টাকা আর বিয়ের অন্যান্য খরচ বড়জোর পঞ্চাশ টাকা।

কৃষ্ণ। —মাসি! আমি বড় গরীবের মেয়ে ছিলাম, আমি তোমার কষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, বাল্যকালে তুমি আমায় বড় ভালোবাসিতে, সর্বদা কোলে-পিঠে করিতে, উদ্ধারিণীর বিয়ের জন্য আমি আড়াইশ টাকা দিতেছি, তুমি তার বিয়ে দাও গে। আমি তাকে বোনের মতো দেখি, আমার টাকায় বিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয়ো না।

এই বলিয়া দশ টাকা মূল্যের পঁচিশখানি নোট রমণী মাসির হাতে গুনিয়া দিলেন, ও আর একটি অনুরোধ করিলেন যেন এই কথাটি গোপনে থাকে। রমণীমাসি কাঁদিতে-

কাঁদিতে যথেষ্ট আশীর্বাদ করিলেন ও এই দান গোপন রাখিতে স্বীকৃতা হইলেন। কিন্তু ইহা গোপনে রহিল না, সকলেই জানিতে পারিল যে স্বামীর জন্মদিনে একজন গরীব বিধবা-কন্যার বিবাহের জন্য কৃষ্ণমতী আড়াইশত টাকা দান করিয়াছেন।

যে দিবস স্ত্রীলোক খাওয়ানো হয়, সেই দিবস সন্ধ্যার সময় বাটীর অনেকগুলি স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে কৃষ্ণমতী খিড়কি পুকুরে গা ধুইতে গিযাছিলেন। পাড়ার একটি মেয়ে পেট-ভরে খেয়ে তাহার একটি শিশু ছেলেকে পাড়ের কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া হাত-মুখ ধুইতে গিয়াছিল, শিশুটি হামাগুড়ি দিয়া পাড়েব ধাবে আসিয়া জলে পড়িয়া গেল। উহা দেখিযা কৃষ্ণমতী চিৎকার করিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া শিশুকে তুলিতে গেলেন, কিন্তু সাঁতার না জানাতে আপনি ডুবিযা গেলেন, ঘাটের স্ত্রীলোকেবা জলে ঝাঁপ দিয়া কৃষ্ণমতীকে ও শিশুকে তুলিল। এই সংবাদ পাইযা বাটীব স্ত্রীলোকরা পুকুরে দৌড়াইযা আসিল এবং যখন কৃষ্ণমতী হাসিতে-হাসিতে উপরে উঠিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ম্যানেজাব নবীনবাবুব স্ত্রী বলিলেন,—"হ্যাঁমা! তুমি সাঁতার জান না, কি সাহসে জলে ঝাঁপ দিযা ছেলে তুলিতে গেলে?"

কৃষ্ণমতী। —জ্যাঠাইমা, একটা কচিছেলে বোযাক হইতে পড়িযা গেলে যেমন সকলে দৌড়িযা তাহাকে তুলিতে যায, আমি সেইভাবে উহাকে তুলিতে গিয়াছিলাম। ওইখানে যে গভীব জল ছিল তাহা বুঝিতে পাবি নাই।

জ্যাঠাইমা। —কে জানে মা, আমি তোমায় আজও চিনতে পাবলাম না; তুমি সৃষ্টিছাড়া মেযে।

অন্তঃপুরে নিজশয্যাগৃহে স্ত্রীব নিকট বসিয়া অসিতকুমাব এই সকল কথা শুনিযা স্তম্ভিত ও নিরুৎসাহ হইলেন, তাঁহাব ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটুকু আসিল, যে স্ত্রীলোক আপন জীবন দিয়া পবেব শিশু ছেলেকে বক্ষা করিতে যায, তাহাকে হস্তগত কবা অসম্ভব। এইরূপ ভাবিতে-ভাবিতে বিছানায শুইলেন।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

অদ্য রাসবিহারীবাবুব বাটীতে 'নাচ' হইবে, একজন বিখ্যাত মুসলমান বাইজীব নাচ-গান হইবে। সদর-বাটী জনাকীর্ণ, উঠানে, বারান্দায, রোযাকে, দালানে, এবং দোতালাব বারান্দায় "ন স্থানং তিলধাবণম্", আর রোশনাই ও বাটী সাজানোব তো কথাই নাই; ছোট গল্পেতে সে সকল কথা লিখিতে গেলে চলে না। অন্দরেও এইরূপ বোশনাই, কিন্তু জনমানব নাই, কেবল খিড়কিদ্বাবে একজন সিপাহী পাহাবায আছে, ওই দ্বাব দিয়া পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় দেশেব স্ত্রীলোকগণ নাচ দেখিতে প্রবেশ কবিতেছে এবং একাযেক সদর-বাটীতে যাইতেছে, সুতরাং অন্দরে জনমানব নাই, কেবল তিনজন দাসী অন্তঃপুরেব হেপাজতে আছে। এই তিনজন দাসীর মধ্যে একজন দাসী বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাহার নাম গুণমণি, বড় বিশ্বাসী, বড় দরদী, বড় চতুরা, বড় সাহসী ও প্রত্যুৎপন্নমতি—গিন্নির আমলের দাসী, অনেক কালের দাসী, সুতরাং অন্যান্য দাসদাসীরা এমনকি রাসবিহারীবাবুর কর্মচারিগণ তাহাকে গুণমাসি বলিয়া ডাকিত। গুণমাসি চাকরাণীদেব সর্দার, সকলে তাহার হুকুমে চলিত, কিন্তু মধ্যে-মধ্যে গুণমাসি তাহাদের উপব পীড়ন করিত, সেজন্য তাঁবেদার চাকরাণীরা তাহার উপর বড় নারাজ ছিল। হলে হয় কি, গুণমাসি এতই বলিষ্ঠা যে, সে তিন-চারিজন পুরুষের মহড়া লইতে পারিত, সেজন্য তাহারা গুণকে ভয় করিত।

মোটকথা, সেকালের যে মুসলমান বাদশাদের অন্তঃপুরে তাহাব প্রহরিণী থাকিত, গুণমাসি বাঙালিকুলে সেইরূপ একজন জন্মিয়াছিল। ছোট লোকের মেয়েদের দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি বড় ভক্তি থাকে। গুণমণির দেবতার প্রতি ভক্তি ছিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রতি কিছুমাত্র ছিল না। একদিন গুণমাসির দাঁতের গোড়া ফুলিয়া বড় কষ্টদায়ক হইয়াছিল। দাসীদের উপর প্রভুত্ব চলিত না, বামগাল বামহস্ত দ্বারা চাপিযা 'উহু-উহু' করিয়া বেড়াইত, দাসীরা উহা দেখিয়া টিটকারি দিয়া হাসিত, গুণমাসি সেজন্য অতিশয় দুঃখিত হইয়া শ্যামসুন্দরের নিকট হরিরলুট মানিয়াছিল, কিন্তু পোন পয়সার হরিরলুট। কৃষ্ণমতী উহা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"গুণ, ছি-ছি-ছি! তুমি শ্যামসুন্দরকে এত ভক্তি করো তাঁকেও পোন পয়সার পূজা দেবে?" গুণ বলিল,—"গরীব মানুষের এই ঢের। শ্যামসুন্দর আমাকে টাকা দিন না আমি পাঁচসিকার হরিরলুট দিব।" কৃষ্ণমতী পাঁচসিকা দিতে চাহিলেন, গুণ তাহা লইল না, বলিল,—"আপনার গতব খাটানোর রোজগার থেকে হরিরলুট দিব, নইলে আবাব দাঁতের গোড়া ফুলবে।"

রাত্রি দ্বিতীয়-প্রহর অতীত হইযাছে; কৃষ্ণমতী নাচ-গান ভালো না লাগাতে অন্তঃপুরে নিজকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন, এই মহলে কেবল উপরোল্লেখিত তিনটি দাসী মাত্র ছিল, তাহারা নিচে রোয়াকে বসিয়া যে সকল স্ত্রীলোক অন্দরে প্রবেশ করিযা সদবে যাইতেছিল তাহাদের দেখিতেছিল। এমন সময়ে একটি অপরিচিতা অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক সদরের দিকে না যাইয়া অন্দরের রোয়াকে উঠিয়া দালানে প্রবেশ কবিযা কৃষ্ণমতীব মহলের দিকে যাইতেছিল, পরিচারিকাত্রয় উহা দেখিয়া তাহাব পশ্চাৎ লইল। গুণমাসি জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কোথায যাইতেছেন?"

অপরিচিতা। —তোমাদের কৃষ্ণমতীর সহিত দেখা কবিব।

গুণ। আপনি এইখানে বসুন, তিনি কোথায় আছেন, আমি দেখিয়া আসি। আপনার সহিত কি তাঁহাব কখনও জানাশুনা ছিল?

অপ! এলাহাবাদে সর্বদা আমাদেব দেখাশুনা হইত।

অপরিচিতা চুপি-চুপি কথা কহিতেছিল, কিন্তু গুণমণির সন্দেহ হওয়াতে পার্শ্বের ঘরের একখানা কেদারা টানিয়া 'এইখানে বসুন' বলিয়া চলিযা গেল এবং তাহার ইঙ্গিতে অপর দুইজন দাসী তাহার সঙ্গে গেল। কক্ষ নির্জন দেখিয়া অপরিচিতা অবগুণ্ঠন কিঞ্চিৎ অপসৃত করিয়া এদিক-ওদিক দেখিতে লাগিল। এই অবসবে নিকটেব ঘর হইতে ওই তিনজন দাসী তাহাকে স্পষ্টরূপে দেখিয়া চিনিতে পাবিল। কিছুক্ষণ পরে গুণ আসিয়া অপরিচিতাকে বলিল,—"আপনি বসুন, তিনি কাপড় ছাড়িতেছেন, গহনা খুলিতেছেন, একটু বিলম্বে আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইব।" ইতিমধ্যে পিছনের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিযা কে একজন হঠাৎ অপরিচিতার মুখে হাত দিয়া কি মাখাইতে লাগিল, অপরিচিতা চিৎকার করিয়া যেমন মুখ হইতে ওই ব্যক্তির হাত সরাইবার চেষ্টায় দুইহাত তুলিলেন, অমনি গুণমণি কাপড়ের ভিতর হইতে একগাছ সরু ছিপছিপে লাকলাইন দড়ি দ্বারা তাহার দুইহাত বাঁধিতে লাগিল, তৃতীয় দাসী তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিল; ইতিমধ্যে যে দাসী অপরিচিতাব মুখে তেল ও টিকের গুঁড়া মাখাইয়াছিল সে আবার চূণ দ্বারা অপরিচিতার মুখমণ্ডল অলঙ্কৃত করিল,—অবগুণ্ঠনবতীব এখন অতি ভয়ঙ্কর রূপ হইল! তিনি গুণকে বলিলেন,—"তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে অনেক টাকা দিব, তোমাকে আব

দাসীপনা করিতে হইবে না।" গুণমণি অপরিচিতার দাড়ি ধরিয়া আদর করিয়া বলিল,—"ও আমার সোনারচাঁদ! তুমি রাসবিহারীবাবুর বাটী ঢুকেছ তোমার এখন হয়েছে কি? আরও কত আদর খাবে" এই বলিয়া একটা গরাদেতে তাঁহাকে বাঁধিয়া অপর দুইজন দাসীর জিম্মায় তাহাকে রাখিয়া খিড়্কিতে আসিয়া সিপাহিকে বলিল,—"লছমন সিং, আমি এখনো খাই নাই, আমার একটু দই খাবার সাধ হয়েছে; তুমি যদি ভাণ্ডারী যদু ঠাকুরের কাছ থেকে একটু দই এনে দাও তবে পেট ভরে খাই।"

লছ। দ-হি দ-হি

গুণ। হাঁ দহি।

লছ। হামি তা এনে দিতে পারে, তো, খিড়কি পাহারা দেবে কে?

গুণ। হামি দেবে।

লছমন। হাঁ গুণোমাসি তুমি তা পারবে। এই বলিয়া সে দই আনিতে চলিয়া গেল।

ইত্যবসরে গুণো অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাহার দুইজন সঙ্গিনী দাসীর সাহায্যে অপরিচিতার হাতের দড়ি ধরিয়া অন্তঃপুর হইতে তাহাকে বাহির করিয়া নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র ঝোপে বাঁধিয়া লছমন সিংহের অপেক্ষা করিতে লাগিল, লছমন সিং আসিলে বলিল, —"এখন দহি তোমার নিকট রাখ। আমি আসছি" এই বলিয়া দাসী তিনজন অপরিচিতাকে লইয়া কোথায় গেল। অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিল।

এই গভীর রাত্রে নাচের মজলিসে গুণ-গুণ শব্দে একটা জনরব উঠিল যে একটা প্রেতিনী দেখা গিয়াছে, রামেশ্বরের মন্দিরের নিকট বড় রাস্তার ধারে মিউনিসিপাল আলোর থামের নিকট দাঁড়াইয়া আছে, যে যেখানে ছিল দৌড়িয়া দেখিতে গেল। এইরূপে নাচের মজলিসের অর্দ্ধেক লোক সেখানে উপস্থিত হইল। দেশের একজন ভদ্রলোকের ষণ্ডাগুণ্ডা ছেলে একখানি ভিজে তুযালের দ্বারা প্রেতিনীর মুখ মুছাইয়া দেওয়াতে সকলেই করতালি দিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল,—"বদমায়েস অসিত কুমার, মার ঝাঁটা।" এই প্রকারে অসিতবাবুকে গালি দিতে লাগিল। সকলেই অসম্মান করিল, নিকটে যে কয়টা বড়-বড় বাটী আছে তাহার মধ্যে একটা বাটীতে অসিতকুমার প্রবেশ করিয়াছিল। যাহা হউক, অসিতকুমার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাহার উদ্যান বাটীতে দৌড়িয়া পলাইলেন।

বড় ঘরের ছোট কথা পর্যন্ত গোপন থাকে না, বর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশ হয়, কিন্তু গুণমাসির কৌশলে এ কথা প্রকাশ হইল না। তাহার সঙ্গিনী দাসী দুইজন, এই কথা গোপন করিয়া পেট ফুলিয়া মারা যাইবার উপক্রম হইল, কিন্তু গুণমাসির ভয়ে উহা প্রকাশ করিতে পারিল না; আধমরা হইয়া রহিল। আমাদের বিবেচনায় গুণমাসির এই কথাটা বাটীর কর্তা রাসবিহারীবাবুকে ও কৃষ্ণমতীর স্বামী বনবিহারীকে বলিয়া তাঁহাদের সতর্ক করা উচিত ছিল।

অসিতকুমার বাগানবাটীতে যাইয়া বিছানা লইলেন, তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে কৃষ্ণমতীর কৌশলে এবং হুকুমে তাহার দাসীরা তাহাকে সং সাজাইয়া রাস্তায় বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। কৃষ্ণমতীকে তিনি কখনও ভালোবাসেন নাই, তাঁহার প্রকৃতির লোকের হৃদয়ে কখনও ভালোবাসা জন্মিতে পারে না, তবে তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া অসিতকুমারের চিত্তমালিন্য জন্মিয়াছিল। এক্ষণে কৃষ্ণমতীর প্রতি ক্রোধ উপস্থিত হইল, কি প্রকারে তাহাকে চিরদুঃখিনী করিবেন তাহারই চেষ্টায় রহিলেন। তাহার সুযোগও হইল।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

চাঁদড়া গ্রামে বনবিহারীবাবুর মামার বাটী, চাঁদড়ার কৃষ্ণনাথ ঘোষাল তাঁহার মাতুল। কৃষ্ণনাথবাবু হাজার বিঘা চাষ-জমির মালিক, সুতরাং তাঁহার কিছু অভাব ছিল না, রাসবিহারীবাবুর শ্যালক পরিচয় দিয়া তিনি পল্লীগ্রামবাসীদিগের নিকট বড় লোক হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে এবং ভগিনী ও ভাগিনেয়কে একবার তাঁহার বাটীতে আনিতে পারিলে, যেন তাঁহার গৌরব আরও বৃদ্ধি হয়, এই ভাবিয়া-চিন্তিয়া শ্যামাপূজার কিছুদিন পূর্বে তাঁহাদের আনিবার জন্য স্বয়ং নীলাপুর উপস্থিত হইলেন। বহুকালের পর ভগ্নী তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভাগিনেয় বনবিহারী তাঁহাকে পিতার ন্যায় সম্মান করিলেন। কর্তা রাসবিহারীবাবু মোকদ্দমা উপলক্ষে কলিকাতায ছিলেন, কিন্তু তাহাব জন্য কৃষ্ণনাথবাবুর কার্যের কোনও ব্যাঘাত ঘটে নাই। ভগিনী ও ভাগিনেয শ্যামাপূজার সময় তাঁহার বাটীতে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। কৃষ্ণনাথবাবু বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া চলিয়া গেলেন। এ বৎসর তিনি শ্যামাপূজা বড় ধূমধামের সহিত করিবার উদযোগ করিলেন।

কৃষ্ণমতী এই বন্দোবস্তে বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিলেন। বনবিহারী বলিল,— "কেন যাইতে নিষেধ করিতেছ?"

কৃ। তা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিব না।

বন। বুঝাইবার চেষ্টা করো দেখি।

কৃ। কি চেষ্টা করিব, মনে-মনে নানাপ্রকাব কু গাইতেছে।

বন। ছি! তুমি তো ঘ্যান-ঘ্যানে প্যান-প্যানে স্ত্রী ছিলে না! স্বামী দুইদিনেব জন্য কোথাও যাইতে চাহিলে ঘ্যান-ঘ্যান প্যান-প্যান করিতে না, নীলাপুরে এসে এরূপ হয়েছ বুঝি?

কৃষ্ণ। তা যদি হইয়া থাকি, সেতো অসঙ্গত নহে, জান তো কি প্রবল শত্রু সম্মুখে বসে আছে! তা জেনেশুনেও তুমি আমাকে একাকিনী রেখে যাচ্ছ, ছিঃ!

বন। (হাসিয়া) কাহার সাধ্য তোমার কিছু অনিষ্ট করে, সদর খিড়কি অষ্টপ্রহর পাহারায় আছে, একটি মাছি পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না, আর ২০/২৫ জন বাটীর স্ত্রীলোকে তোমাকে সর্বদা ঘিরে থাকে, আবার ম্যানেজাব নবীনবাবু বাঘেব মতন বসে আছেন।

কৃষ্ণ! তাতো সব বুঝলুম, আমি তো আমার জন্য ভয় পাইতেছি না, আমার ভয় কেবল তোমাব জন্য।

বন' কি ভয়?

কৃষ্ণ। তা বুঝাইয়া বলিতে পারিব না।

বন। তা না পার, তবে আমি কিছুদিনের জন্য মামার বাড়ি বেড়াইয়া আসি, কি বলো?

কৃষ্ণমতী বুঝিলেন যে, স্বামীর মামার বাটী যাইবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, আর কোনও আপত্তি না করিয়া মনের কষ্ট সংযত করিয়া স্বামীর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। ইহার তিন-চার দিবস পরে বনবিহারীবাবু মাতাকে লইয়া চাঁদড়া যাত্রা করিলেন। বারো-চৌদ্দক্রোশ দূর, মাঠাল পথ ধরিয়া যাইতে হয়। ট্রেন কি ঘোড়ার গাড়ির পথ নহে, মাতা-পুত্রে দাসদাসী লইয়া পাল্কিতে গেলেন।

এই সংবাদ অসিতকুমারের নিকট পৌঁছিল। তাহার দুইজন মাত্র বয়স্য, যাহারা তাহার অসৎ কার্যে সহায়তা করিত, তাহারাই কেবল ওই স্থানে বসিয়া ছিল। অসিতকুমার তাহাদের বলিলেন,—"এই সময় হইয়াছে। ইহারা দুইজন ছাড়াছাড়ি হইয়াছে।" এই বলিয়া তাহারা তিনজনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইহার ফল, পরবর্তী ঘটনাতে প্রকাশ পাইবে।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

"কেন আমার স্ত্রীর জন্য মন এত চঞ্চল হইয়াছে? কেন আমাব এত মন কাঁদিতেছে?"

অন্ধকার অমাবস্যার নিশীথে বনবিহারীবাবু, একজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে এই ভাবিতে-ভাবিতে একটি প্রকাণ্ড প্রান্তরে দ্রুতপদে গমন করিতেছিলেন। মাতুল কৃষ্ণনাথবাবু বনবিহারীর বাটী আসিবার জন্য ব্যাগ্রতা দেখিয়া তাঁহাকে আহারাদি করাইয়া, পূজাব দিবসে একখানি পাল্কি করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। পথিমধ্যে সন্ধ্যার সময় পাল্কিব বাঁট ভাঙিয়া তিনি পাল্কির সহিত পড়িয়া গেলেন। বনবিহারী আর পাল্কি কি গরুর গাড়ির চেষ্টা করিলেন না, পদব্রজে তাঁহার ভৃত্য হারাধন বাগ্‌দির সহিত আসিতেছিলেন। রাত্রি প্রায় একপ্রহব, প্রকাণ্ড প্রান্তর, আকাশ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, গম্ভীর গর্জনে মেঘ ডাকিতেছে, অন্ধকারে কোলেব মানুষ দেখা যায় না, কেবল এক-এক বার বিদ্যুতালোকে পথ দেখা যাইতেছিল। এই প্রান্তরে ঝড়-বৃষ্টির পূর্ব লক্ষণ বুঝিয়া ভৃত্য হারাধন মনিবকে বলিল,—"আজ্ঞে, বড় ঝড়-বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা, আমি আমাদের গ্রামের পথ চিনিতে পারিতেছি না।"

বন। সে কি! এখন উপায়?

হারা। উপায় আছে বই কি, আমার বোধহয়, রমণপুবের দীঘি ক্রোশখানেক দূরে আছে, উহার উত্তরে রমণপুর গ্রাম, ওই গ্রামে আপনার খুড়া বিশুবাবুর বাড়ি। এস্থানে আজকার রাত্রে থাকলে ভালো হয়, না হয় ওই গ্রাম হইতে একখান পাল্কি কি গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া এই বাত্রেই বাড়ি যাইবেন। বোধহয়, পাল্কি পাওয়া যাইবে না।

বনবিহারীর এক জ্ঞাতি-খুড়া বিশ্বেশ্বর বন্দোপাধ্যায় ওই গ্রামে বাস করিতেন, তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী রাসবিহারীকে আপনাদের পুত্রের ন্যায় ভালোবাসিতেন, সম্প্রতি তাহারা বনবিহারীকে দেখিবার জন্য নীলাপুরে গিয়াছিলেন, শ্যামাপূজা উপলক্ষে বাটী ফিরিয়া আসিয়াছেন। বনবিহারী বুঝিলেন যে, এই পরামর্শই ভালো, এবং ইহা স্থির করিয়া পশ্চিমেব রাস্তা ধরিলেন।

কিছু দূর আসিয়া এক অতি বিস্তৃত জলা দেখিয়া, হাবাধন বলিল, "বাবু পথ বুঝিতে পারিতেছি না, বোধহয় আমরা হাড়িনীর জলাতে আসিয়া পড়িয়াছি।"

বন। হাড়িনীর জলা কি হারাধন?

হাবা। আজ্ঞে, শোনা আছে, যে চাঁদি (চন্দ্র) হাড়িনী নামে এক মাগী এইরূপ এক অন্ধকার রাত্রে পথ ভুলিয়া এই জলাতে আসিয়া পড়ে, দুই-এক পা যেতে-যেতে ক্রমে কোমর পর্যন্ত, শেষে গলা পর্যন্ত দঁকে পড়িয়া আর উঠিতে পারিল না, অবশেষে এই নির্জন অন্ধকার তেপান্তর মাঠে সে মরিয়া গেল, কিন্তু মরেও মরে নাই।

বন। সে কি?

হারা। আজ্ঞে, সে কথার আর এ ভয়ঙ্কর স্থানে কাজ নাই।

বনবিহারী বুঝিলেন যে, সাধারণের ধারণা যে হাড়িনী মাগী প্রেতিনী হইয়া এই

মাঠে বিচরণ করে। যাহা হউক, তাঁহার নিজের ওই হাড়িনীর দশা না হয়, এই ভাবিয়া ওই পথ ত্যাগ করিয়া হারাধনের প্রদর্শিত পথ ধরিলেন। ইতিমধ্যে হারাধন "রাম! রাম! রাম!" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। আর—"বাবু শিগগির আসুন, মাগী জলাতে দেখা দিয়াছে" বলিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল। এই শুনিয়া বনবিহারী জলার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল অন্ধকার—চতুর্দিকে ঘোরতর অন্ধকার। একবার বিদুৎ চমকাইলে দেখিলেন, সম্মুখে অতি বিস্তৃত জলা, বিদ্যুতালোকে উহার জল চিক-চিক করিতেছে। কিছুক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হারাধনের উত্তেজনায় আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু যে দিকে যান সেই দিকেই কর্দম, কোন পথ কর্দমহীন তাহা বুঝিতে পারিলেন না, বড় গোলে পড়িলেন। হারাধন বড় চতুর ও হুঁসিয়ার, খুঁজে খুঁজে সেই পথ বাহির করিল। ইতিমধ্যে বনবিহারী হঠাৎ একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া দাঁড়াইলেন, ওই জলা হইতে একটা আলো দপ করিয়া জ্বলিয়া উপরে কিছুদূর উঠিয়া নিবিয়া গেল, এইরূপ দুই একবার দেখিলেন, তিন কখনও আলেয়া দেখেন নাই; কিছুক্ষণ ওইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হারাধন "রাম! রাম" নাম করিতে-করিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিল; বাবুকে একাকী রাখিয়া পলাইতে পারে না, অথচ ভযে সেখানে দাঁড়াইতে পারে না। আর ওইরূপ আলো না দেখিতে পাইয়া বনবিহারী চলিলেন।

এইরূপে অন্ধকারে পথিভ্রান্ত দুইজন পথিক ঘুরিতে-ঘুরিতে অর্ধঘণ্টার পর বিদ্যুতালোকে একটা বৃহৎ জলাশয়ের উচ্চ পাড় দেখিতে পাইলেন। হারাধন রামনাম ছাড়িয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া বলিল,—"বাবু এই রমণপুরের দীঘি, ইহার উত্তবে রমণপুর গ্রাম।" কিঞ্চিৎ পরেই উভয়ে দীঘির ঘাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা মানসিংহ বাঙালায প্রতাপাদিত্যকে শাসন করিতে আসিবার সময তাঁহার ফৌজদিগের জন্য এক অতি প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন; —অদ্যপি উহা গৌড়বঙ্গের রাস্তা বলিয়া পরিচিত। আর ফৌজদিগের ব্যবহাবের জন্য ওই রাস্তার অনতিদূবে মধ্যে মধ্যে এক-একটা অতি বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন, ওই দীর্ঘিকাও মানসিংহেব আদেশে খোদিত হইয়াছিল। গৌড়বঙ্গের রাস্তা উহার কিঞ্চিৎ পূর্বে। বনবিহারী পদব্রজে কিছুদূর ওই রাস্তা ধরিয়া আসিয়াছিলেন, অন্ধকারে ঘুরিতে-ঘুরিতে আবার সেই রাস্তার নিকট আসিলেন। এই দীর্ঘিকার চারিদিকে চারিটি ঘাট ছিল, (বাঁধা-ঘাট নহে); উত্তর দিকের ঘাটে একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ডালপালা চতুর্দিকে বহুদূর বিস্তৃত করিয়া তাহার শতাধিক বর্ষ বয়সের পরিচয় দিতেছিল। পথিকদ্বয় দক্ষিণদিকের মাঠের বাস্তা দিযা দীঘিতে প্রবেশ করিলেন। বনবিহাবী গায়ের জামা খুলিয়া হারাধনের হাতে দিয়া, মাথায় চাদব বাঁধিয়া একগাছি লাঠি হাতে হন হন করিয়া চলিলেন, এখন তৃণাচ্ছাদিত সমতলভূমি পাইয়া অতি-দ্রুত চলিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে উত্তরেব ঘাট হইতে রমণীকণ্ঠনিঃসৃত ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া হারাধন আবার—রাম! রাম! বলিতে লাগিল। পাঁচ-ছয় মিনিট পবে বনবিহাবী বিদ্যুতালোকে দেখিলেন যে, একটি স্ত্রীলোক এলোচুলে জল হইতে ধীবে-ধীবে উঠিয়া বটবৃক্ষের তলে যাইল। হারাধন বলিল "বাবু, ওই দেখুন"। বনবিহারী বলিলেন,—"হুঁ, দেখেছি।" জলাশয় দৈর্ঘ্যে অতি বিস্তৃত; সেজন্য উত্তরেব ঘাটে পথিকদিগের পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হইল। তাঁহারা পৌঁছিয়া দেখিলেন, সেখানে জনমানব নাই, বটবৃক্ষ তলাতেও কেহ নাই, কেবল উহার তলস্থ সিমেন্টনির্মিতবেদীতে জলের চিহ্ন রহিয়াছে যেন কোনও স্ত্রীলোক ওই স্থানে ভিজে-কাপড়ে দাঁড়াইয়াছিল। বনবিহারী গ্রাম্যপথ অবলম্বন করিয়া চলিলেন, রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছে। গ্রামের

ভিতর হইতে কাঁসর-ঘণ্টা ঢাকঢোল বাজনার শব্দ শুনিলেন। তিনি যে পথে যাইতেছিলেন তাহা নির্জন, কেননা উহা গ্রামপ্রান্তে। কিছুদূর যাইয়া দেখিলেন একটি স্ত্রীলোক একটা কলসি লইয়া দীঘিতে জল লইতে আসিতেছে। বনবিহারী বিদ্যুতালোক তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিলেন, তাঁহার বিশুখুড়ার পরিচারিকা নাম রমণী, সে সম্প্রতি তাঁহার খুড়া-খুড়ির সহিত নীলাপুরের বাটীতে তাঁহাদের দেখিতে গিযাছিল। তাহার পশ্চাতে একজন পুরুষ আসিতেছিল, দূরতাবশত তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। পরিচাবিকা রমণী অন্ধকারে একটা মাথায-পাগড়ী মানুষ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে—র্যা, কে আসচে—র্যা? আমর্! উত্তর দেয না কেন?" বনবিহারী পরিচারিকাকে চিনিতে পারিয়া বড় আশান্বিত হইয়া বলিলেন, "রমণী, আমি।" রমণী বলিল, "তুই কে—র্যা মিন্‌সে, নাম বল্‌না।" অনাহারে- পথশ্রান্তে বনবিহারীর গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, ঈষৎ বিকৃতস্বরে তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদের নীলাপুরের বনবিহারীবাবু, আমাদের বাটীর সংবাদ জান!" এই কথায় পরিচারিকা রমণী কলসি ফেলিয়া চিৎকার করিয়া দৌড়িতে লাগিল,—"ওরে"—বাবারে—এগোরে—আমায় ভূতে ধরলেরে—ও জীবন, ও জীবন—ও জীবনে—মিনসে তুই কোথায়—এগোনা—আমাদের বনবিহারীবাবু ভূত হয়ে আমারই কি ঘাড়ে চাপতে এয়েচে!" জীবন পশ্চাৎ হইতে ধমক দিল,—"চুপ কর—ও কথা মুখে আনিসনি।" রমণী বলিল,—'ওরে মিনসে —চুপ করব কি—তুই এগিযে গিযে দেখ না।" জীবন অগ্রসর হইতে পারিল না। ইতিমধ্যে হারাধন জীবনের কণ্ঠস্বরে তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিল,—"জীবন' রমণী মাগী কি বলে—র্যা?" হারাধনেব গলার স্বর শুনিয়া জীবন অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

হারাধন। আমাদের বাবুর সঙ্গে তাঁব মামার বাড়ি গিয়াছিলেম।

জীবন। তিনি কেমন আছেন?

হারাধন। তিনি ভাল আছেন, এই যে তোমার সম্মুখে।

তখন বনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জীবন, আমাদের বাড়ির কোনও সংবাদ জান?"

জীবন ইতস্তত করিয়া বলিল,—আজ্ঞে জানি না।

বনবিহারী। আমি অদ্য রাত্রেই বাড়ি যাইব, তুমি একখানা পাল্কি করিয়া দিতে পার?

জীবন। পাল্কি পাওযা বড় কঠিন, কিন্তু গরুর গাড়ি পাওয়া যাইবে।

বন। তবে শীঘ্র আন, আমি এক্ষণেই রওনা হইব।

জীবন। তবে আমাব সঙ্গে আসুন।

বন। কোথায়, বিশুকাকার বাটী?

জীবন। না, সেখানে যাইলে অদ্য বাত্রে ছেড়ে দিবেন না। আমাব বাটীতে অপেক্ষা করিবেন—আসুন।

পথে যাইতে-যাইতে হাবাধন জিজ্ঞাসা করিল,—"জীবন, তোমাদেব দীঘির বটগাছে কি পেত্নী আছে?"

জীবন। তাতো কখনও শুনি নাই।

হারা। আমরা দক্ষিণের ঘাট হইতে প্রথমে একটা মেয়ের কান্না শুনিলাম, পবে দেখিলাম একটি মেয়ে জল হইতে চুল এলো করে বটগাছে গিয়া উঠিল।

জী। ওঃ—আমাদের গাঁয়ের কোন গৃহস্থবাটীর মেয়েরা তাহাদের এক জ্ঞাতির

মৃত্যুসংবাদ পাইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে ওই দীঘিতে নাইতে গিয়াছিল, আমাদের এই অ-গঙ্গার দেশে ওই দীঘিতে নেয়ে সকলে শুদ্ধ হয়।

বন। কে—কে মরেছে?

জী। কি জানি, আমি মনিববাড়ির পূজার কাজ করিতেছিলাম।

বনবিহারী নীরব হইয়া রহিলেন। পরে হারাধন জিজ্ঞাসা করিল,—"জীবন, রমণীমাসি কি বলতে-বলতে পালাল?"

জী। ওর কথা শুনো না, ওর একটা ভারি রোগ হয়েছে, কেবল ভূত দেখে আর ভূত-ভূত করে; ওর বুঝি ইষ্টি রম হইয়াছে।

বনবিহারী জীবনেব বাটীতে পৌঁছিয়া পথশ্রান্তিতে এবং মানসিক যন্ত্রণায় নিদ্রাভিভূত হইয়া একখানি তক্তপোষের উপব ঘুমাইয়া পড়িলেন, এমত সময়ে গভীর গর্জনে ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। রাত্রিশেষে জীবন একখানি গরুর গাড়ি আনিয়া বনবিহারীকে উঠাইল, তখনও মুষলধাবে বৃষ্টি পড়িতেছে। গাড়িখানির উপর দরমার আবরণ ছিল; বনবিহাবী গাড়িতে উঠিলেন, হারাধন ও জীবন একখানি ত্রিপল মুড়ি দিয়া বসিল, জীবন গাড়ি হাঁকাইতে লাগিল। বৃষ্টির জন্য পথ অতি দুর্গম হইয়াছিল, জীবন ও হারাধন মধ্যে-মধ্যে নামিয়া চাকা ঠেলিতে লাগিল।

॥ অষ্টম পারচ্ছেদ ॥

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, এমনসময়ে বনবিহারী নিজগ্রামে পৌঁছিলেন। গরুর গাড়ি ত্যাগ করিয়া পদব্রজে চলিলেন। গ্রামপ্রান্তে পথ কর্দমময়, উভয় পার্শ্বে বড়-বড় আমবাগান, উহার ভিতরে অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছে, ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে, জোনাকি পোকা দপ-দপ কবিয়া জ্বলিতেছে। বনবিহারী দ্রুতপদে চলিলেন। গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একস্থানে বালকেরা পাঁকাঠির আলো জ্বালিয়া খেলা করিতেছে, বনবিহারীকে দেখিবামাত্র তাহারা পাঁকাঠি ফেলিয়া পলাইল। বনবিহারী বুঝিলেন যে, অসিতকুমার তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার মৃত্যু রটনা করিয়াছে, সেই সংবাদ রমণপুরে তাঁহার বিশুখুড়ার বাটী পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে; সেই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার খুড়ি কাঁদিতে-কাঁদিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে দীঘিতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন, সেই সংবাদে রমণী দাসী তাঁহাকে দেখিয়া ভূত-ভূত করিয়া পলাইয়াছিল। কিন্তু এমন আশ্চর্য কৌশলের সহিত মৃত্যুসংবাদ রটনা করিয়াছে যে সকলেই উহা বিশ্বাস করিয়াছে! যাহা হউক, কথাটা তিনি হাসিয়া উড়াইতে পারিলেন না, কেননা যদি তাঁহার মৃত্যুসংবাদ তাঁহার স্ত্রীর কানে উঠিয়া থাকে তবে তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছে! এইরূপ ভাবিতে-ভাবিতে বাটীর সন্নিকটে পৌঁছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ছাদের উপর যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন তাহাতে তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া ঘুরিয়া পড়িলেন, পিছন হইতে হারাধন তাঁহাকে ধরিল। দোতালার ছাদের উপর অনেকগুলি দাসীবেষ্টিত আলুলায়িতকেশা কৃষ্ণমতী কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতেছেন,—"আমি অনেক দিন তাঁকে দেখি নাই, আর না দেখে থাকতে পারি না" ইত্যাদি। বনবিহারী টলিতে-টলিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া শুনিলেন যে, গ্রামে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া একজন পরিচারিকা সন্ধ্যার পর অন্ধকারে সিঁড়ির নিকট অপর একজন পরিচারিকাকে চুপি-চুপি ওই কথা বলিতেছিল। কৃষ্ণমতী ওই সময়ে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছিলেন, ওই কথা শুনিবামাত্র চিৎকার করিয়া পড়িয়া মূর্ছিতা হইলেন, মাথায় কপালে ও অন্যান্য স্থানে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল। পরে মূর্ছাভঙ্গ

হইলেও আর জ্ঞান প্রাপ্ত হন নাই, কেবল—"আমি আর তাঁকে না দেখে থাকতে পার্‌ছি না" এই বুলি তাঁহার মুখে দিবারাত্রি ছিল।

বনবিহারী তাঁহার স্ত্রীর সহিত দেখা করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণমতী তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। বনবিহারী দিবারাত্রি তাঁহার নিকট থাকিয়া পূর্বকথা স্মরণ করাইতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সফল হইতেন না। স্মৃতির উদ্দীপন আর হইল না, কৃষ্ণমতীকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া বড়-বড় ডাক্তার-কবিরাজেব দ্বারা চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু সবই নিষ্ফল হইল। এইরূপে কয়েক মাস গেল; কৃষ্ণমতী বনবিহারীকে চিনিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি বড় অনুরক্তা হইলেন, দিবারাত্রি তাঁহার নিকট থাকিতেন, তাঁহাকে কোথাও যাইতে দিতেন না। যখন বনবিহাবী বহির্বাটীতে যান কৃষ্ণমতী তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে যাইতেন। গ্রামেব ইতর-ভদ্র সকলেই রাস্তায় দাঁড়াইয়া দেখিত যে, রাস্তাব ধারে বারান্দায় বনবিহারী একখান ইজিচেয়ারে বসিয়া সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পড়িতেন, আর একটি ছোট টুলে একটি দ্বাবিংশবর্ষীয়া কেশবিন্যাসবিহীনা রুক্ষকেশা অনুপমা সুন্দবী তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিত; কখনও তাঁহাকে দাড়ি ধবিয়া আদব কবিতেছে, কখনও বা চিরুণি ব্রুস লইয়া তাঁহার চুল আঁচড়াইয়া দিতেছে, আঁচল দিয়া তাঁহার মুখ মুছিযা দিতেছে, আবার কখনও বা তাঁহার হাত হইতে পুস্তকখানি কাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চিৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে।

এইরূপে উভয়ের দিন কাটিতে লাগিল। উভয়ে উভয়কে চোখের আড়াল কবিতে পারিতেন না; কিন্তু তাঁহাদের এইরূপ সুখও চিরদিন রহিল না। বনবিহারী পীড়িত হইয়া বিছানা লইলেন। কৃষ্ণমতী দিনরাত তাঁহার বিছানায় বসিয়া থাকিতেন, সেইরূপ চিরুণি-ব্রুস দিয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতেন, আঁচল দিযা মুখ মুছাইতেন, আবার বলিতেন,—"তুমি তোমার কেতাব পড়বে না? কেতাব এনে দিব? তুমি তো অনেক দিন পড় নাই? আমি আর কেতাব কেড়ে নেবো না।" বনবিহারী বলিতেন,—"এখন আর পড়িব না; তোমার সহিত গল্প করিব।" কৃষ্ণমতী বড় সন্তুষ্ট হইয়া বলিতেন,—"আচ্ছা-আচ্ছা।" বনবিহারী আর বিছানা হইতে উঠিতে পারিতেন না দেখিয়া কৃষ্ণমতী শ্বশুরকে ধমক দিয়া বলিলেন, (এখন কৃষ্ণমতী লজ্জাহীনা)—"হাঁ গা, তুমি কি তোমার ছেলেকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলবে? ওঁকে খেতে দাও, খেতে দাও, ওঁর প্রতিদিন মাংস খাওয়া অভ্যাস, মাংস খাওয়াও।" শ্বশুর চোখ মুছিতে-মুছিতে বাহিরে গেলেন। সেই দিন হইতে কৃষ্ণমতী দাসীদিগকে মাংস কিনিতে টাকা দিতেন, তাহারা আনিত না; বলিত মাংস পাওয়া গেল না। একদিন একজন দাসীর অসাবধানতাবশত জানিতে পারিলেন যে কালীবাড়িতে প্রতিদিন সকালে বলিদান হয়, সেইখানে পাঁঠার মাংস পাওয়া যায়। কৃষ্ণমতী বলিলেন,—"বাবু মাংস না খেতে পেয়ে উঠতে পাচ্ছেন না, তাঁহাকে না খাইয়ে সবাই মেরে ফেল্লে।" এই বলিয়া তিনি স্বয়ং কালীবাটীর মাংস আনিতে চলিলেন, তাঁহার গতিরোধ করিতে কেহ সাহস কবিল না। চির-অবরোধিনী কৃষ্ণমতী রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন, পরিচারিকাগণ এবং দুই-চারিজন দ্বারবান তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। কৃষ্ণমতী রূপে পথে আলো করিয়া চলিলেন। রাস্তার উভয়পার্শ্বে স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা তাঁহাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া,—"ইনি কে? ইনি কে? ইনি কোন দেবী" বলিয়া পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল। পরে যখন সকলেই জানিতে পারিল যে, ইনিই কৃষ্ণমতী, তখন প্রাচীনেরা দুইহাত তুলিযা আশীর্বাদ করিতে লাগিল, স্ত্রীলোকেবা যাহারা তাঁহার অবস্থা শুনিযাছিল, তাহারা চোখেব জল মুছিতে লাগিল।

"আহা! আমার মরি! কি রূপ! ভগবান কেন এর এমন দুর্দশা করিলেন!" এইরূপ আশীর্বাদ করিতে-করিতে পথিকগণ সকলেই কৃষ্ণমতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কৃষ্ণমতীর কোনও দিকে দৃষ্টি নাই; কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই। যেমন প্রবল বায়ুতে ছোট সরু সুপারি গাছের কেবল মাথা হইতে কিয়দংশ দুলিতে থাকে, মন্থরগমনা কৃষ্ণমতী সেইরূপ দুলিতে-দুলিতে হাঁটিতে লাগিলেন। কবরী স্খলিত, ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, ঈষৎ স্থূলাঙ্গ বলিয়া ঘর্মাক্ত কলেবরা; অভ্যাসবশত মধ্যে-মধ্যে মাথায় কাপড় টানিতে-টানিতে কৃষ্ণমতী রূপে পথঘাট আলো করিয়া চলিতেছেন। ঘটনাক্রমে অসিতকুমার বয়স্যদিগের সহিত বাগানবাটী হইতে বসতবাটীতে মধ্যাহ্নাহারের জন্য আসিতেছিলেন। রাস্তার একটা বাঁক ফিরিয়া পথে হঠাৎ সম্মুখে বহুজনবেষ্টিত এক দেবীমূর্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি রামচরণ ঘোষালের বাটীতে বিবাহোৎসবে কিছুক্ষণের জন্য অবগুণ্ঠনবতী কৃষ্ণমতীকে দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই রূপ এখন আর নাই। কৃষ্ণমতী উন্মাদিনী হইয়া দেবীমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। পূর্বের রূপ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল, সেইজন্য অসিতকুমাব তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, দেবী বলিয়া স্থির করিলেন। এরূপ ধারণার একটা বিশেষ কারণ ছিল, অসিতকুমাব তখন সুরাপান করিয়া ঈষৎ বিকৃত অবস্থাতে আসিতেছিলেন (তাঁহার কাছে সুরাপানের সময়াসময় ছিল না)। পথের উভয়পার্শ্বে ইতব লোকের মেয়েরা কৃষ্ণমতীকে দেখিয়া 'মা-মা' সম্বোধন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছিল। অসিতকুমাব বয়স্যদিকের সহিত কৃষ্ণমতীর নিকটে যাইয়া "মা-মা" বলিয়া গলায় চাদর দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কবিলেন। কৃষ্ণমতী তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কে? ভিক্ষুক?" একজন পরিচাবিকা বলিল,—"না, ভিক্ষুক নহে।" "হাঁ ভিক্ষুক, নহিলে আমাকে মা ব'লে ডাকে কেন?" এই বলিয়া একটি টাকা ছুঁড়িয়া দিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পূজারীর নিকট মাংস চাহিলেন। বলিলেন,—"এখন দুবেলার যুগ্যি মাংস দাও, আবার কাল এসে নিয়ে যাব।" দুইবেলার জন্য দুইটাকা ফেলিয়া দিলেন, পূজাবী একজন দাসীর হাতে কলাপাতার বাঁধিয়া মাংস দিলেন এবং টাকা দুইটি তাহার হাতে ফেরত দিলেন। কৃষ্ণমতী তাহার হাত হইতে মাংস কাড়িয়া আপনার হাতে লইয়া বাটী ফিরিলেন, সেইরূপ বহুজনবেষ্টিতা হইয়াই বাটী ফিরিলেন। অসিতকুমাব এখন জানিতে পারিলেন যে, যাঁহাকে তিনি "মা" বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন, তিনি আর কেহ নহেন, কৃষ্ণমতী। তখন নেশা ছাড়িয়া গেল, মনে-মনে লজ্জা, ঘৃণা, ও গুরুতর আক্ষেপ জন্মিল। স্ত্রীলোকের রূপ দেখিলে যে পাষণ্ডের চিত্তমালিন্য জন্মিত, কৃষ্ণমতীর রূপ দেখিয়া আজ তাহাব ভক্তির উদ্রেক হইল। ধন্য কৃষ্ণমতীর রূপের মহিমা! সেই রাত্রেই অসিতকুমাব গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়াগেলেন। বাটী যাইয়া কৃষ্ণমতী মাংস স্বয়ং রাঁধিয়া উহা একটা ডিশে করিয়া স্বামীর মুখের নিকট ধরিয়া বলিলেন,—"খাও, খাও।" বনবিহারী বলিলেন, "বড় গরম, একটু জুড়ুক।" মাংস ঠান্ডা করিবার জন্য কৃষ্ণমতী সেইখানে মাংসের ডিশ রাখিয়া একটা পাত্র আনিতে গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার শ্বাশুড়ি উহা গোপন করিয়া রাখিলেন। ফিরিয়া আসিয়া উহা না দেখিতে পাইয়া কৃষ্ণমতী ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন; অবশেষে বালিকার ন্যায় কাঁদিতে বসিলেন। কান্না শুনিয়া বনবিহারী তাঁহাকে ডাকিলেন, স্বামীর নিকট আসিয়া তিনি মাংসের কথা ভুলিয়া গেলেন। কৃষ্ণমতীর এইরূপ পতিভক্তি দেখিয়া দেশের স্ত্রীলোকগণ বলিত,—"ধন্য মেয়ে! জ্ঞানেতেও স্বামী-স্বামী বলে পাগল—অজ্ঞানেতেও তাই।"

বনবিহারী দিন-দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন, শেষে তাঁহার বাকশক্তি রহিত হইল। কৃষ্ণমতী তাঁহার কথার আর উত্তর না পাইয়া স্বামীকে ক্রোড়ে লইয়া থাকিতেন, আর মধ্যে-মধ্যে তাঁহার দাড়ি ধরিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতেন,—"কথা কও—কথা কচ্ছোনা কেন?" এইরূপে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বামীকে ক্রোড়ে লইয়া থাকিতেন। যেমন তাঁহার স্বামীর দেহ দিন-দিন অস্থিচর্মবিশিষ্ট হইল, তাঁহারও সেইরূপ হইতে লাগিল। কেহ তাঁহাকে আহার করাইতে পারিত না, কাহারও সহিত আর কথা কহিতেন না, কেবল স্বামীকে বলিতেন,—"কথা কও।"

ইহার কিছুদিন পরে রাসবিহারীবাবুর বৃহৎ পুরী অন্ধকারময় হইল। জনমানবের সাড়াশব্দ নাই, কেবল এক-একবার একটি স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া যাইত; শীর্ণশরীরা, মলিনবসনা, আলুলায়িতরুক্ষকেশা একটি বিধবা যুবতী, অন্ধকারে এঘর-ওঘর করিয়া বাটীর চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন কাহাকে খুঁজিতেছে। আর ডাকিতেছে, "তুমি কোথায় গেলে? আর যে তোমাকে না দেখে থাকতে পারি না!" এই রূপে ঘুরিতে-ঘুরিতে যে ঘরে বনবিহারী থাকিতেন, সেই ঘর খুঁজিত; পরে তাঁহার বিছানায় বসিয়া তাঁহাকে ডাকিত। কিছুদিন পরে গভীর রাত্রে, ছাদের উপর হইতে একটি স্ত্রীলোকের হৃদয়-ভেদী চিৎকার শুনিয়া প্রতিবেশীদের নিদ্রাভঙ্গ হইত। "তুমি কোথায় গেলে? এসো না, আমার কাছে এসো না, আমি যে তোমাকে না দেখে আর থাকতে পারি না।" গভীর নিশিতে প্রতিবেশীরা প্রতিদিন এইরূপ হৃদয়ভেদী চিৎকার শুনিতে পাইতেন। অল্প দিবস পরে এই চিৎকার বন্ধ হইল, কৃষ্ণমতী অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন।

আমরা সঠিক সংবাদ পাইয়াছি যে, অসিতকুমার আর বাটী ফিরেন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে দুইটা জনরব উঠিয়াছে, কেহ বলে যে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন, আবার কেহ বলে যে তিনি প্রেমানন্দ স্বামী নাম ধারণ করিয়া দেশে-দেশে আর্যধর্ম প্রচার করিতেছেন। যাহাই হউক, তাঁহার অনুপস্থিতিতে নীলাপুরবাসীরা শান্তিলাভ করিয়াছে।

২৪ বর্ষ ১০ম সংখ্যা মাঘ ১৩২১



চন্দ্রালোকে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

একজন মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী দীর্ঘকায়, কৃশ, ধর্মোন্মত্ত, সর্বদাই পারমার্থিকভাবে ভোর ও ঋজুস্বভাব। তাঁহার সমস্ত মত বিশ্বাস নিবদ্ধ তাহার একটু নড়চড় হইবার যো নাই। তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস, তিনি ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছেন; ঈশ্বরের উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের অভিপ্রায়—সমস্তই তিনি অবগত হইয়াছেন।

যখন তিনি তাঁহার সেই ক্ষুদ্র গ্রাম্য মঠ-গির্জার শুঁড়ি-পথে লম্বা-লম্বা পা ফেলিয়া পায়চারি করিতেন, তখন কখনও-কখনও তাঁহাব মনে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হইত ঃ—"ঈশ্বর উহাকে কেন এমন করিয়া সৃষ্টি করিলেন?" তিনি মনে-মনে আপনাকে ঈশ্বরের স্থানে স্থাপন করিয়া এই প্রশ্নের উত্তব বাহির করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, প্রায়ই উত্তর পাইতেন। বিনম্রচিত্তে তিনি কখনই এ কথা বলিতেন না,—"প্রভু, তোমার অভিপ্রায় আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত'। তিনি বলিতেন,—"যেহেতু আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অবশ্যই বুঝিতে পাবিব; বুঝিতে যদিও না পারি, অন্তত অনুমান করিতে পারিব।"

তাঁহার মনে হইত, জগতে যাহা কিছু সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার একটা অকাট্য যুক্তি আছে। তাঁহার বিশ্বাস, সমস্ত "কেন" ও সমস্ত "যেহেতু"র ওজন তৌলদণ্ডে সবসময়েই সমান থাকে। জাগরণকে আনন্দময় করিবার জন্যই উষার সৃষ্টি; শস্যকে পাকাইবার জন্যই দিনের সৃষ্টি; শস্যে জলসেক করিবার জন্যই বৃষ্টির সৃষ্টি; নিদ্রার পূর্বায়োজনের জন্যই সন্ধ্যার সৃষ্টি; নিদ্রা যাইবার জন্যই রজনীব সৃষ্টি, এবং কৃষিকার্যের জন্যই চারি ঋতুর সৃষ্টি হইয়াছে।

সন্ন্যাসীর মনে এরূপ সংশয় কখনই আসিত না যে, বিশ্বপ্রকৃতির কোনও উদ্দেশ্য নাই; অথবা পদার্থমাত্রই কেবল কাল-বিশেষের প্রযোজনে, জলবায়ুর প্রয়োজনে, প্রকৃতির দারুণ প্রয়োজনে স্বতই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সন্ন্যাসীর আর-একটি বিশেষত্ব, তিনি স্ত্রীলোককে ঘৃণা করিতেন, অজ্ঞাতসারে ঘৃণা করিতেন। স্ত্রীলোকের প্রতি অবজ্ঞা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল।

তিনি যিশুখৃষ্টের এই বাক্যটি সর্ব্বদাই আবৃত্তি করিতেন ঃ—"রমণী, এমন কি জিনিস আছে, যাহা তোমার আমার মধ্যে সমান?" অধিকর তিনি বলিতেন,—"মনে হয়, ঈশ্বর তাঁহার এই রচনাটির সম্বন্ধে নিজেই অসন্তুষ্ট।" তাঁহার মতে, কবিরা যে কন্দর্প শিশুটির বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা রমণী শতগুণে অপবিত্র। পূর্বে রমণীই ত আদি-মানবকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার পতন ঘটাইয়াছিল; এখনও রমণী ওই সকল পাপকার্যে নিরতা। রমণী দুর্বলচিত্ত, রমণী সকল বিপদের মূল, রমণী গূঢ়ভাবে মানুষের চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে। রমণীর পাপদেহ অপেক্ষা রমণীর প্রেম-প্রবণ আত্মাকে তিনি আরও অধিক ঘৃণা করিতেন।

অনেকসময় তিনি রমণীর ভালোবাসা পাইয়াছেন, ভালোবাসা অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু তিনি জানিতেন, তিনি নিজে দুর্ধর্ষ। কেবল রমণীব হৃদয়ের এই প্রেম-প্রবণতাই তাঁহার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিত।

তাঁহার মতে, মানুষকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য ও পরীক্ষা করিবার জন্যই ঈশ্বর রমণীর

সৃষ্টি করিয়াছেন। রমণীর নিকট যাইতে হইলে আটঘাট বাঁধিয়া যাইতে হয়। সর্বদাই আশঙ্কা হয়, না জানি কি ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে।

কেবল মঠের সন্ন্যাসিনীদিগের উপর তাঁহার একটু অনুকূল দৃষ্টি ছিল। তাঁহাদিগকে তিনি নিরীহ মনে করিতেন, কেননা তাঁহারা ব্রতধারিণী। তথাপি তাঁহাদের প্রতিও কখনও-কখনও কঠোর ব্যবহার করিতে বিরত হইতেন না। তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেন, তপশ্চর্যার দ্বারা আত্মসংযমে অভ্যস্ত হইলেও, তাহাদের অন্তরে প্রেম-প্রবণতা চিরজাগ্রত রহিয়াছে। তিনি যে একজন সন্ন্যাসীমাত্র, তবু তিনিও কখনও-কখনও উহাদের এই প্রেম-প্রবণতার পরিচয় পাইতেন। সন্ন্যাসী-জনের দৃষ্টি অপেক্ষা যাহা একটু বেশিমাত্রায় করুণার্দ্র, সেই করুণার্দ্র দৃষ্টিতে, খৃষ্টের প্রতি তাহাদের যে প্রেম সেই প্রেমের জ্বলন্ত উচ্ছ্বাসে, তিনি তাহাদের এই প্রেমপ্রবণতার পরিচয় পাইতেন। তিনি মনে করিতেন, খৃষ্টের প্রতি প্রযুক্ত হইলেও ইহা রমণীর প্রেম, পার্থিব প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এমন কি উহাদের বশ্যতার মধ্যে, উহাদের মধুর কণ্ঠস্বরে, উহাদের অবনত দৃষ্টিতে, উহাদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিলে যখন উহারা শুধু নীরবে অশ্রুপাত করিত, সেই অশ্রুপাতের মধ্যে তিনি উহাদের এই প্রেম-প্রবণতা উপলব্ধি করিতেন।

মঠ-দ্বার হইতে বাহির হইয়াই তিনি তাঁহার পরিধেয় আলখাল্লাটা বহুবার ঝাঁকাইতেন, এবং যেন একটা বিপদের মুখ হইতে পলায়ন করিতেছেন, এইভাবে লম্বা-লম্বা পা ফেলিয়া দ্রুতবেগে চলিতেন।

তাঁহার একটি ভাগিনেয়ী ছিল। কোনও এক নিকটবর্তী ক্ষুদ্র গৃহে সে তাহার মায়ের সহিত একত্র বাস করিত। তাহাকে তাঁহার মঠের সন্ন্যাসিনীদিগের শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য সন্ন্যাসীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল।

মেয়েটি দেখিতে সুশ্রী, একটু 'পাগলাটে' ধরণের ও পরিহাসপ্রিয়। সন্ন্যাসী যখন ধর্মোপদেশ দিতেন, সে তখন হাসিত; এবং যখন তাহার উপর রাগিয়া উঠিতেন, সে দুই বাহুতে তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া তাঁহাকে আবেগভরে চুম্বন করিত। তখন যদিও তাঁহার অন্তরের অন্তস্থল হইতে লুপ্ত পিতৃভাব জাগিয়া উঠিত, এবং তিনি একপ্রকার মধুর আনন্দ অনুভব করিতেন, তথাপি তিনি অনিচ্ছাক্রমে তাহার আলিঙ্গনপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেন।

সন্ন্যাসী তাহাকে সঙ্গে করিয়া যখন মাঠ-ময়দানের পথ দিয়া চলিতেন, তখন প্রায়ই তাহাকে ঈশ্বরের কথা বলিতেন। সে তাঁহার কথায় বড় একটা কর্ণপাত করিত না। সে তাহার তরুণ জীবনের স্বাভাবিক আনন্দে, আকাশের দিকে, তৃণের দিকে, ফুলের দিকে চাহিয়া থাকিত। সে আনন্দ তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিত। কখনও-কখনও একটা উড়ন্ত পতঙ্গ ধরিবার জন্য, একটা ফুটন্ত ফুল তুলিবার জন্য সে ছুটিয়া যাইত, এবং তাহা ধরিয়া বা তুলিয়া আনিয়া সে বলিয়া উঠিত,—"মামা, মামা, দেখো এটি কেমন সুন্দর, আমার একে চুমো খেতে ইচ্ছা করছে।" এই যে চুম্বনের আকাঙ্ক্ষা—ইহা সন্ন্যাসীকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত, উত্তেজিত করিয়া তুলিত, কুপিত করিয়া তুলিত। সন্ন্যাসী এই চুম্বনের মধ্যে তাহার সেই প্রেমস্পৃহা দেখিতে পাইতেন, যাহা রমণীর হৃদয়ে নিয়ত অঙ্কুরিত হইয়া থাকে, এবং যাহার মূল একেবারে উৎপাটিত করা অসম্ভব।

মঠের রত্নভাণ্ডার-রক্ষকের পত্নী সন্ন্যাসীর ঘরকন্না দেখিত। সে একদিন সন্ন্যাসীকে গোপনে সংবাদ দিল যে, তাঁহার ভাগিনেয়ীর একজন প্রণয়ী আছে।

এই কথা শুনিবামাত্র সন্ন্যাসী একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন—তাঁহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। সেইসময়ে তাঁহার ক্ষৌরকর্ম চলিতেছিল, তাঁহার সমস্ত মুখ সাবানের ফেনে আচ্ছন্ন ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন তাঁহার বিবেচনাশক্তি ও বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এই কথা সত্য নয়, মেলানি, তুমি মিথ্যা কথা বলচ।"

কিন্তু সেই কৃষক-পত্নী বুকের উপর হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"যোজক মহাশয়, আমি যদি মিথ্যা বলে থাকি, তাহলে মহাপ্রভু আমার বিচার করবেন। আমি আপনাকে সত্য বলচি. আপনি ঘুমিয়ে পড়লেই সে প্রতিদিন রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। নদীর ধারে দুজনের দেখা সাক্ষাৎ হয়। দশটা ও দুপুর রাত্রের মধ্যে কোনও একসময়ে সেখানে গেলেই আপনি দেখতে পাবেন।"

সন্ন্যাসী ক্ষৌরকর্ম হইতে বিরত হইয়া, প্রচণ্ডবেগে পায়চারি করিতে লাগিলেন। আবার যখন ক্ষৌরকর্ম আরম্ভ করিলেন, তখন নাক হইতে কান পর্যন্ত দুই-তিন জায়গায় ক্ষুর বসাইয়া দিলেন।

ঘৃণা ও রোষে সন্ন্যাসীর হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি সমস্ত দিন নীরব হইয়া রহিলেন। একে তো তিনি ধর্মযাজক, পার্থিব প্রেমের উপর তাঁহার প্রচণ্ড বিদ্বেষ; তাহাতে আবার সেই মেয়েটির তিনি পিতৃস্থানীয়, অভিভাবক ও দীক্ষা-গুরু; তাহার আধ্যাত্মিক কল্যাণের ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত। আর, সে কিনা তাঁহাকে চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করিতেছে! ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। পিতা-মাতার বিনা অনুমতিতে কন্যা গোপনে কাহারও কণ্ঠে বরমালা অর্পণ করিয়াছে জানিতে পারিলে পিতামাতার অহঙ্কার যেরূপ ক্ষুণ্ণ হয়, এবং তাঁহাদের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সন্ন্যাসীর মনের অবস্থা কতকটা সেইরূপ হইল।

সায়াহ্ন-ভোজনের পর সন্ন্যাসী পুস্তক পাঠ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিয়া উঠিলেন না। ক্রমশ তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া যখন দশটা বাজিল, তিনি তাঁহার লাঠিটা লইলেন। যখন কোনও রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য তিনি নৈশ-ভ্রমণে বাহির হইতেন, তখন এই ওক্‌-গাছের প্রকাণ্ড লাঠিটা প্রায়ই সঙ্গে লইতেন। সস্মিতদৃষ্টিতে তিনি এই লাঠিগাছটার প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলেন; পরে উহা বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিয়া, আক্রমণের ভঙ্গিতে সবেগে ঘুরাইতে লাগিলেন। তাহার পর, হঠাৎ লাঠিটা উঠাইয়া,—দন্তে দন্ত ঘর্ষণপূর্বক—একটা কেদারার উপর প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। কেদারার পৃষ্ঠখণ্ড দুইখানা হইয়া মেঝের উপর নিপতিত হইল!

সন্ন্যাসী মঠ হইতে বাহির হইবার জন্য দ্বার খুলিলেন, কিন্তু হঠাৎ চন্দ্রমার অপূর্ব উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা দেখিয়া চৌকাঠের উপর থমকিয়া দাঁড়াইলেন। এরূপ উজ্জ্বল জ্যোৎস্না প্রায় দেখা যায় না।

সন্ন্যাসী প্রাচীনকালের ঋষিদিগের ভাবে অনুপ্রাণিত। আজ এই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর সৌম্য শান্ত সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার ক্ষুদ্র উদ্যানটিতে সমস্ত বৃক্ষলতা চন্দ্রমার মধুর কিরণে পরিস্নাত। শ্রেণীবদ্ধ ফলবৃক্ষগুলির দীর্ঘ ও শীর্ণ পত্রহীন শাখাসমূহ, উদ্যানের সঙ্কীর্ণ পথে ছায়াবর্ণে অঙ্কিত। আবার অন্য দিকে, মালতী লতা, তাঁহার গৃহের প্রাচীর বাহিয়া উঠিয়াছে; তাহা হইতে অতি

মধুর সৌরভ উচ্ছ্বসিত হইতেছে;—মনে হইতেছে, যেন লতাটির সুরভিত অন্তরাত্মা কবোষ্ণ বায়ুর মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

মদ্যপায়ীরা যেরূপ সতৃষ্ণভাবে মদ্যপান করে, তিনি সেইরূপ গভীর প্রশ্বাস-সহকারে এই সুরভিত বায়ু গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং বিস্মিত, মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া ধীরপদক্ষেপে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাগিনেয়ির কথা একবারও মনে পড়িল না।

চলিতে-চলিতে তিনি যেমনই মাঠে আসিয়া পড়িলেন, অমনই থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত মাঠ-ময়দান চন্দ্রকিরণে পরিপ্লাবিত—শান্ত রজনীর সৌম্য সৌন্দর্যে নিমজ্জিত। দূর হইতে আমার লঘু ও বিকম্পিত স্বরলহরী ভাসিয়া আসিতেছে। সে সঙ্গীতে চিন্তার উদ্রেক করে না, কেবল স্বপ্নময়ী কল্পনার উদ্রেক করে; জ্যোৎস্নার মোহিনী মায়ায়, সে সঙ্গীত যেন চুম্বনের জন্যই বিরচিত, এইরূপ অনুভূত হয়।

সন্ন্যাসী আবার চলিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল; কেন যে হইল, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে দৌর্বল্য অনুভব করিতে লাগিলেন,—হঠাৎ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, সেইখানে বসিয়া, কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া, ঈশ্বরের রচনার মধ্যে বসিয়া ঈশ্বরকে ধ্যান করেন, ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করেন।

ওদিকে আবার, ক্ষুদ্র নদীটির তরঙ্গায়িত গতির অনুসরণ করিয়া, সারি-সারি ঝাউগাছ দীর্ঘ রেখায় প্রসারিত হইয়াছে।

একটা পাতলা কুয়াশা একটা শুভ্র বাষ্পজাল নদীতটের উপরে ও চারিধারে ঝুলিয়া রহিয়াছে; এবং লঘু ও স্বচ্ছ গদির ন্যায় নদীটির আঁকা বাঁকা সমস্ত গতি-পথ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

সন্ন্যাসী আবার থামিলেন। কি এক অপূর্ব অনিবার্য ভাব-রস তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত প্রবেশ করিল।

একটা সন্দেহে, একটা অনির্দেশ্য উদ্বেগে তাঁহার চিত্ত আক্রান্ত হইল। মধ্যে-মধ্যে তাঁহার অন্তরে যেরূপ প্রশ্নের উদয় হইত, সেইরূপ প্রশ্ন আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। "ঈশ্বর কেন উহাকে এমন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন?"

যেহেতু, রাত্রি নিদ্রার জন্য, অচৈতন্যের জন্য, বিশ্রামের জন্য, বিস্মৃতির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব ঈশ্বর কেন রাত্রিকে দিনের অপেক্ষা বেশি রমণীয় করিয়া, ঊষা-অপেক্ষা, সন্ধ্যা-অপেক্ষা বেশি মধুর করিয়া সৃষ্টি করিলেন? কেন এই সৌম্য শান্ত চিত্তহারী উপগ্রহটি সূর্য অপেক্ষা বেশি কবিত্বময় হল? যে সকল সুকুমার রহস্যময় ব্যাপার প্রকাশ করিতে সূর্যের সঙ্কোচ হয়, অন্ধকার অপসারিত করিয়া সেইসকল ব্যাপার প্রকাশ করিবার জনাই কি চন্দ্রের সৃষ্টি?

সর্বশ্রেষ্ঠ বিহঙ্গ-গায়কেরা অন্য বিহঙ্গের ন্যায় বিশ্রাম না করিয়া এইরূপ রাত্রে কেন স্বরলহরীতে আকাশ ছাইয়া দেয়?

জগতের উপর কেন এই অর্ধানুবগুণ্ঠন নিক্ষিপ্ত হইল? কেন এই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, এই অন্তঃকরণের আবেগ, এই দেহের অবসাদ?

কি জন্য এই সব চিত্তহরণের আয়োজন? মানুষ যখন শয্যাশায়ী থাকে, তখন তো রজনীর এই মাধুরী-লীলা দেখিতে পায় না। কাহার জন্য তবে এই চিত্তহারী দৃশ্য? কাহার জন্য এই কবিত্বরস স্বর্গ হইতে ধরাতলে অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে?

সন্ন্যাসী ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

কিন্তু ওই দেখো অদূরে, তৃণাচ্ছন্ন মাঠের ধারে, ভাস্বর-বাষ্প-পরিষিক্ত তরুমণ্ডপের নিচে দিয়া দুইটি ছায়ামূর্তি পাশাপাশি চলিয়াছে।

যুবক অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায়—স্বকীয় বান্ধবীর কণ্ঠ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এবং মধ্যে-মধ্যে তাহার ললাট চুম্বন করিতেছে। তাহাদের চারিদিকে যে নিশ্চল ভূখণ্ডটি প্রসারিত, তাহা উহাদের অধিষ্ঠানে যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। উহারা দুইটি প্রাণী কিন্তু একটি আত্মা; মনে হয় যেন ইহাদেরই জন্য এই নিস্তব্ধ প্রশান্ত রজনী সৃষ্ট হইয়াছে। সন্ন্যাসীর পূর্বোক্ত প্রশ্নের জীবন্ত উত্তরে দিবাব জনাই যেন, উহারা সন্ন্যাসীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

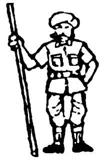
সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল, আন্দোলিত হইতে লাগিল; মনে হইল যেন, বাইবেল-বর্ণিত রুথ ও বুজের প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

তখন তিনি মনে-মনে ভাবিতে লাগিলেন,—হয়তো ঈশ্বব মানবের প্রেমলীলা মায়াবগুণ্ঠনের আবৃত করিবার জন্যেই এইরূপ বজনীর সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই প্রেমিকযুগলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সন্ন্যাসী পশ্চাতে হটিয়া গেলেন। পবক্ষণেই চিনিতে পাবিলেন, বালিকাটি তাঁহার ভাগিনেয়ী। এখন তাঁহার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল, হয়তো তিনি ঈশ্বরেব অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন! যে প্রেমকে ঈশ্বর এইরূপ সৌম্য সুন্দর মহিমাচ্ছটায় আবৃত করিয়াছেন, সেই প্রেম কি ঈশ্ববের অনভিপ্রেত?

সন্ন্যাসী কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং ঈষৎ লজ্জিত হইয়া সেখান হইতে পলায়ন কবিলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি যে দেবমন্দিরে হঠাৎ প্রবেশ করিযাছিলেন, সেখানে প্রবেশ করিবার তাঁহার অধিকার নাই।

১২শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩১০



চৌকিদার

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

ভুলু-গোয়ালা মাতব্বর প্রজা, ২৫/৩০ বিঘার জোতদার, এবং দুখানা লাঙলের মালিক। বেশ সুখে ছিল। কিন্তু হঠাৎ কেমন তাহার একটা অভাব বোধ হইল। অভাবেই দুঃখ।—গণেশ ঘোষ গ্রামের মণ্ডল, ভুলুর চেয়ে এমনই কি মাতব্বর, অথচ তার চেয়ে তার কত বেশি মান। সরকারি বেসরকারি লোকজন যে কেহ গ্রামে আসে, সবাই গণেশের দ্বারস্থ—কি করিলে অমন মানটি ভুলুর হয়! ভুলু আজকাল সদাই তাই ভাবে। এমন সময়ে বিশে বাগদি চৌকিদার, চৌকিদার-জন্মে খালাস পাইল। সরকার-বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইতে পারিলে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে ভাবিয়া ভুলু স্থির করিল, বিশের কাজে উমেদার হইবে।

ভুলু নিজে তেমন সাহসী নহে—সহসা কোনও লালপাগড়ীর কাছে ঘেঁসিতে পারে না। গ্রামের আইনবাজ হারু-খুড়ো এ-বিষয়ে তাহার সহায় হইল। হারু কখনও অ, আ, পড়ে নাই এবং 'আইন' শব্দটাকে অধিকতর মুখরোচক করিয়া তুলিবার জন্য 'বায়েন' বলিত। সে ভুলুকে ভাবিতে দেখিয়া তুড়ি দিয়া বুঝাইয়া দিল, সবই রোপেয়ার কাজ। ভুলুর একটা নেশা হইয়াছে, অতএব সে চৌকিদারি ভাষায় বলিল,—"কুছ্ পরওয়া নেই খুড়ো, না হয় এক মরাই মুন্সিজীর সঙ্গে দেখা করিল।

মুন্সিজী খয়ের আলী সেখ সম্প্রতি এই গোবরডাঙার থানায় বদলি হইয়া আসিয়াছেন—কাজেই হারু-খুড়োর পরিচিত সে মুন্সিজী নহেন। তার উপর, মুন্সিজীর এক প্রবল পুলিশ-সুলভ উপসর্গ—কেহ সম্মুখে আসিয়া সেলাম করিলেই, মোকদ্দমার ফরিয়াদি স্থির করিয়া গালি দিয়া প্রথম-চোটে তাহাকে ভাগাইবার চেষ্টা করেন। অতএব হারাধন কুণ্ডার ওরফে হারু-খুড়ো, কেতামাফিক সেলাম করিয়া, স্মিতমুখে মুন্সিজীর হুজুরে পৌঁছিতে না-পৌঁছিতে, খয়ের আলীর রোষকষায়িত লোচন ও দীর্ঘ শ্মশ্রু যুগপৎ তাহাকে জানাইয়া দিল যে, যাত্রাটা তেমন শুভ নহে। কিন্তু সেখজী নিষিদ্ধ পশুর সঙ্গে হারু-খুড়োর বংশগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা কীর্তিত করিয়াও যখন প্রত্যুত্তরে সে "ট্যাঁক" হইতে ঝনাত করিয়া এক তোড়া টাকা তাঁহার দিকে ফেলিয়া দিল, তখন আর সে-ভাব বড় রহিল না। বরং ফরিয়াদি মোকদ্দমা রুজু করিতে আসিলে প্রথম সম্ভাষণে একটাকা বই বাহির করে না, কিন্তু এ ব্যক্তি ডবল হইতে আরম্ভ করায় সেখপুত্র একটু বিস্মিত হইলেন। মুখের গালি মুখেই রহিয়া গেল, কিন্তু তথাপি 'নথি দুরস্ত' রাখার জন্য বলিলেন,—"ঝুটা মোকদ্দমা ফিন্ লে আয়া?"

কথাটা হারু কানে তুলিল না। কতকটা তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইল, অমন কত চালাকি সে দেখিয়াছে, কত মুন্সেফ, কত দারোগা এই বয়সে সে দেখিল, তা এত একটা দশ টাকা মাহিনার মুন্সি। মনে ততগুলো কথার উদয় হইলেও, মুখে হারু-খুড়োর যথেষ্ট সপ্রতিভ ভাব। সে ভুলুকে ইঙ্গিত করিয়া নিকটে আসিতে বলিল, এবং তখন মুন্সিজীর সঙ্গে আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ করিল।

তখন নিরীহ ভুলু, মুন্সির ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া মহা শঙ্কিত হইয়াছিল। তার হিন্দি-মিন্দি কথা শুনিয়া তাহার ধড়ে প্রাণটি ক্ষীণ মাত্রায় বহিতেছিল। তার উপর একটা সন্দেহ

তার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। হারু-খুড়ো তার কাছ থেকে লইয়াছিল চারি টাকা, কিন্তু দু'টো বই খরচ করিল না। মানুষের মুখ চেনা হারুর ব্যবসায়ের মধ্যে, সেও ইহার একটা কিনারা করিয়া রাখিল। ভুলুকে বড় একটা কথা কহিতে হইল না। মুন্সি জিজ্ঞাসিলেন, কত তার জমিজমা। ভুলু বলিল,—পঁচিশ বিঘা। খুড়ো সঙ্গে-সঙ্গে বলিল,—দুখান লাঙল, একখানা বাড়ি, আর আঁম-কাঠালের বাগিচা আছে। গম্ভীর মুখকে গম্ভীরতর করিয়া মুন্সি-মহাশয় হাসিলেন,—"ওহো তুমি মাতব্বর প্রজা।" হারু-খুড়ো অমনি ভুলুর হইয়া করজোড়ে নিবেদন করিল,—"এজ্ঞে আপনাদের আশীর্বাদ! ভুলুকে চৌকিদারিটে দিয়ে দিন, আপনাকে পান খেতে আরও কিছু দেবে।" তারপর মুন্সিজীর হুঁকা হইতে কলিকা লইয়া হারু তামাক সাজিল। ইহাতে সেখজীর প্রসন্নতা আরও বর্ধিত হইল।

খয়ের আলী বুঝিলেন, এ লোকটাকে হাত করিয়া ভুলুকে এক চোট দোহন করার বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। অতএব একটা অছিলা করিয়া ভুলুকে বিদায় দিয়া, হারুর সঙ্গে তাঁর দুচারিটা কথাবার্তার দরকার। দুই-চারি বার হুঁকা টানিয়া আগুন হয় নাই বলিয়া, সেখজী কলিকাটি শূন্য করিলেন, এবং ভুলুকে ডাকিয়া একবার তামাক সাজিতে ফরমায়েস করিলেন। "ওহে মোড়ল, বলি একছিলিম তামাকই না হয় খাও। ওই কামারের দোকান থেকে একটু আগুন আনো দেখি।"

গোয়ালাপুত্র একটু ইতস্তত করিয়া কলিকাটি লইল—"মোছলমানের" তামাক সাজা তার এই প্রথম, কেমন একটা ঘৃণা ও বাধ-বাধ করিতেছিল, কিন্তু নহিলে নহে। ভুলু, কামারের দোকানোদ্দেশে যাত্রা করিলে, মুন্সী চোখ টিপিয়া হারুকে কাছে ডাকিলেন। হারু ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল।

মুন্সি বলিলেন,—"ওহে বাপু, ও লোকটাকে কোথায় পাকড়ালে বলো দেখি। তুমি তো দেখি লোকটা রকমসই। গোয়ালাটার শুনেছি বিস্তর ধানের মরাই, একটা-আধটা বেচাও না।

হারু হাসিল। মুন্সিটেকে হাতে করিতে পারিলে মোকদ্দমা মামলার বিস্তর কাজ পাওয়া যেতে পারে। বলিল,—"হুকুম হলেই তা পারি। হাকিম হুকুমের আবদারিতেই তো আমার গুজরান হুজুর! তা কি হুকুম করতে হবে?"

হারু-খুড়ো ন্যাকা সাজিল এবং রঙ্গ দেখিতে লাগিল। মুন্সিজী পুনশ্চ বলিলেন,—"তোমাকে তো বেয়াকুব বলে বোধহয় না হে মোড়ল! বলি, ভুলু-গোয়ালাকে তুতিয়ে-পাতিয়ে কিছু আদায় করো না। বুঝলে কি না মোড়ল।—"

হারুর বাপ-পিতামহের ত্রিকুলের মধ্যে কেহ কখনও "মোড়লি" করে নাই—কিন্তু খয়ের আলীর যখন কার্যসিদ্ধির আবশ্যক, হয়তো তখন তিনি এইরূপ এবং আরও হরেক রকমের উপাধি মুক্তহস্তে বিতরণ করিতেন। পুলিশের স্তোকবাক্যে ভুলিবার ছেলে আর যে হউক, কোঙারপুত্র হারু-খুড়ো নহে। কিন্তু সেয়ানায়-সেয়ানায় কোলাকুলি—সে স্বীকার করিয়া গেল যে, জমাদারজীকে একটা বড় রকমের সিধা এই ভুলু গোয়ালার দ্বারা দেওয়াইবে।

ভুলু ফিরিলে মুন্সি সাহেব তাহাকে আদর করিয়া বসিতে বলিলেন। চৌকিদারি দিতে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"তোমাকে আর এখানে আস্‌তে হবে না হে মোড়ল—তবে পরশু হাটবারের পরদিন ওনাকে (হারুকে নির্দেশ করিয়া) বুঝলে কি না মোড়ল—ওনাকে একবার পেটিয়ে দিও। দারোগাসাহেব দোহাতে গস্তিতে গেছেন, কাল রাতে

'তসরিফ' নিয়ে আসবেন। তারপর তোমার হুকুম হবে। তুমি কিন্তু ওই মোড়লমোশায়কে অবিশ্যি পেটিয়ে দিও—আর ওনার শলা নিয়ে কাজ করো। বড়া আক্কেল ওনার, অমন আদমি এখানে মেলা ভার।" হারু-খুড়োকে ইশারায় বলিলেন,—"পরশু আসবের সময় পঞ্চায়েত বেটাদের দুটোকে ধরে এনো মোড়ল। নইলে হাকিম বুঝবে না, বোঝলে কি না!" হারু সেলাম করিয়া বলিল, "এটা আর বুঝিনে হুজুর—রায়েনের আমি না জানি কি, না বুঝি কি?" তখন দুজনে বিদায় হইল।

রাস্তায় আসিয়া হারু বাকি টাকাদুটো ভুলুর অজ্ঞাতে "ট্যাঁক" হইতে সরাইয়া কাছার কাপড়ে বাঁধিল, এবং নিশ্চিন্ত হইয়া বলিল,—"পুলিশের লোকের চোখে ধুলো দেওয়া মানুষের "অসাধ্যি', সে দুটো টাকাও না নিয়ে ছাড়লে না শালা মোছলমান।" তারপর মুখ খাটো করিয়া বিশ্বস্তভাবে একটা সিধা দেওয়ার শলাও দিল। ভুলু জিজ্ঞাসা করিতে না-করিতে সিধার একটা ফর্দও আওড়াইল—দুটো পাঁঠা, দুসের ঘি, ভালো চাউল ইত্যাদি। আর সেইসঙ্গে ভুলু যে দশ-পনরো টাকার ফেরে পড়িল, ইহা বুঝাইয়া একটু আপশোস করিতেও ভুলুর এই পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ভুলিল না।

সে-রাতে আহ্লাদে ভুলুর ভালো নিদ্রা হইল না। গৃহিণীকে পদবৃদ্ধির খবরটা মহা হৃষ্টচিত্তে দিতে গিয়া কিন্তু একটা বিপদে পড়িল। "মরণ আর কি, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় এরই নাম। পোড়া কপাল। তাই বলি,—হেবো-আশুরির সঙ্গে এত ভাব কিসের।" গৃহিণীর ভাষা নূতন বর্ষার মতো এইরূপ স্বামীকূল ছাড়াইয়া উগ্রক্ষত্রিয়কুলে উছলিতেছিল —আসন্ন চৌকিদারের সেটা অসহ্য হইল। প্রথমে "ক্ষ্যাপ বলে কি!" বলিয়া থামাইতে গেলে, "পুটির মা" যখন বাপের বাড়ির অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া চৌকিদারির দুর্গতি উজ্জ্বল-ভাষায় গোপিনী-সুলভ অলঙ্কারের সঙ্গে চিত্রিত করিয়া যাইতেছিল, তখন নির্বাক হইয়া শুনিলেও এক-একবার বলিল,—"বলি হা-দেখ, মুখ সামলে কথা ক' বলচি।" পুটির মা ইহা গ্রাহ্য না করিয়া সমানে বলিয়া চলিল,—"চৌকিদারি করে মান হবে। কনেস্টবলের ঘোড়ার ঘাস কাটতে-কাটতে, আর দারগা, মুন্সির দুধ যোগাতে-যোগাতে হাড় ভাজা-ভাজা হবে, চাষ-বাস সব উল্টে যাবে, বুঝবি মজা। তা যদি না হয় তো আমি গোয়ালার মেয়ে নই।" কথায় আঁটিতে না পারিয়া, ভুলু শেষে লাঠৌষধের ভয় দেখাইল, কাজেই পুটির মার বক্তৃতা সে রাত্রের মতো বন্ধ হইল।

ভোর হইতে-না-হইতে ভোলানাথ শয্যাত্যাগ করিয়া হারু-খুড়োর বাড়ি গেল এবং তাহাকে উঠাইল। মুখ-হাত ধুইয়া এবং যথাবিধি তামাকুর সেবা করিয়া, খুড়ো মেরজাই কসিতে ও মাথায় চাদর বাঁধিতে ভুলিলেন না। আজ তাঁর সুপ্রভাত—হাটবারটা বটে, জিনিসপত্তর কিনিলে দাম দেবার লোকের অভাব হইবে না। এখন দুজনে প্রসাদপুরের হাটে রওনা হইল। বলিতে ভুলিয়াছি, ভুলু চৌকিদারির সনদ না-পাইয়া থাকিলেও, আজ একগাছ বড়-গোছের লাঠি বহন করিয়া চলিল।

প্রসাদপুরের হাট বিখ্যাত। সপ্তাহে দুইবার করিয়া বৈঠক, বুধবারের ও রবিবারের ও সাধারণত তিনের ও পাঁচের হাট বলিয়া গণ্য। আজ রবিবার, পাঁচের হাটে বড় জাঁক। একটা অস্ফুট জন-কল্লোল বহুদূর হইতে সমুদ্র-গর্জনবৎ শুনা যাইতেছে, গাড়ি-গাড়ি ধান-চালে প্রবেশপথ আচ্ছন্ন, বলদেরা বহন করিয়া আনিয়া কেহ ক্ষুধিত-কাতর দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া, কেহ গাড়ির নিচে নামমাত্র ছায়াতলে শয়ন করিয়া, চক্ষু বুজিয়া গিলিত চর্বণ করিতেছে, গাড়োয়ানের দল কেহ ঘর্মাক্তদেহে কলিকা লইয়া মহাজনের দোকানের দিকে ছুটিতেছে,

কেহ পাঁচন হস্তে মালের গাড়ি হইতে গরু খুলিতেছে। কেহ অসমর্থ, ভূপতিত গরুটাকে বেদম প্রহার ও কটূক্তি করিতেছে। জোড়ার গরুটি নিতান্ত ভালোমানুষের মতো সমস্ত ভার নিজ স্কন্ধে লইয়া, করুণ-নেত্রে তাহার দুর্দশা দেখিতেছে। হাটুরের দল মহাজনদের দোকান সম্মুখে, যেখানে-সেখানে দাঁড়ি-বাটখারা লইয়া,—"বামে রাম, রামে দুই" রবে ক্রমাগত ওজন করিতেছে। সঙ্গে-সঙ্গে বস্তাবন্দি হইতেছে। মহাজন সেই রাশীকৃত বস্তার গদিতে বসিয়া, ছত্রছায়াতলে অর্ধশয়ানাবস্থায় তাহা দেখিতেছে। কাছে-কাছে রবিশস্যের রাশি—বুট, গম, সর্ষপ, কলাই ক্ষুদ্র বৃহৎ স্তবে সজ্জিত।

তেলিনী তেল বেচিতেছে; মুদি বেচিতেছে—লবণ, ডাল, মসলা, আজ তার বড় ব্যস্তভাব। সুর কবিযা রামায়ণ পড়িবারও সময় হইয়া উঠে নাই। তরকারির হাটে অধিকাংশ স্থলে গ্রাম্য সুন্দরীগণ নথ নাকে শাঁখা হাতে কুমড়া, পটল, কদলী, থোড়, আলুর ডালি সাজাইয়া সংসার এবং রৌদ্রতপ্ত পুরুষ জাতিকে সুশীতল সম্বোধনে আকর্ষণ করিতেছেন, কোথাও এক মিন্‌সে কারবাবি বিরলকেশ দাড়িটি লইয়া একঢাকি বেগুন সম্মুখে সে রূপের হাটে, 'হংস মধ্যে বকো যথা' বসিয়া আছে। মণিহারীর দোকানে—মনোহারিণীর দল মহা ভিড় লাগাইয়াছেন। সে স্থান তাঁদেরই একচেটিয়া। নবাব অন্তঃপুবিকাগণ যেমন দাসশ্রেণীবিশেষের সম্মুখে অসঙ্কোচে বিচরণ কবেন, মণিহারী এবং কাঁসাবীদের কাছে তাঁহাদের সেই ভাব। মণিহাবী দর-দাম করিবে কি, তার কথা ফুরাইয়া গেছে। কোন সুন্দরী কোমল হাতখানি তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া সঙ্গিনীর দিকে সলজ্জ নেত্রে বসিয়াছেন, কেহ চুড়ি পরিতে-পরিতে কাঁদিতেছেন, অপর যুবতীবা "পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু" আপনাপন পালার প্রতীক্ষা করিতেছেন। কেহ ছেলের মুখে তেলে-ভাজা জিলিপি এবং বাসি-মুড়কি গুঁজিযা দিতেছেন, কেহ বা ছেলে ঠেঙাইতেছেন।

ভুলু, ধানের মহাজন ঠিক করিতে ব্যস্ত। তাহার এ সব দেখিবাব-শুনিবার অবসর নাই। কিন্তু হারু-খুড়ো জুযাখেলাব ফন্দিতে ফিরিতেছিল। ভুলু পরিচিত মহাজনের কাছ হইতে টাকা সংগ্রহ কবিতে না করিতে হারুর দুই বাজি খেলা হইয়া গেল, এবং ইহার মধ্যেই সে একটাকা জিতিল। বাজার করিযা বাড়ি ফিরিতে ইহাদের অপরাহ্ন হইল। হারু নিজের জন্য যাহা কিছু কিনিলেন, ভুলু অনিচ্ছায় তাহার দাম দিল। ইহাব উপর খুড়ো, তাঁহার শুঁড়ি ভ্রাতষ্পুত্র হলা সাহের দোকানে একবার গিয়াছিলেন। কিন্তু হারাধন বড় নির্লিপ্ত, কিছুতে আত্মহারা হয না। এ কলিকালে তাহার মতো নিষ্কাম ব্রত কযজনেব বলিতে পাবি না।

তারপর দুদিন পরে দারোগাসাহেব দস্তখত লইয়া হারু-খুড়ো ভুলুকে চৌদিাব সাজাইয়া মহকুমায় গেলেন। লোকে বলে, ভুলুকে যাইতে হয় নাই, খুড়ো নিজে চৌকিদার হইযা কোর্ট-বাবুর সঙ্গে দেখা করে তাহাতেই কার্যোদ্ধার হইয়াছিল। কিন্তু আমরা জানি, সত্য-সত্যই ভুলু, লম্বা লাঠিতে বুঁচকি বাঁধিয়া হারুর সঙ্গে গিয়াছিল, তবে হাকিমের সঙ্গে তাহাকে কোনও কথা কহিতে হয় নাই। হারাধনের চালাকিতে ভুলুকে কোনও বিষয়ে কোনও বেগ পাইতে হয় নাই। প্রথম দিন হারু যে বলিয়াছিল, সবই রোপেয়ার কাজ, ভুলু তা প্রত্যক্ষ দেখিল। ভুলু বলিয়াছিল,—"কুছ্ পরওযা নেই, এক মরাই ধান মানের খাতিরে বেচ্‌ব।" সে কথা ভুলুর মনে পড়িল। তখন দেখিল, মান রাখিতে ধান থাকিবে না। চৌকিদারির মান-ইজ্জত কত, তিন দিনে ভুলু ঘোষ তাহা বুঝিল। রাতে গ্রামে চৌকি দিলেই কাজ শেষ হয় না, অহোরাত্র ফাঁড়িতে "হাজিরি" দিতে হয়। ক্রমে পুঁটির মার ভবিষ্যদ্বাণী

ফলিল। যে কেহ নূতন কনেস্টবল কি নূতন জমাদার আসে, সেই ভুলুকে মাতব্বর জানিয়া নজর আদায়ের ফন্দিতে প্রথমেই ২/৪ "থাপ্পড়" লাগাইয়া দেয়। "লে আও ঘাস, লে আও দুধ" শুনিতে-শুনিতে ভুলুর কান ঝালাপালা হইয়া গেল। ভুলু ক্রমে আত্মমর্যাদাটুকু হারাইতে লাগিল। নিজের উপায়ে আর কুলায় না, যে পরিমাণে থানায় কুব্যবহার ও ফরমাইশ পায়, তাহার তিন গুণ সে গ্রামের গরিব দুঃখীর প্রতি প্রযোগ করে। দুদিন, তিন দিন, ভূমিকর্ষণ করিতে-করিতে লাঙল ফেলিয়া তাহাকে কনস্টেবলের বেগারিতে যাইতে হইল, চাষ আর চলে না। ২৫ বিঘার ভিতর কষ্টে সেবার দশ বিঘা আবাদ হইল। ক্রমে চৌকিদারি তাহার অসহ্য হইল।

শেষ রাত্রে একদিন চৌকি দিয়া সবেমাত্র গৃহে প্রবেশ করিতেছে, এমন সময় বাটীর বাহিরে ভুলু কনস্টেবল মৈথু সিংহের চিরপরিচিত কণ্ঠ শুনিতে পাইল। "শালে রোঁদ ছোড়কে তুম্ আরাম্সে নিদ্ যাতা হ্যায়।" ভুলু সে বদনাম ক্ষালনার্থ মুহূর্তে সম্মুখীন হইলে, কনস্টেবল প্রবর তাহাকে "বেটমের" ৪/৫ গুঁতো লাগাইলেন। এবং এক জরুরি খত হাতে দিয়া হুকুম করিলেন, "তখনই মহকুমায় রওনা হউক, ফের জবাব লইয়া রাতে ফিরিতে হবে।

ভুলু সেই অবস্থায় চলিল। পুঁটির মা তখনও শয্যাত্যাগ করে না, কনস্টেবলকে শুনাইয়া স্বামীকে বলিল,—"কাল যদি চৌকিদারিতে ইস্তফা না দিস তো তুই গোয়ালার ছেলে নস্।"

শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে গৃহে ফিরিতে ভুলু সন্ধ্যার পর একটা নদী পার হইতেছিল। মাঝি-মাল্লারা নৌকা বাঁধিয়া বারুইপুরের ঘাটে আহারাদির উদ্যোগ করিতেছে। একজন সেই স্থির নদী-হৃদয় কম্পিত করিয়া গাহিতেছিল—

"চাষবাস করিয়া খাইত আবদুল,
তখন ছ্যালো ভালো;
জাহাজের খালাসী হয়ে আবদুল,
দরিয়ায় ডুবে মল।"

তখন গৃহিণীর কথা মনে করিয়া ভুলু স্থির নিশ্চয় করিল, চৌকিদারিতে ইস্তফা দিবে। রাত্রেই থানায় গিয়া "জরুরি খতের" জবাব দিল। দারোগাসাহেবের পায়ে ধরিয়া ভুলু আপনার দুঃখ-দুর্গতি জানাইল, এবং ইস্তফা দাখিল করিল। ইস্তফা মঞ্জুর করাইতেও তার কিছু খরচ হইয়াছিল।



নূতন বাড়ি

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"নূতন বাড়ি কিনিয়াছি। দেখিতে যাইব মনে করিয়াছি। তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী ধনী। বয়স ত্রিশেব মধ্যে। আমি তাঁহার সহপাঠী। পাঠ্যাবস্থা হইতে আলাপ। নাম সূর্যকান্ত রায়, দরিদ্র সন্তান। ঘরে বিধবা মাতা, বিধবা পিসি, বিধবা ভগিনী। সকলের ভার আমার উপর। বিষয়কর্মের চেষ্টায় ফিরিতেছিলাম। শুনিয়াছিলাম, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। এ পর্যন্ত দেখিতেছিলাম, চাকরিটি চেষ্টার সাধ্যাতীত।

মহেন্দ্রবাবুর বাড়ি আমি কতক মোসাহেব, কতক বন্ধুর মতো। মোসাহেবির উমেদারি করিয়া বড় কিছু হয় নাই। যখন বড় মোসাহেবিয়ানা করি, তখন মহেন্দ্রবাবু সহসা বন্ধুভাবে দেখেন, বন্ধুত্বেব পাকাপাকি করিতে গেলে মোসাহেব-মহলে সামিল হই। ফল কথা, মহেন্দ্রবাবু লোকটা সেয়ানা। কথাবার্তায় বেশ, কাজেব বেলা বড় ধরা দেন না। আমোদ-আহ্লাদেও কাহারও ভাগ বসিত না। কথায় পেট ভরে না দেখিয়া আমি বাবুর বৈঠক পরিত্যাগ করিব মনে করিতেছিলাম।

এমনসময় মহেন্দ্রবাবু একদিন বলিলেন,—"নূতন বাড়ি দেখিতে যাইব। তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

একটু হাসির ভান করিয়া কহিলাম,—"কোথায়?"

"বীরভূম জেলায়। মস্ত বাড়ি। সস্তা পাইয়াছি।"

কথায় জানিলাম, মহেন্দ্রবাবু নিজে এ পর্যন্ত বাড়ি দেখেন নাই, তাঁহার লোক গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। এত দূরে বাড়ি কিনিবার কি প্রয়োজন বুঝিতে পারিলাম না। মহেন্দ্রবাবু শহরের লোক, পল্লীগ্রামে তাঁহার মন বসিবে কেন? তিনি বলিলেন, বরাবর কলিকাতায় ভালো লাগে না, কিছুদিন একান্তে নির্জনে থাকা ভালো। এ কথায় মতভেদে কোন-ফল নাই দেখিয়া আমি নীরব হইলাম।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলো? যাইবে?"

বলি কি? বাবু তো নিজের বাড়ি দেখিতে যাইতেছেন, আমি কি সুখে তাঁহার সঙ্গে যাই? যদি একটা কোনও আশা থাকে, তাহা হইলেও একটা কথা। কিন্তু এখানে যেটুকু আশা, দূর পল্লীগ্রামে সেটুকুও থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অন্য দিকে তো কিছুই নাই, বাবুরও আশা বড় অল্প। তিনি বেড়াইতে যাইতেছেন। বেড়াইবার সময় কাজের কথা কে শুনে?

মনের ভাব গোপন না করিয়া আমি কহিলাম,—"আমি যদি আপনার সহিত বেড়াইতে যাই তো বাড়িতে বিধবাগুলির কি দশা হইবে?"

মহেন্দ্রবাবু ঈষৎ ব্যঙ্গ-স্বরে কহিলেন,—"তুমি এখানে থাকিয়াই বা তাহাদের কি উপকার করিতেছ?"

আপনা-আপনি একটা নিশ্বাস পড়িল। বলিলাম,—"এখানে থাকিয়া তবু কর্ম-কাজের চেষ্টা করিতে পারি।"

মহেন্দ্রবাবু আর কোনও কথা কহিলেন না। আমার দিকে চাহিয়া চুপ করিলেন। পরে বলিলেন,—"একবার বৈকালে আসিও।"

বৈকালে আবার উপস্থিত হইলাম। মহেন্দ্রবাবু আবার হাতে বিশ টাকাব দুইখানি নোট দিলেন। কহিলেন,—"এই টাকা বাড়িতে দিও। কাল সকালবেলা যাত্রা করিতে হইবে। এক মাসের মধ্যে আমরা ফিরিয়া আসিব।"

আমি বিস্মিত হইলাম। লোকটাকে এতদিন চিনিতেই পারি নাই! মনে আবার আশা হইল।

পরদিবস প্রাতঃকালে আমরা যাত্রা করিলাম।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

মহেন্দ্রবাবুর নূতন বাড়িতে পঁহুছিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বাড়ির নিকটে গ্রাম নাই। চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রান্তর। বাড়ির চারিদিকে বাগান, অযত্নে বনের মতো হইয়া রহিয়াছে। রক্ষকের মধ্যে এক বৃদ্ধ মালী, তাহার বর্ষীয়সী স্ত্রী ও এক যুবতী কন্যা। কন্যাটি বিধবা।

বৃহৎ বাড়ি। বাড়ি বড় নূতন নয, খবিদ্দাব নূতন। মহেন্দ্রবাবুব আদেশমতো বাড়ি আবার মেরামত হইয়াছিল। বাগানবাড়িব ধাঁজা, কিন্তু আযতন বৃহৎ। প্রথম তলায দশ-বারোটি বড়-বড় ঘর। দ্বিতালায়ও সেইরূপ। কেবল ত্রিতালার ঘরের সংখ্যা অল্প।

বাগানে কয়েকটি বৃক্ষ অতিশয় প্রাচীন ও সেই অনুসাবে বড। লতা-পাতায় চারিদিক জঙ্গলের মতো। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে আমবা সেখানে উপনীত হইলাম। বাগানে ঘুঘু, কাঠঠোকরা পাখি ডাকিতেছে। উদ্যানে প্রবেশ করিতে বাঁশবাগানের বেড়া। স্থানটা বড়ই নির্জন। একটা কুকুর পর্যন্ত নাই। আমবা শহরের লোক, সেই নির্জন স্থানে উপনীত হইয়া প্রাণ হু-হু করিতে লাগিল।

মহেন্দ্রবাবুর একটু কল্পনাশক্তি ছিল। তিনি বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই আনন্দে অস্থির। "আঃ বাঁচা গেল। এখানে কোনও গোলমালই নেই। কেমন শান্তি, কেমন নিস্তব্ধ, কেমন সুন্দর!" বাগানে ঘাট-বাঁধান পুষ্করিণীর ধারে চাঁপা, কামিনী, গন্ধরাজ ফুলের গাছ। কিন্তু যত্নের চিহ্ন কোথাও নাই। বাগানেব ধারে মালীব ঘর। কিন্তু বাগানের সহিত মালীর কোন-সম্বন্ধ আছে, বাগান দেখিয়া এরূপ বোধ হয় না।

পুষ্করিণীর নিকট যখন আমরা উপস্থিত হইলাম, তখন একটা স্ত্রীলোক ঘাটে বসিয়া বাসন মাজিতেছে। আমাদিগকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মাথাব কাপড় টানিয়া দিল, কিন্তু পুবা ঘোমটা দিল না।

মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে গা?"

স্ত্রীলোকটা কহিল,—"আমি মালীর মেয়ে।"

এই মালীর বিধবা কন্যা।

স্ত্রীলোকটি পূর্ণ যুবতী। বর্ণ তেমন গৌর না হউক, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বটে। গড়ন চমৎকার। চক্ষু নত ছিল, কিন্তু বোধ হইল বেশ বড়-বড়। তাহাকে সম্ভ্রান্তে দেখিয়া আমরা অন্যদিকে গমন করিলাম। গমনকালে মহেন্দ্রবাবু দুই-চারি বার তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। স্ত্রীলোকটিও কৌতূহলপরবশ হইয়া আমাদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছি।

কয়েক মাস হইল, মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে। তিনি এ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। এ কথাটা পরে বলিলে হইত, কারণ এ সময় আমার মনে এ কথা উদয় হয় নাই।

বাবুর সঙ্গে চাকর অধিক ছিল না। এখানে অধিক লোকের আবশ্যকও ছিল না। যে দুই তিন জন লোক নহিলে নয়, তাহারাই আসিয়াছিল।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

পর দিবস প্রভাতে উঠিয়া আমরা ভ্রমণে বাহির হইলাম। অর্ধ ক্রোশ দূরে একটি ছোট গ্রাম। গ্রামে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাস বড় নাই, কৈবর্ত-সদ্‌গোপের পল্লী। গ্রামে প্রবেশ করিতে কুকুরগুলা ঘেউ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সঙ্গে-সঙ্গে বালকের দল বাহির হইল। স্ত্রীলোকেরা দরজায় আড়াল হইতে আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। আমরা অনেকটা ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

বাগানে প্রবেশ করিতে পাশে মালীর ঘর। ঘরের বাহিরে ফটকের কাছে মালীর কন্যা দাঁড়াইয়াছিল, মহেন্দ্রবাবু আমার অগ্রে গমন করিতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি বাছা?"

মালীর কন্যা ঈষৎ হাসিয়া চক্ষু নত করিল। বামহস্ত দিয়া অঞ্চলের কোণ পাকাইতে লাগিল। কহিল,—"আমার নাম মোক্ষদা।"

এই প্রশ্ন ও উত্তর আমার ভালো লাগিল না। পুষ্করিণীর ধারে মহেন্দ্রবাবু যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা অপরিচিত লোককে দেখিলেই জিজ্ঞাসা করা যায়। কিন্তু পরিচয় পাইয়া আবার বাক্যালাপ কেন? আমি অবশ্য কিছুই বলিলাম না। কেবল মোক্ষদার প্রতি আর একবার ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। সেও আমার প্রতি চাহিয়া দেখিল। চাহনির ভাবটা যেন অপ্রসন্ন।

দিন কয়েকের মধ্যে মহেন্দ্রবাবুর আচরণে কিছু পরিবর্তন দেখিতে পাইলাম। কিছু অন্যমনস্ক, একা থাকিতে ভালোবাসেন। বেড়াইবার সময় আমাকে আর বড়-একটা ডাকিতেন না, একাই বেড়াইতেন। দুই একবার বাগানে বা পুষ্করিণীর ধারে দেখিলাম মোক্ষদা দাঁড়াইয়া আছে, অথবা চলিয়া যাইতেছে, মহেন্দ্রবাবুও যেন সেইখানে হঠাৎ উপস্থিত হইতেন। হয়তো একটা কথা হইত, হয়তো কথা হইত না। দুইজনে দুইদিকে চলিয়া যাইত। আমি আর বড় বাড়ির বাহির হইতাম না, ভ্রমণের সময় দূরে কোথাও চলিয়া যাইতাম। আমি আর কি বলিব? যাহার যেমন অভিরুচি।

কিন্তু মোক্ষদার উপর বড় রাগ হইল। একদিন তাহাকে একেলা দেখিতে পাইয়া কহিলাম, "দেখো, কাজটা বড় ভালো হইতেছে না।"

মোক্ষদা চোখ ডাগর করিয়া, বোকা সাজিয়া, আকাশ হইতে পড়িল। কহিল,—"কেন, বাবু, কি কাজটা?"

আমি রাগিয়া কহিলাম,—"মাগীর আবার ন্যাকামি দেখো! বড় মানুষের চোখে পড়িলে কি রাজত্ব পাইবে মনে করিয়াছ না কি? এ তেমন বড় মানুষ নয়। দুদিন পরে তোমার দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না। তখন তোমার দশা কি হইবে?"

মোক্ষদা বড় ভালোমানুষের মতো কহিল,—"বাবু. তোমার মন বড় ভালো, তা নইলে পরের জন্য এত ভাবনা কেন? তা, বাবু, মেয়েমানুষের কি মোসাহেবি জোটে না?"

মুখে একটা দুর্বাক্য আসিল, সামলাইয়া লইলাম। শুধু বলিলাম,—"চুলোয় যাও।"

মোক্ষদা টিপি-টিপি হাসিল, কহিল,—"একা?"

আমি আর দাঁড়াইলাম না। স্ত্রীলোকের মুখের ধার যে সর্বত্রই এইরূপ, তাহা জানিতাম না। বুঝিলাম, মোক্ষদা সামান্য পাড়াগেঁয়ে স্ত্রীলোক নয়।

তাহাকে আমি তখনও মোটেই চিনিতে পারি নাই।

৷৷ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৷৷

একটু পরেই আমার বড় ভয় হইল। যদি মোক্ষদা মহেন্দ্রবাবুকে বলিয়া দেয়? আমার কোনও কথায় থাকিবার আবশ্যক কি? মনে বিশ্বাস হইল যে, আর এক রাত্রিও আমায় এখানে বাস করিতে হইবে না। কিন্তু সেটা আমরা ভ্রম। মোক্ষদা কি করিল বা বলিল জানি না, কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর মুখে কোন উচ্চবাচাই শুনিলাম না।

আর একদিন গেল। রাত্রে আমি শয়ন করিয়াছিলাম। দিব্য নিদ্রিত রহিয়াছি, এমনসময় ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম, ঘরে যে আলোক জ্বলিতেছিল, তাহা নিভিয়া গিযাছে। এরূপ আর কোনও রাত্রে হয় নাই। নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াই আমাব মনে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল।

অন্ধকারে ঘরের ভিতর একটা বিড়াল ডাকিল। তখন আমি বাস্তবিকই ভীত হইলাম। ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছিলাম, বিড়ালের প্রবেশের কোনও পথ ছিল না। বিড়াল হইলেই বা প্রদীপ নিভাইবে কেন? বিড়াল কি না তাহাই আমার মনে সন্দেহ হইল।

বিড়ালের শব্দ আর শুনিতে পাইলাম না। একটু পরে নিশ্বাস পতনের শব্দ শুনিতে পাইলাম। শব্দ যেন আমার নিকটে আসিতে লাগিল, কিন্তু পদশব্দ নাই। আমার খাটের চারিদিকে নিশ্বাসের শব্দ যেন ঘুরিতে লাগিল।

অত্যন্ত ভয় হইল। নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিলাম। সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল। চোর হইলে কি বিড়াল সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে, না বিড়ালের মতো শব্দ করে?

নিশ্বাস শব্দ আবার দূরে চলিয়া গেল, আর শুনিতে পাইলাম না। অকস্মাৎ আমার খাটখানা নড়িয়া উঠিল। খাট উপরে উঠিতে লাগিল, শিয়রের দিক নিচে রহিল, পায়ের দিক উপরে উঠিতে লাগিল। খানিক উঠিয়া খাটখানা পড়িয়া গেল। খাটে মাথা ঠুকিয়া মাথায় অত্যন্ত আঘাত লাগিল। আর আমি স্থির হইয়া রহিতে পারিলাম না। খাট হইতে নামিয়া পড়িলাম। নামিয়া পড়িতেই যেন অস্ফুট পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। পদশব্দ যেন ঘরের প্রান্তে চলিয়া গেল। তাহার পর, দ্বার উদ্ঘাট করিলে অথবা কুলুপে চাবি দিলে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম। তাহার পর আর কিছু শুনিতে পাইলাম না।

এরূপ স্পষ্ট ধারণা তখন হইল না। তখন আপাদমস্তক ঘর্মাক্ত হইল। পা কাঁপিতে লাগিল। কণ্ঠ-জিহ্বা শুষ্ক হইতে লাগিল। চোর নয় বিশ্বাস হইল। চিৎকার করিতেও সাহস হয় না। পাশের ঘরে বাবু শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ কেমন করিয়া করি? আর জিজ্ঞাসা করিলেই বা কি বলিব? ইংরাজি পড়িয়া ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করিব কেমন করিয়া? মাথায় হাত দিয়া দেখি, মাথার পিছনে বিলক্ষণ ফুলিয়াছে। ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করি, আর নাই করি, মাথার আঘাত ও তাহার নিদর্শন অস্বীকার করিতে পারি না। আর সব স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু মাথায় যে লাগিয়াছে, সে পক্ষে তো কোনও সন্দেহ নাই।

অনেকক্ষণ যখন আর কিছু শুনিতে পাইলাম না, তখন অতি অল্প ঈষৎ সাহস

হইল। মনে পড়িল, খাটের কাছে জানালার উপর একটা দেশলাইর বাক্স আছে। অনেক হাতড়াইয়া, অনেকবার অকারণে ভয় পাইয়া, দেশলাইর বাক্স পাইলাম। একটা কাঠি জ্বালিয়া দেখিলাম, আলোকে তৈল রহিয়াছে, আপনি নিভিয়া যায় নাই। ঘরে বায়ু প্রবেশের পথ নাই। কে আলোক নিভাইল।

ঘরের দরজা আমি যেমন বন্ধ করিয়াছিলাম, সেইরূপ বন্ধ রহিয়াছে। ঘরে মাদুর পাতা, সুতরাং পদচিহ্ন লক্ষিত হয় না। কিছুই বুঝিতে না পরিয়া অনুসন্ধানে বিরত হইলাম। রাত্রে আর নিদ্রা হইল না। আলোকের নিকট বসিয়া অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভোরে উঠিয়া নিচে নামিয়া গেলাম। নূতন গৃহস্বামীর আগমনে মালীর কিছু কর্ম বাড়িয়াছিল। দেখিলাম, সে বাগানের একদিক পরিস্কার করিতেছে। তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি এখানে কত দিন আছ?"

মালী বলিল,—"আজ্ঞে, অনেক দিন। দশ বছর কি কুড়ি বছর হবে।"

"ইহার ঊর্ধ্ব নয়?"

মালী আকাশের দিকে দেখিতে লাগিল। তাহাতে যেন গণনার কিছু সুবিধা হইল। কহিল, "আজ্ঞে তা হবে। পঁচিশ বছর হবে।"

"বাড়ির কিছু দুর্নাম আছে?"

"দুর্নাম—কই, না। মস্ত বাড়ি, রাজবাড়ির মতো, দুর্নাম হবে কেন? বাবু, আমরা এতদিন আছি, আমাদের তো কখন দুর্নাম হয়নি। আমরা গরীব মানুষ, খেটে খাই, দুষ্কর্ম কখনও করিনি।"

ভালো লোককে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলাম। বুঝাইয়া বলিলাম,—"তোমার কথা নয়। তুমি বিশ্বাসী লোক জানি। বলি, এই বাড়িতে কখনও কিছু দুর্ঘটনা হয়েছিল। তোমরা কখনও কিছু দেখিতে পাও, শুনিতে পাও।"

"রাম, রাম, রাম," বলিয়া মালী উঠিয়া দাঁড়াইল। সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কহিল, "দুর্ঘটনা তো সব বাড়িতে হয়। এমন বিশেষ কিছু—"

আমি স্পষ্ট বুঝিলাম, লোকটা কোনও কথা গোপন করিতেছে। বলিলাম,—"তুমি যাহা জান, সত্য বলো, আমি কাহাকেও কিছু বলিব না। বাবু ও-সব কিছু মানেন না।"

তখন মালী চারিদিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"বাবু, শুনেছি, আগেকার বাবুদের একটা বউ তেতালার ছোট ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। আর-একবার—"

"আর-একবার কি?"

"আর একবার একটি বিধবা মেয়ে পুকুরে ডুবে মরেছিল। সে অনেক দিনকার কথা। আমি কখনও কিছু দেখিনি। রাত্রে আমি কখনও বাড়ির ভিতর যাই না।"

ভূত-পেত্নী যদি থাকে, তাহা হইলে এইরকম ভূতেরই উপদ্রব সম্ভব। কিন্তু আমার উপর প্রথমেই উপদ্রব কেন? দিনের বেলা কতক সাহস ফিরিয়া আসিয়াছিল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখি, বাড়ির সম্মুখে মহেন্দ্রবাবু, ঘাসের উপর পাইচারি করিতেছেন। আমাকে একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া কহিলেন,—"কিহে সূর্যি, তোমায় শুক্‌নো-শুক্‌নো দেখ্‌ছি কেন?"

"আজ্ঞা, রাত্রে নিদ্রা ভাল হয় নাই।"

"বটে, ব্যাপারখানা কি বল দেখি! আমারও নিদ্রা ভাল হয় নাই। কি হইয়াছিল, শুনি?"

মহেন্দ্রবাবুর মুখে দেখিলাম, অনিদ্রা অথবা মানসিক ভীতিবিকারের কোনও চিহ্ন নাই। বরং মুখ প্রফুল্ল, যেন কোনও সুখস্বপ্ন দেখিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছেন। যে কারণে আমার নিদ্রা হয় নাই, সেই কারণে ইঁহারও নিদ্রাভঙ্গ হইলে মুখ এত প্রফুল্ল হইত না।

সেইজন্য কথাটা একেবারে খুলিলাম না। বলিলাম,—"নূতন জায়গা, সেই জন্য বোধহয় নিদ্রার ব্যাঘাত হয়।"

"তাহা হইলে এতদিন হয় নাই কেন? ও কোনও কথা নয়, কি হইয়াছিল, বল।"

আমি বলিলাম,—"আপনি কোনও শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন?"

মহেন্দ্রবাবু কহিলেন,—"আমি কিছু শুনিয়াছিলাম, কিছু দেখিযাছিলাম। তুমি কি দেখিয়াছিলে?"

"আমি কিছুই দেখি নাই। কেবল শব্দ শুনিয়াছিলাম।"

"কিসের শব্দ?"

বাবুর মুখ দেখিয়া ধাঁ করিয়া আমার মুখে মিথ্যা কথা আসিল। "ছোট ছেলের কান্নার শব্দ শুনিয়াছিলাম।"

"আর কিছু?"

"আর কিছু না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি কি শুনিয়াছিলেন?"

"বৃদ্ধের হাসির শব্দ।"

"কি দেখিয়াছিলেন?"

"একটা বৃদ্ধের মূর্তি।"

মহেন্দ্রবাবু মিথ্যা কথা বলিতেছেন, স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। এমন বিষয়ে সত্য কথা গোপন করিবার তাঁহারই বা কি উদ্দেশ্য, আমারই বা কি উদ্দেশ্য, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া কহিলেন, "বাড়িটা হানা বোধহয়। তুমি ভূতে বিশ্বাস করো?"

আমি কহিলাম,—"ভূত তো কখনও দেখি নাই।" কথাটা সত্য।

বাবু কহিলেন,—"যা হোক, বেশ হয়েচে। নিষ্কর্মা না থাকিয়া একটা কাজ পাওয়া গিয়াছে। ভূত ধরা যাইবে। কি বল?"

মোসাহেবের যাহা বলা কর্তব্য, তাহাই বলিলাম,—"আপনার যেমন ইচ্ছা।"

মহেন্দ্রবাবু কহিলেন,—"কিন্তু একটা কথা আছে। ভূত দেখিতেছি রকমারি। আমরা দুইজনে একত্র থাকিলে চলিবে না। নিচেকার তলায় ভূত আছে কিনা দেখিতে হইবে। আমি আজ হইতে নিচে শয়ন করিব।"

ভূত ধরিবার উত্তম উপায় বটে। যে স্থানে ভূতের সঙ্গে প্রথম দেখা, সেই স্থান হইতে পলায়ন। আমি কহিলাম,—"আমি কি তবে দোতলায় একা থাকিব?"

"তবে কোথায় যাইবে?"

"নিচে।"

"স্বচ্ছন্দে। কিন্তু তাহা হইলে আমি দোতলায় কিম্বা তেতলায় শুইব।" বাবুর কথাগুলা কিছু শুষ্ক।

ভূত ধরিতে বাবুর যতখানি ইচ্ছা, আমাকে নিকটে শয়ন করিতে দিতে ঠিক ততখানি অনিচ্ছা। আমি কহিলাম,—"আজ্ঞে না, আমি যেখানে শয়ন করি, সেইখানেই থাকিব। আপনি নিচের তলায় শয়ন করিবেন।"

বাবু আর কিছু না বলিয়া, গুন-গুন করিয়া গান করিতে-করিতে ঘরে উঠিয়া গেলেন।

মনে অনেক কথা উঠিতে লাগিল। একটু ভাবিবার জন্য বাগানের দিকে গমন করিলাম। যে দিকে গাছপালা বেশি, সেই দিকে গমন করিলাম। দেখি, গাছেব তলায় একটু অন্ধকারে মোক্ষদা চুল এলো করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় পর্যন্ত দিল না।

আমাকে দেখিয়া মোক্ষদা মৃদু-মৃদু হাসিয়া, ধীরে-ধীরে, স্পষ্টাক্ষরে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু মহাশয়, কাল রাত্রে কি ভালো ঘুম হয়েছিল?"

এ কথা সে কেন আমায় জিজ্ঞাসা করিল? তীব্র দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম। সেই মৃদু-মৃদু হাসি, হাসির সহিত অধবপ্রান্তে যেন একটু ব্যঙ্গ, চক্ষে স্থির কটাক্ষ। তাহাকে দেখিয়া, মনে-মনে, অজ্ঞাতে, আমার ভয় হইল। মুখে কহিলাম,—"পাপীয়সী, তুমি কি মনে করো, তোমার জন্য কাহারও ঘুম হয় না।" এই বলিয়া আমি বেগে চলিয়া গেলাম।

আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, মোক্ষদা আর যাহাই করুক, আমার কোনও কথা কাহাকেও বলে না। বলিলে তাহারও বিপদের সম্ভাবনা।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

আহারাদির পর, একটু বিশ্রাম করিব বলিয়া, যে ঘরে রাত্রে শয়ন করিয়াছিলাম, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলাম। কিন্তু শয়নের ইচ্ছা আদৌ ছিল না।

মোক্ষদার মুখে সেই বিদ্রূপের কথা শুনিয়া আমার মনে অনেক কথা উদয় হইতেছিল। নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিবার জন্য ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম।

এই কয়েকটা কথা আমার মনে হইতেছিল। রাত্রে আমার নিদ্রা হয় নাই, মোক্ষদা এ কথা অবগত ছিল। আর কাহারও কাছে এ কথা শুনে নাই, ইহাও নিশ্চিন্ত। মহেন্দ্রবাবুও রাত্রে কিছু দেখিয়া অথবা শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু তিনি তাহাতে ভয় পান নাই। যাহা দেখিয়া অথবা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে এই পর্যন্ত স্থির করিয়াছিলেন যে, আমার পার্শ্বের ঘরে শয়ন করিবেন না। আমি যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে আমার ভয় হইয়াছিল। এই নকল ঘটনার ভিতর নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে।

ঘরে বসিয়া কিছুক্ষণ আমি এই সকল কথা ভাবিলাম। তাহার পর উঠিয়া ঘরের চারিদিকে দেয়ালে তন্ন-তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিলাম। কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না। ঘরে একটা ছড়ি ছিল। সেইটা হাতে করিয়া দেয়ালের চারিদিকে ধীরে-ধীরে আঘাত করিতে লাগিলাম। মেজে হইতে দুই-আড়াই হাত উপরে লক্ষ্য করিয়া, এক বিঘত প্রমাণ অন্তরে-অন্তরে আঘাত করিতে লাগিলাম ও মনোযোগপূর্বক শব্দ লক্ষ করিতে লাগিলাম। হঠাৎ এক স্থানে শব্দের বৈলক্ষণ অনুভূত হইল। দুই-চারি বার আরও শব্দ করিলাম। বুঝিতে পারিলাম, সেই স্থানে দেয়াল নিরেট নয়। তখন উত্তমরূপে লক্ষ করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

দেয়ালে নীল রং। চারিদিকে ছবি। আমি লাঠির আঘাতে যেটুকু স্থানে শব্দবৈলক্ষণ্য বোধ হইতেছিল, নির্দেশ করিলাম। পকেটে পেন্সিল ছিল। পেন্সিল দিয়া চারিধারে সূক্ষ্ম রেখা টানিলাম। তাহার পর চারিদিকে করাঘাত করিতে লাগিলাম। নিচের দিকে করাঘাত করিতে আর এক রকম শব্দ হইল। সেই অংশে হাত রাখিয়া জোরে ঠেলা দিলাম। খট্ করিয়া অল্প শব্দ হইল। একটি ক্ষুদ্র দ্বাব মুক্ত হইয়া গেল। দ্বার দেয়ালে এরূপ করিয়া বসানো ছিল যে, বন্ধ করিলে কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। দেয়ালের একটি বিশেষ স্থানে আঘাত না করিলে মুক্তও হয় না। দ্বারের নিচে সিঁড়ি রহিয়াছে। নিচে অন্ধকার।

ঘরে বাতি ছিল। বাতি জ্বালিয়া সিঁড়িতে নামিলাম। নামিয়া সম্মুখে সঙ্কীর্ণ পথ দেখিতে পাইলাম। খানিক গিয়া দেখিলাম, চৌমাথার মতো, চারিদিকে চারিটা পথ। বরাবর সম্মুখে গিয়া দেখিলাম, আর একটি দরজা, বন্ধ রহিয়াছে। অনুমান হইল, দরজা ভিত্তির নিকট কিম্বা বাটীর প্রান্তভাগে। সে দরজা আর খুলিলাম না। ফিরিয়া আসিলাম। আমার ঘরের নিকটে আসিয়া আলোক ধরিয়া ভালো করিযা দেখিলাম, আর একদিকে উপরে যাইবার সিঁড়ি রহিয়াছে। সে দিকে গিয়া দেখিলাম, সিঁড়ির উপরে আর এক দরজা। আমি ক্ষান্ত হইলাম, আর কোনও দরজা খুলিবার চেষ্টা কবিলাম না।

ফিরিয়া আসিয়া আমার ঘরের দেওয়ালের দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। মনে হইল, রাত্রেও এইরূপ শব্দ শুনিয়াছিলাম। এরূপ কৌশলে বাড়ি কেন নির্মিত হইযাছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু বুঝিলাম, অনেক ঘরেই এইরূপ গুপ্ত প্রবেশের পথ আছে, এবং সেই পথ অবগত থাকিলে যে কেহ স্বচ্ছন্দে রুদ্ধদ্বার গৃহেও প্রবেশ কবিতে পারে। রাত্রে ভূতের দৌরাত্ম্যে বড় ভয় পাইযাছিলাম। এখন স্থির করিলাম, ভূত আসিলে সহজে ধরিতে পারিব।

মহেন্দ্রবাবু বৈকালে ভ্রমণে বাহির হইলেন না। দেখিলাম, কিছু মৌনভাব, বড় কথা কহিতে চাহেন না। আমি একা বাহিবে গেলাম। সন্ধ্যার পর আহারান্তে বাবু যেমন গল্পগুজব করিতেন, আজ আর তাহা হইল না। আহারের পরই বাবু শয়ন করিতে গেলেন। নিচেকার তলায় একপ্রান্তে একটি ছোট ঘবে তাঁহার শয্যা রচিত হইয়াছিল। আমি আস্তে-আস্তে গিয়া দোতালায় আপনার ঘরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু শয়ন করিলাম না।

যখন সব নিস্তব্ধ হইল, তখন আমি নিঃশব্দে ঘরের দবজা খুলিলাম। বাড়ির ছাদে বসিয়া পেচক ডাকিতেছে, বাগানে ঝিঁঝি পোকার রব। দূর হইতে গ্রামের কুকুরের চিৎকার শোনা যাইতেছে, আকাশে চাঁদ নাই। আমি ঘরের আলোক নিভাইয়া দিলাম। পকেটে দেশলাইয়ের বাক্স ও মোমবাতি ছিল। পাযের জুতা খুলিযা রাখিলাম। ঘরের দরজা ভেজাইয়া দিযা বারান্দায় আসিলাম।

মতলবটা কি? ভূত ধরিব বলিয়া ঘরের বাহির হই না। মহেন্দ্রবাবু কি করিয়া ভূত ধরেন, দেখিবার ইচ্ছা ছিল।

পা টিপিয়া-টিপিয়া নিচে নামিলাম। নিচে বরাবর বড়-বড় থামওয়ালা বারান্দা। যে দিকে বাবুর শয়নগৃহ, সে দিকে জনপ্রাণী ছিল না, চাকরেরা আর-এক দিকে শয়ন করিয়াছিল। অত্যন্ত সাহস না হইলে একেলা অসহায় এমন স্থানে ভূতের সহিত রাত্রিবাস করিতে সাহস হয় না।

ঘরের ভিতর হইতে অল্প আলোকরশ্মি জানালার সার্শি দিয়া বাহির হইতেছিল, দরজাও একেবারে বন্ধ ছিল না। আমি চোরের মতো চুপি-চুপি দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। দরজার নিকটে একটা মস্ত থাম, পাশে দেওয়াল। সেখানে বড় অন্ধকাব।

ঘরের ভিতর দুইজন লোকে কথা কহিতেছে। গলা খুব চাপা, কিন্তু দরজার কাছে দাঁড়াইলে শুনিতে পাওয়া যায়। দুইটার মধ্যে একটাও ভূত নয়, বেশ বুঝিতে পারিলাম। গলা চাপা বটে, কিন্তু কথার বেগ কিছু বেশি। সেই জন্য আরও কিছু স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল।

মহেন্দ্রবাবু বলিতেছিলেন,—"তবে কি তুমি রাজি হবে না?" বাবুর স্বর কাঁপিতেছিল,—রাগে নয়, অনুরাগে।

মোক্ষদা বলিল,—"তুমি কি আমায় অসচ্চরিত্রা মনে করিয়াছ?"

মহেন্দ্রবাবু যেন একটু বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন,—"সেটা মনে করা আমার অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু তুমি এখানে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছ, জিজ্ঞাসা করিতে দোষ আছে কি?"

"আমি তোমার ঘরে কোনও অসদাভিপ্রায়ে আসি নাই।" মোক্ষদার কথা বেশ স্থির, স্বরে একটু তেজ, কিন্তু চাঞ্চল্য কিছুই নাই।

"আচ্ছা, তুমি বিবেচনা করিয়া দেখো, আর দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলে তাদের কি বলিবে? তোমার আমার অবস্থাভেদ বিবেচনা করিয়া দেখো। তোমার সহিত পরিচয় হওয়াই অসম্ভব। তাহার পর তুমি যুবতী, তুমি বিধবা। আমার ঘরে এত রাত্রে একা আসিয়াছ? আমার প্রতি আসক্ত না হইলে কেন তুমি আমার প্রতি এত অনুগ্রহ করিবে?"

"মন্দ অভিপ্রায় ছাড়া কি ভালোবাসিতে নাই? ভালোবাসা কি অসদাভিপ্রায় ছাড়া কখনও হয় না? তোমার ঘরে আমি কোনও মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই। শুধু তোমায় ভালোবাসি বলিয়া আসিয়াছি।"মোক্ষদার কথা যেন মাখম-মিছরি-মাখা, স্বরে যেন মধু মাখাইয়াছে।

বাবু একেবারে গলিয়া গেলেন। "তাই তো ঠিক! এতে তো মন্দ অভিপ্রায়ের কথাই নেই। তুমি আমায় ভালোবাস, আমি তোমায় ভালোবাসি। ইহাতে লোকে কিছু মনে করিলেই বা?"

"আমি তোমায় যেমন ভালোবাসি, তুমি কি আমায় তেমন ভালোবাস?" সেই স্বর, মধুর মাত্রা কিছু বেশি।

"বাসি না? মোক্ষ, তবে তুমি আমার মন কিছুই জান না। আমি যে দিনহইতে তোমায় দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে ভালোবাসি। আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি আর আমায় যন্ত্রণা দিও না। কি চাও তুমি? যাহা চাও, তাহাই দিব। আমাকে আর কষ্ট দিও না।"

মোক্ষদা কহিল,—"আমি তোমা বই আর কাহাকেও কখনও ভালোবাসি নাই, কখন বাসিবও না। কিন্তু মাথার উপর ধর্ম আছেন। আজ পর্যন্ত অধর্ম করি নাই। প্রাণান্তেও ধর্মত্যাগ করিব না।"

মহেন্দ্রবাবু বিস্মিতের ন্যায় কহিলেন,—"আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ভালবাসার আবার ধর্মাধর্ম কি?"

"ভালোবাসা কি অধর্ম?"

"কে বলিল?"

"তবে তুমি আমায় ধর্ম মতে ভালোবাস না কেন?"

"কি রূপে?"

"আমায় বিবাহ করো।"

ঘরের ভিতর যেন একটা পাথর পড়িল। কাহারও মুখে কোনও কথা নাই, কিছু পরে হাসির শব্দ শুনিলাম—মহেন্দ্রবাবু একটু হাসিলেন। পরক্ষণেই মোক্ষদা অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিল, "ছাড়, ছাড়, আমার হাত ছাড়, নহিলে চেঁচাইব।"

"চেঁচাও। কেহ আসিলে তোমায় জিজ্ঞাসা করিতে বলিব, তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে। তোমার অনিচ্ছা থাকিলে আমি তোমায় কেমন করিয়া ধবিযা আনিলাম।"

"আমি সকল কথাই বলিব, কোনও কথা গোপন করিব না। এখনি লোক জড়ো করিব। ছাড় বলচি।" শেষের দুইটা কথা বেশ জোরে বলিল। মোক্ষদা চুপ করিল দেখিয়া, আমি মনে করিলাম, তাহার হস্ত মুক্ত হইয়াছে।

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"তুমি পাগল।"

মোক্ষদা পূর্বের ন্যায় ধীর তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল,—'যদি তোমাব কথা এখন শুনি, তাহা হইলে সত্যই পাগলের কাজ হয। তোমার কি? দু-দিনের সখ দু-দিন পবে মিটিয়া যাইবে। পাড়াগাঁয়ে একটা পুতুল কুড়াইয়া লইয়া দু-দিন খেলা করিয়া ভাঙিয়া-ফেলিয়া শহরে চলিয়া যাইবে। তোমায় আমি বড় ভালোবাসি, তাই আমি ধর্মত্যাগ কবিব না। আর অধর্মের কথাও শুনিব না।"

আমি থামের আড়ালে লুকাইলাম। মোক্ষদা দরজা খুলিয়া নিঃশব্দে বেগে চলিয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ বাহিরে আসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন সে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, তখন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিযা ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিলেন।

বুঝিলাম, মহেন্দ্রবাবু ভূত ধরুন আর না ধরুন, তাঁহাকে বিষম ভূতে ধরিয়াছে। আমি উপরে গেলাম। সে রাত্রে বিড়াল ও ভূতেব আবির্ভাব হইল না।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

তাহার পর এক নূতন রঙ্গ আরম্ভ হইল। মহেন্দ্রবাবু বিমর্ষ, ব্যাকুল, সর্বদাই যেন অন্যমনস্ক, কাহারও সহিত বড় কথা কন না, যেন কিছু ভালোলাগে না। বাগানে, পুষ্করিণীর ধারে একা ঘুরিয়া বেড়ান। মোক্ষদা তাঁহার সম্মুখে বড় বাহির হয় না। তাঁহার সম্মুখে পড়িলে মাথায় কাপড় দিয়া চলিয়া যায়। একেবারে যে তাঁহার চক্ষে পড়ে না, তাহা নয়, কিন্তু তাঁহার সহিত বড় কথা কয় না। কথা কহিবার অবকাশ দেয় না। মহেন্দ্রবাবু বন্ধনে আরও জড়িত হইতে লাগিলেন।

একদিন মহেন্দ্রবাবু মুখে অত্যন্ত বিকৃতির লক্ষণ দেখিলাম। চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ, ঠোঁট শুষ্ক। দেখিয়া ভয় হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনার কোনও অসুখ করিয়াছে?"

মহেন্দ্রবাবু কিছু ক্ষীণ স্বরে কহিলেন,—"না, তুমি সেই এক রাত্রে কিসের শব্দ শুনিয়াছিলে, মনে আছে?"

"আছে, আপনি আর কিছু দেখিয়াছেন?"

বাবু বলিলেন,—"সেই কথা তোমায় বলিব মনে করিয়াছিলাম। কাল রাত্রে অনেক রকম বিকট শব্দ শুনিয়াছিলাম। ভূতে বিশ্বাস না থাকিলেও মনে কেমন সন্দেহ হইতেছে।"

আমি কহিলাম,—"আপনি এ রকম একা শয়ন করেন কেন? আমি কেন আপনার নিকটে শয়ন করি না? না হয় কোনও চাকর দরজার কাছে শয়ন করুক না।"

"না, না। আমি একাই ইহার কারণ অনুসন্ধান করিব। আমি কিছু ভয় পাই নাই।"

আর্শিতে যদি তখন নিজের মুখ দেখিতে পাইতেন তো মহেন্দ্রবাবু বুঝিতে পারিতেন, তাঁহার মুখে ভয়ের চিহ্ন ছিল কিনা। আমি কহিলাম,—"ভয় না পান, নিদ্রার তো ব্যাঘাত হয়। তাহা হইলে শরীর খারাপ হইবে।"

মহেন্দ্র বাবু কহিলেন,—"না না, কিছুই হইবে না। তুমি আর কিছু দেখিয়াছ?"

"না।"...

"আশ্চর্য" বলিয়া মহেন্দ্রবাবু পাইচারি করিতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন।

সেদিন আমি বাড়ির বাহির হইলাম না। দোতালার একটি ঘরে সার্শি ভেজাইয়া দিয়া বসিয়া রহিলাম। সেখান হইতে বাগানের কতক অংশ ও পুষ্করিণী দেখা যায়।

অপরাহ্নের সময় মোক্ষদা গা ধুইতে আসিল। গা ধুইয়া উঠিয়া যাইবে, এমন সময় মহেন্দ্রবাবু উপস্থিত হইলেন। মোক্ষদা জলের বাহিরে আসিয়া জলের নিকট প্রথম সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছে, সে দিকে জনমনুষ্য তখন ছিল না। মহেন্দ্রবাবু একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর—আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম—মোক্ষদার পা ধরিলেন।

আমি চারিদিকে দেখিতে লাগিলাম, যেন কেহ দেখিতে পাইলে আমারই বিশেষ লজ্জার কারণ।

মোক্ষদা কি একটা সঙ্কেত করিল, হয়তো একটা কথাও কহিল। সেই সঙ্গে পা ছাড়াইয়া লইয়া আর্দ্রবস্ত্রে ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল।

আমি রাত্রিকালে গোপনে বাবুর গৃহদ্বারে আবার উপনীত হইলাম। কাজটা হয়তো বড়ই গর্হিত হইতেছিল, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, যে মহেন্দ্রবাবুর বিশেষ বিপদ উপস্থিত। তাঁহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা আমাব কর্তব্য। সাবধান হওয়াও অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ, যে মহেন্দ্রবাবুব সর্বনাশের চেষ্টা করিতেছিল, সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।

মোক্ষদা বলিতেছিল,—"আজও কি মন্দ অভিপ্রায়ে আসিযাছি নাকি?"

মহেন্দ্রবাবু কাতর স্বরে কহিলেন,—"আমি আর কিছু বলিব না। দেখো, তোমার শরীরে যদি একটুও দয়া থাকে তো আমাকে আর কষ্ট দিও না। আমি সর্বস্ব ত্যাগ করিব, কিন্তু তোমার আশা ত্যাগ করিতে পারিব না।"

মোক্ষদা কহিল,—"আমি তোমারই। ধর্মভাবে যে দিন গ্রহণ করিবে, সেই দিন আমি তোমার।" তাহার স্বরের কোমলতায় ও মাধুর্যে আমি ভীত হইলাম।

"ও কি কথা?"

মোক্ষদা কহিল,—"ও কথা তো আমি আগেই বলিয়াছি।"

মহেন্দ্রবাবু আরও কাতর স্বরে কহিলেন,—"তুমি যে বিধবা।"

"বিধবায় কি বিবাহ হয় না?"

"তুমি যে আমার স্বজাতি নও, তোমাকে বিবাহ করিলে আমি জাতিভ্রষ্ট হইব, সমাজে আর মুখ দেখাইতে পারিব না।"

"তোমাকে সমাজভ্রষ্ট কে করিবে? আর আমার জন্য যদি জাতিভয়ই না ছাড়িতে পারিলে তো আর ভালোবাসা কি?"

মহেন্দ্রবাবু একটু চুপ করিয়া কহিলেন,—"দেখো, এ বাড়িতে অধিক দিন থাকিতে পারিব না। বোধহয় হানা বাড়ি।"

মোক্ষদা কহিল,—"কবে যাইবে?"

মহেন্দ্রবাবু কহিলেন,—"তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।"

মোক্ষদা কহিল,—"আমি কি তোমার সহিত যাইতে অনিচ্ছুক? আমাকে বিবাহ করিয়া লইয়া চলো না?"

"এখানে কি করিয়া হইবে?"

"কেন? ব্রাহ্মণ পুরোহিত এখানে আসিতে পারে, বিধবাবিবাহের পুরোহিত এখানে আসিতে পারে না?"

"তুমি আমার সঙ্গে কলিকাতায় চলো, সেখানে একটা ঠিক হইবে।"

"তুমি আমাকে বিবাহ না কবিলে তোমার সঙ্গে এ বাড়ির বাহিরে এক পা যাইব না।"

মহেন্দ্রবাবু আর কোনও কথা কহিলেন না। মোক্ষদা গলা আর একটু খাটো করিয়া কহিল, "তুমি বলিতেছিলে হানাবাড়ি। কেন, তুমি কি কিছু দেখিয়াছ নাকি?"

মহেন্দ্রবাবুও ভীতিসূচক স্বরে কহিতে লাগিলেন, "বড় ভযানক সব শব্দ শুনিয়াছি। একবার একটা পুরুষ আর একবার একটা স্ত্রীলোকের মূর্তি দেখিয়াছি। এখানে আর বাস করিতে পারিব না।"

মোক্ষদা কহিল,—"লোকে কি বলে শুনিয়াছ?"

"না।"

"যাহারা এ বাড়িতে প্রথমে বাস করিত, তাহাদের একটি বিধবা মেয়ে ছিল। মেয়েটি যুবতী। এই বাড়িতে তাহার চরিত্র মন্দ হয়। বাড়ির লোকের কানে সে কথা উঠিলে মেয়েটি আত্মহত্যা করে। তুমি যে ভয় পাও, তাহাব কারণ বোধহয় তোমাব মনে পাপ আছে।"

"যখন তোমার সঙ্গে কোনও বিশেষ কথা হয় নাই তখনও তো একদিন কিছু দেখিযাছিলাম।"

"তখন কি ভয় পাইয়াছিলে?"

"না।"

"তবে এখন ভাবিয়া দেখো, সত্য বলিয়াছি কি না।"

মহেন্দ্রবাবু কিছু বেগের সহিত কহিলেন,—"চলো, আমার সঙ্গে চলো। এখানে আর থাকিতে সাহস হইতেছে না।"

মোক্ষদা বলল,—"আমার যাওয়া না যাওয়া তোমার হাত। যে দিন আমাকে বিবাহ করিবে, সেই দিনই তোমার সঙ্গে যাইব।"

মহেন্দ্রবাবু কহিলেন,—"আমি পাগলের মতো হইয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কেবল এই পর্যন্ত মনে হইতেছে যে তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। দুই দিন আমায় ভাবতে দাও। একটু ভাবিয়া দেখি।"

মোক্ষদা বলিল,—"তবে সেই কথা রহিল। যত দিন তুমি কিছু স্থির না করিতে পার, আমায় আর ডাকিও না। আমি আর আসিব না।

দ্বার নিঃশব্দে মুক্ত হইল। আমি থামের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিলাম। মোক্ষদার পশ্চাতে মহেন্দ্রবাবু বাহিরে আসিলেন, কহিলেন,—"আবার কবে আসিবে বল?"

মোক্ষদা কহিল,—"যে দিন তুমি বিবাহের আয়োজন করিবে।"

একবার মহেন্দ্রবাবুর হাত ধরিয়া মোক্ষদা চলিয়া গেল। মহেন্দ্রবাবুর সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

পর দিবস বাগানে একবার মোক্ষদার সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে ফুল তুলিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেমন, পাখি ফাঁদে পড়িয়াছে?"

মোক্ষদা অত্যন্ত তীব্র দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিল। অনেকক্ষণ পরে কহিল,—"তুমি কি গোয়েন্দা? তোমার মনিব কে?"

আমি কহিলাম,—"একটু সাবধানে থাকিও। তোমার কথায় আমি ভয় পাইব না।"

মোক্ষদা মৃদু স্বরে কহিল,—"আমার সঙ্গে শত্রুতা করিয়া তোমার ফল কি? এককথায় তোমায় তাড়াইতে পারি, জান?"

আমি কহিলাম,—"জানি। তাই ভাবিতেছি, তুমি আগে আমায় তাড়াইবার চেষ্টা করিবে না আমি তোমায় তাড়াইবার চেষ্টা করিব।"

"দেখা যাবে।"

আর কোনও কথা হইল না।

রাত্রে আমি একটু সাবধান হইয়া শয়ন করিলাম। বালিশের তলায় দেশলাই ও বাতি সর্বদা থাকিত। ঘরের আলোক নিভাইয়া দিলাম।

অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল। খট করিয়া অল্প শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি সে শব্দ জানিতাম। চুপ করিয়া রহিলাম। ক্রমে নানাবিধ ভৌতিক শব্দ হইতে লাগিল। আমি নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অতি সাবধানে কিছুমাত্র শব্দ না করিয়া যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, তাহার বিপরীত দিকে ঘরের এককোণে গিয়া দাঁড়াইলাম। সহসা আলোক উৎপাদন করিলাম।

আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার নিকটেই গুপ্ত পথ। দরজা খোলা ছিল। আলোক দেখিয়া ভূত বেগে সেই দরজায় প্রবেশ করিল।

আমি ভূতের কাপড় ও কেশ ধরিলাম। ভূত নিরুপায় দেখিয়া ঘরে ফিরিল। আমি ক্ষুদ্র দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম।

দেখিলাম—মোক্ষদা। আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হইলাম না। ধরা পড়িয়া মোক্ষদা ভয়ে অস্থির হইল, কিন্তু চিৎকার করিবার কোনও উপক্রম করিল না।

আমি আর-একটা দেশলাই জ্বালিয়া বাতি জ্বালিলাম। নিশ্চিন্ত হইয়া খাটে বসিলাম। মোক্ষদা দাঁড়াইয়া রহিল। কহিলাম,—"পলাইবার চেষ্টা করিও না। যে পথে তুমি আসিয়াছ, সে পথ আমি জানি।"

মোক্ষদা পলায়নের চেষ্টা করিল না, কোনও কথা কহিল না, দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি কহিলাম,—"যে পথ দিয়া আসিয়াছ, সে দিক দিয়া আর যাইতে পাইবে না। কাল সকলে উঠিলে পর সিঁড়ি দিয়া সকলের সম্মুখ দিয়া নামিয়া যাইতে হইবে।"

মোক্ষদা শিহরিল, চক্ষে আঁচল দিল। ভগ্ন স্বরে কহিল,—"এখন তোমার হাতে পড়িয়াছি,যাহা ইচ্ছা হয়, তাই করো।"

আমি কহিলাম,—"তুমি আমার ঘরে কোনও মন্দ অভিপ্রায়ে আইস নাই, তাহা আমি জানি।"

মোক্ষদা আঁচল ছাড়িয়া দিল, আমার মুখের দিকে চাহিল।

আমি কহিলাম,—"তুমি আমায় ভালোবাস বসিয়া আসিয়াছ, আর কোনও তোমার ইচ্ছা নাই।"

মোক্ষদার চক্ষু স্থির হইল, তাহার চক্ষে ভয়ের লক্ষণ দেখিতে পাইলাম।

আমি কহিলাম,—"আমি যদি তোমার হাত ধরি, তাহা হইলে তুমি চিৎকার করিয়া লোক জড়ো করিবে! তাহাদের সাক্ষাতে সকল কথা বলিবে, কেমন?"

মোক্ষদা হাত জোড় করিল, কহিল,—"আর আমাকে লজ্জা দিও না। তুমি সব জান।"

আমি অল্প-অল্প হাসিতে লাগিলাম।

মোক্ষদা একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। আর একটু কাছে আসিল। কহিল,—"তুমি এইমাত্র বলিতেছিলে, সম্মুখ দরজা দিয়া আমায় নিচে যাইতে হইবে। তোমার তাহাতে কি লাভ?"

আমি কহিলাম,—"তুমি রাত্রে কোথায় ছিলে, সকলে জানিতে পারিবে। তাহা হইলে তোমার বিবাহের সুবিধা হইবে।" মুখের ভাব আমার বড় গম্ভীব।

মোক্ষদা বলিল,—"সে কথা বুঝিলাম। আমাব যেন মাথা হেঁট হইল। কিন্তু তোমার কি কোনও ভয় নাই? বাবু কি তোমায় কিছু বলিবেন না?"

"সে কথাও তো ঠিক! সে কথাটা ভাবি নাই।" আশ্চর্য হইয়া আমি মোক্ষদার দিকে চাহিলাম। কথাটা শুধু ছলনা। ভাবিয়াছিলাম অনেকক্ষণ।

মোক্ষদা আর-একটু কাছে আসিল। "আমার যাহাই হউক, তুমি আর বাবুব কাছে মুখ দেখাইতে পারিবে না। ইহাতে লোকসান দুইজনের, লাভ তো কাহাবও দেখিতেছি না। আমার সঙ্গে কি তোমার এতই শত্রুতা যে তুমি নিজেব ক্ষতি করিয়া আমার ক্ষতি করিতে চাও? আমি তোমাব কি করিয়াছি?"

আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিলাম,—"কিছু না।"

"শত্রুতা না হইয়া আমাদের মিত্রতা হইবার কথা। তোমারও ইচ্ছা কিছু লাভ, আমারও সেই ইচ্ছা। দুইজনে পরস্পর সাহায্য করিতে পাবি। দুইজনে ববাবব লাভের ভাগী হইতে পারি।"

"তবে ভূত সাজিযা আমায় ভয় দেখাও কেন?"

"তুমি নিজে মনে করিয়া দেখো, কাহার দোষ। তুমি প্রথম হইতেই আমার বিপক্ষ হইলে কাজেই আমি তোমায় তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলাম।"

"কিন্তু বাবুকে ভয় দেখাও কেন?"

"শীঘ্র একটা মিটমাট হইবে বলিয়া।"

"বুঝিলাম। তাহার পর?"

"তোমাকে আর কি বলিব? আমার সহায়তা করিলে কি তোমার অধিক লাভের আশা নাই?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেমন করিয়া?"

"আমার যদি ইচ্ছা সফল হয় তো বাবুর কাছে তোমার একটি ভালো কাজ করিয়া দিব, ও যথাসাধ্য নগদ টাকা দিব।"

আমি যেন আপনার মনে বলিলাম,—"বাবু যাহাকে বিবাহ করুন, আমার তাতে কিছু ক্ষতি কি? আমার একটি কর্ম হয়, সেই তো কামনা।"

মোক্ষদা অবশ্য আমার কথা শুনিল, কহিল,—"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার উপকার ভুলিব না। কিন্তু যেমন করিয়া হয়, তুমি বাবুর সঙ্গে এ কথা পড়িও।"

"তিনি তো তোমার কথা কাহারও সঙ্গে কন না।"

"আমার কি আর নাম করিয়া বলিবে, না পরিষ্কার করিয়া বলিবে? ঠারে-ঠোরে, ইঙ্গিতে। বিবাহের কথা হইল, শাস্ত্রের কথা হইল। এই রকম করিয়া। বুঝিয়াছ?"

আমি অত্যন্ত বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িলাম, কহিলাম,—"হাঁ, এখন বেশ বুঝিয়াছি। তোমায় একটা কথা বলি।"

"কি?"

"তুমি দিন দুই-তিন আর রাত্রে পবিত্র প্রেমলীলা করিও না। তাহা হইলে বাবুর মন তেমন ব্যস্ত হইবে না। আর ভূতের পালাটা যেন রোজ রাত্রে হয়। আমি খুব পড়াবার চেষ্টা কর্‌ব।"

মোক্ষদা হাসিল, কহিল,—"তাই হবে।"

আমি কহিলাম,—"পুরস্কারের মধ্যে কেবল কি চাকরিটি?"

মোক্ষদা আমার হাতে হাত দিল। "আবার কি?"

আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

মোক্ষদা কহিল,—"আচ্ছা, তুমি আমায় এত বিষ দেখিয়াছিলে কেন বলো তো?"

আমি কহিলাম,—"হিংসায়। আমি গরীব বলিয়া কি আমার দিকে একবার তাকাইতে নাই?"

মোক্ষদা আমাকে দুই-একবার মৃদু-মৃদু করাঘাত করিল,—"ছি! মনিবের গৃহিণীর প্রতি কি নজর তুলিতে আছে?"

আমি কহিলাম,—"তাও বটে। আর রাত নাই। আজ তুমি যাও।"

মোক্ষদা কহিল,—"সত্যই তো! ভোর হয় যে। আমি যাই, কোন পথ দিয়ে যাইব?" বলিয়া, ফিরিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিল।

আমি কহিলাম,—"যে দিক দিয়া ইচ্ছা।"

দেওয়ালের দরজা খুলিয়া মোক্ষদা নামিয়া গেল। আমি আলোকে ধরিলাম। আমার মনে যাহা হইতেছিল, জানিতে পারিলে মোক্ষদা গমনকালে হাসিয়া যাইত না।

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

সূর্যোদয়ের পর নিচে নামিয়া আসিয়া মহেন্দ্রবাবুর মুখ দেখিয়া আমার ভয় হইল। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ বিশুষ্ক, হাত কাঁপিতেছে। আমি কহিলাম,—"কাল রাত্রেও আপনার নিদ্রা হয় নাই?"

বাবু কহিলেন,—"না, বাড়ি বড় ভয়ানক বোধ হইতেছে।"

আমি বলিলাম,—"এখানে আর কিছু দিন থাকিলে আপনার শরীর অসুস্থ হইবে। আপনি কলিকাতায় চলুন।"

"তাহাই মনে করিতেছি। দুই-চারি দিনের মধ্যে স্থির করিব।"

আমি কহিলাম;—"দুই-চারি দিন যদি এখানে থাকেন তো রাত্রে একা শয়ন করিবেন না।"

"কেন?"

"আপনার শরীর ভালো নাই। রাত্রে ভয় পাইলে সহসা রোগ জন্মিতে পারে।"

"কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমি ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, কেহ নিকটে নাই। ভিতরে গিয়া কহিলাম, "আপনি ভূত ধরিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হন?"

বাবু আমার দিকে চাহিয়া ক্ষীণ হাস্য করিলেন। "ভূত কি ধরা যায়?"

"ভূত হইলে তো? যদি ভূত না হয়?"

মহেন্দ্রবাবু আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর কি হইবে?"

"যদি মানুষ হয়?"

"তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

"আমার সন্দেহ হইতেছে। আমার অনুরোধ, এক রাত্রি আপনার ঘরে আমায় থাকিতে দিন। তাহা হইলে আপনি আর কখনও রাত্রে ভয় পাইবেন না।"

বাবু কহিলেন,—"তুমি থাকিলে কি লাভ?"

আমি কহিলাম,—"যদি আপনার সন্দেহ না ভঞ্জন করিতে পারি, তাহা হইলেও একজন লোক ঘরে থাকিলে ভয় কম হইবে। আপনি একদিন আমরা কথা রাখুন।"

বাবু অনেকক্ষণ ইতস্তত করিলেন, পরে কহিলেন,—"সন্ধ্যার সময় তোমায় ঠিক করিয়া বলিব।"

দিনের বেলা বাবু পুষ্করিণীর ধারে, বাগানে অনেকবার বেড়াইলেন। মোক্ষদার একবার দেখাও পাইলেন না। সন্ধ্যার সময় আমায় কহিলেন,—"আচ্ছা, আজ তুমি আমার ঘরে থাকিও। দুজনে মিলিয়া যদি কিছু অনুসন্ধান করিতে পারি।"

আমি কহিলাম,—"আপনি এ কথা প্রকাশ করিবেন না। গোপনে রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। সকলে শয়ন করিলে আমি আপনার ঘরে যাইব। আপনি দরজা ভেজাইয়া রাখিবেন।"

বাবু অনেকক্ষণ সন্দিগ্ধচিত্তে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে কহিলেন,—"তোমার জন্য বিছানা না থাকিলে তুমি শয়ন করিবে কোথায়।"

আমি কহিলাম,—"সমস্ত রাত বসিয়া কাটাইব। আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না।"

বাবু আর কিছু বলিলেন না।

রাত্রে যখন চাকরেরা শয়ন করিতে গেল, তখন আমি ঘরের আলোক নিভাইয়া দিয়া চুপি-চুপি নিচে নামিয়া গেলাম। মহেন্দ্রবাবু দরজা ভেজাইয়া দিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। নিদ্রা যান নাই। আমাকে দেখিয়া কহিলেন,—"এখন কি করিবে?"

আমি প্রথমে আস্তে-আস্তে দরজা বন্ধ করিলাম। ঘরে একটি ছোট সোফা ছিল, টানিয়া দরজার নিকটে আনিলাম। পরে কহিলাম,—"এখন আলোক নিভাইতে হইবে।"

মহেন্দ্রবাবু সভয়ে কহিলেন, "কেন?"

আমি কহিলাম,—"আমার পকেটে বাতি ও দেশলাই আছে। আবশ্যক হইলে তখনি আলো জ্বালিতে পারিব। যদি মানুষ হয়, তাহা হইবে আলোক থাকিতে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না।"

"মানুষ হইলে আসিবে কোথা হইতে?"

"সেইটা আমাদের জানিতে হইবে। যে কয় দিন আপনি ভয় পাইয়াছেন, ঘরে কি আলোক ছিল?"

"না, ঘর অন্ধকার।"

"আলোকে যে তৈল থাকে, তাহাতে কি সমস্ত-রাত আলো জ্বলিবার কথা নয়? যে রাত্রি আপনি কিছু শব্দ শুনিতে পান না, সে রাত্রে কি সমস্ত রাত্রি অলো জ্বলে না?"

"জ্বলে বই কি।"

"তবে নিশ্চয়ই কেহ আলোক নিভাইয়া দেয়। ভূত কি মানুষ স্থির করিতে হইবে। আপনি আর কথা কহিবেন না। আমি আলো নিভাইতেছি।"

আলো নিভাইয়া দিয়া আমি সোফায় বসিলাম। মহেন্দ্রবাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শয়ন করিলেন। তবে তাঁহার মনের বল কিছুমাত্র ছিল না।

বসিয়া-বসিয়া আমি ঝিমাইতে লাগিলাম। ঝিমাইতে-ঝিমাইতে তন্দ্রা আসিল।

খুট্ করিয়া একটু শব্দ হইল। তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। আমি ভালো করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

এ ভূতের বিক্রম কিছু অধিক। নানাবিধ বিকট শব্দ হইতে লাগিল। সেই সকল শব্দের একটু বিরাম হইলে, আর একপ্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। বাবুর দাঁতে দাঁতে লাগিয়া ঠক্ ঠক্ করিতেছে।

ভূতের উপদ্রব বাড়িতে লাগিল। দুই-একবার বাবুর খাট ধরিয়া টানিল, একবার তুলিয়া ফেলিয়া দিল, শব্দ শুনিলাম। একটু পরে ভূত কথা কহিল। চিরকাল ভূতে যেমন খোনা কথা কয়, সেইরূপ কহিল। চন্দ্রবিন্দুগুলা বাদ দিয়া কথাটা এই। "তুমি যদি ভাল চাও তো যাহাকে মন্দ দৃষ্টিতে দেখিয়াছ, তাহাকে বিবাহ করো। আমি পাপের ফল ভুগিতেছি। তুমি যদি পাপ ইচ্ছা না-ত্যাগ কর, তাহা হইলে আমি তোমার ঘাড় মুচ্‌ড়াইব। এখানেই থাক, আর যেখানেই যাও, আমি তোমার সঙ্গ ছাড়িব না। বিবাহ করিলে আমায় আর দেখিতে পাইবে না, তোমায় ছাড়িয়া যাইব। যাহাকে কুচক্ষে দেখিয়াছ, তাহাকেই বিবাহ করো। পাপের শাস্তি হউক।'

"ও-ও-ও সৃ-সৃ-য্যি", বাবু গোঙাইতে লাগিলেন। আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। দেশলাই বাহির করিয়া মোমবাতি জ্বালিলাম। প্রথমে আর কোনও দিকে না চাহিয়া দেওয়ালেব চারিদিকে চাহিলাম। সেখানে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রবেশ পথ দেখিতে পাইলাম, দ্রুত সেইখানে গিযা দেওয়ালে পিঠ দিয়া দাঁড়াইলাম। মোমবাতি পাশের জানালায় রাখিয়া দিলাম। তাহার পর চারিদিকে ভালো করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

মোক্ষদা ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিল। মুখে কথা নাই, চক্ষে, শরীরে স্পন্দন নাই।

মহেন্দ্রবাবু খাটে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। চোখ কপালে উঠিয়াছিল, সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, দাঁত ঠক্-ঠক্ করিতেছিল। আলোকে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। মোক্ষদাকে দেখিয়া তাঁহার চক্ষু স্থির হইল। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন,—"তুমি!"

আমি কহিলাম,—"এই ভূত।"

তখন মোক্ষদা একবার মহেন্দ্রবাবুর দিকে চাহিল, ফিরিয়া আমায় দেখিল। কোনও কথা না কহিয়া ব্যাঘ্রীর ন্যায় আমাকে আক্রমণ করিল। হস্তে তীক্ষ্নধার ছুরিকা।

আমি বামহস্ত উত্তোলন করিলাম। হস্তে ছুরিকা বিদ্ধ হইল। দক্ষিণহস্ত দ্বারা মোক্ষদার গলা টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলাম। ছুরি কাড়িয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিলাম।

বাবু চাকরদের নাম ধরিয়া ডাকতে লাগিলেন। আমি কহিলাম,—"ক্ষান্ত হউন,

করেন কি? দুজনে মিলিয়া একটা স্ত্রীলোকে কি ধরিয়া রাখা যায় না? চাকরেরা আসিলে নানা কথা উঠিবে।"

বাবু চুপ করিলেন। তখনি আবার রাগিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—"মাগীকে পুলিশে দিব, জেলে দিব। মাগী চুরি করিতে আসিয়াছিল, খুন করিতে আসিয়াছিল।"

আমি কহিলাম,—"যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন। আপাতত একবার ইহাকে ধরুন, আমি হাতটা দেখি।"

মহেন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি আসিয়া মোক্ষদার কেশ ধরিলেন। আমি দেখিলাম, হাতে সামান্যই আঘাত লাগিয়াছে। ক্ষতস্থান ধুইয়া চাদরের খানিকটা ছিঁড়িয়া জড়াইয়া বাঁধিলাম। শোণিতস্রাব অল্পক্ষণ পরেই বন্ধ হইয়া গেল।

তাহার পর মোক্ষদার সাক্ষাতেই আমি সকল কথা বলিলাম। বাবু মাঝে-মাঝে কহিতে লাগিলেন,—"কি আস্পর্দ্ধা! মাগীকে নিশ্চয়ই জেলে দিব। আঃ কি রক্ষাই পাইয়াছি। এখনি পুলিশ ডাক, মাগীকে বাঁধিয়া লইয়া যাক্।"

আমি কহিলাম,—"পুলিশের হাঙ্গামায় কাজ নাই। উহার যদি দশ বৎসব জেল হয়, তাহাতে আমাদের কোনই লাভ নাই। আপনার নামে একটি কথা উঠিলে বড় অপমানের কথা। উহাকে বিদায় করিয়া দিন, আর কোনও কথায় কাজ নাই।"

মহেন্দ্রবাবু কহিলেন, "তাই ভালো। গোষ্ঠীসুদ্ধ বিদায় করিয়া দাও।"

আমি কহিলাম,—"কাল সকালবেলা বিদায় করিয়া দিলেই হইবে। এখন উহাকে ছাড়িয়া দিন।"

বাবু মোক্ষদার কেশ ছাড়িয়া দিলেন। আমি দরজা খুলিয়া মোক্ষদাকে কহিলাম,—"যাও।" বাবু কহিলেন,—"দূর হইয়া যাও, কাল তোমায়ে ঝাঁটা মারিয়া বিদায় করিব।"

মোক্ষদা কথা কহিল না, কোনও দিকে চাহিল না, ঘরের বাহিরে গেল।

মহেন্দ্রবাবু তখন আমার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, কহিলেন,—"তোমার এ উপকার আমি কখনও ভুলিব না। কি রাক্ষসীর হাত হইতে তুমি আমার রক্ষা করিয়াছ!"

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥

রাত্রিজাগরণে ও শোণিতনির্গমে শরীর একটু অবসন্ন হইয়াছিল। সোফায় শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

একটা ঘোর কোলাহলে নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখি, অনেক বেলা হইয়াছে। মহেন্দ্রবাবু চোখ রগড়াইতে-রগড়াইতে হাই তুলিতে-তুলিতে উঠিলেন।

বাড়ির সম্মুখে চাকরগুলা চেঁচামেচি করিতেছিল। মালী ও তাহার বুড়ি বড় চিৎকার করিতেছিল। কহিতেছিল,—"মোক্ষদা কোথায় গেল। সকালে উঠে তাকে দেখতে পাইনি।"

গোপাল নামে বাবুর একটা চাকর কলিকাতা হইতে আসিয়া ছিল। কলিকাতার চাকরের মতো সে একটু চালাক। মালীর সম্মুখে গিয়া কহিতেছিল,—"দেখ, তোর মোক্ষদাকে ধরে আস্ত গিলে ফেলেছি। এই দেখ, মুখে এখনও তার মাথার চুল রয়েছে।" এই বলিয়া গোপাল বদন ব্যাদান করিল।

আমি আসিয়া কহিলাম,—"কি হয়েচে কি?" আমার পিছনে-পিছনে মহেন্দ্রবাবু আসিলেন।

আমাদিগকে দেখিয়া বুড়া-বুড়ি কাঁদিতে লাগিল। ব্যাপারখানা কি? না, মোক্ষদা মালীদের ঘরে নাই। কখন যে উঠিয়া কোথায় গিয়াছে, কেহ জানেনা।

আমি বলিলাম,—"তা, সে জন্য বাড়ি মাথায় করা কেন? সে তো আর ছেলেমানুষ নয় যে পথ হারাবে।"

"না বাবু, তা নয়। ডাগর মেয়ে, সেই ভয়। যদি চাই বাতাস লাগে—"

মহেন্দ্রবাবুতে-আমাতে একবার চোখোচোখি হইল। বাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"তা এখানে কেন? কোথায় গিয়াছে, খুঁজিয়া দেখো না।"

মালী কহিল,—"তাই খুঁজিতেছি। একবার এদিকে খুঁজিতে আসিয়াছি।"

আমি হাসিয়া কহিলাম,—"দেখো, ঘরগুলা ভালো করিয়া দেখো। ঘরে পুরিয়া কেহ না রাখিয়া থাকে।"

বুড়া-বুড়ি ঘরে-ঘরে খুঁজিয়া দেখিল। তাহার পর গ্রামে খুঁজিতে গেল। দুপুরবেলা তাহারা ফিরিয়া আসিল। মোক্ষদার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বাবু সেইদিন সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় ফিরিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। বৈকালে আমরা বাগানে বেড়াইতেছিলাম। মালীর ঘর হইতে রোদনের শব্দ হইতেছিল। বেড়াইতে-বেড়াইতে পুষ্করিণীর নিকটে গেলাম। পাড়ে একটা নোনা গাছ জলের উপর একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। সেখানে একটু অন্ধকার। বোধ হইল, জলে কি ভাসিতেছে।

নিকটে গিয়া দেখিলাম, মোক্ষদার মৃতদেহ ভাসিতেছে। মুখ জলের মধ্যে, মাথার চুল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মালীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। সে আসিয়া মোক্ষদার মৃতদেহ দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। শোকের তেমন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি?"

মালী সভয়ে কহিল,—"সে আসিয়া মোক্ষদাকে লইয়া গিয়াছে।"

"কে?"

"সেই বাবুদের বিধবা মেয়ে!"

আমরা সেই দিনই কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। মহেন্দ্রবাবু জলের দরে নূতন বাড়ি বেচিয়া ফেলিলেন। আমার আর চাকরির চেষ্টা করিতে হইল না, মহেন্দ্রবাবু জমিদারির সমস্ত ভার আমার হাতে দিলেন।

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১২৯৯

পাগল

জলধর সেন



রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ফরেক্কাবাদে ওকালতি করিতেন। বড় উকিল, পসার বেশ জমিয়া গিযাছিল। মক্কেলের নিকট হইতে যে অর্থ পাইতেন, তাহার অধিকাংশই খরচ হইয়া যাইত; অথচ পরিবারের মধ্যে স্ত্রী আর কন্যা। পুত্রসন্তান হয় নাই,—হইবার আশাও ছিল না। হুগলি জেলার হরিহরপুরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকিতেন, বিষয় যাহা ছিল, তাহাতেই সংসার বেশ চলিয়া যাইত। তবুও রাজেন্দ্রবাবু মধ্যে-মধ্যে দাদাকে টাকা পাঠাইতেন।

দাদা হরিহর মুখোপাধ্যায় বারবার অনুরোধ করেন, মেয়ে বড় হইল, বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হয়। রাজেন্দ্রবাবু কথাটা তেমন গায়ে মাখেন না; ইন্দুর বিবাহ হইয়া গেলে সে পরের ঘরে চলিয়া যাইবে; গৃহ যে অন্ধকার হইবে। এই ভাবনাতেই রাজেন্দ্রবাবুর কষ্ট হইত। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, একটি পিতৃমাতৃহীন ভালো ছেলে পাইলে তাহার সহিত ইন্দুর বিবাহ দিয়া ঘরজামাই রাখিবেন। সে রকম ছেলে মেলে কই? এ দিকে দাদার তাড়ায় অস্থির। তবুও ইন্দুর বয়স এখনও এগারো পার হয় নাই।

শেষে অনেক চেষ্টায় মৈনপুরীর সেরেস্তাদার রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র পরেশের সঙ্গে ইন্দুর বিবাহ স্থির হইল। ঘরজামাই মিলিল না বটে, কিন্তু মৈনপুরী ফরেক্কাবাদ হইতে বেশি দূর নয়; যখন-তখনই মেয়েকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই আশায় বিবাহ স্থির হইল। বৈশাখ মাসের ১৭ তারিখে ইন্দুর বিবাহ হইয়া গেল। রাজেন্দ্রবাবু কাছারির কাজকর্ম ফেলিয়াই মেয়ের সঙ্গে মৈনপুরী গেলেন, এবং সপ্তাহের মধ্যেই ইন্দুকে লইয়া বাসায় ফিরিলেন; নিরানন্দ গৃহ আবার আনন্দপূর্ণ হইল।

আশ্বিন মাসে নূতন জামাই সঙ্গে লইয়া বাড়ি আসিবার বন্দোবস্ত হইতেছে, জিনিসপত্র বাঁধা হইতেছে; যাত্রার দিন পর্যন্ত স্থির হইয়াছে। জামাই পরেশ যাত্রার একদিন পূর্বে আসিয়া শ্বশুরের সঙ্গে মিলিবে। এমনসময় একদিন সন্ধ্যার সময়ে তার আসিল, পরেশের বড় অসুখ; ইন্দুকে লইয়া অবিলম্বে যাইবার জন্য অনুরোধ। রাজেন্দ্রবাবু স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া তাড়াতাড়ি রওনা হইলেন। রামলালবাবুর বাড়িতে পহুঁছিয়া আর পরেশকে দেখিতে পাইলেন না; পরেশ কোনও এক অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে। পিতা, মাতা, বালিকা স্ত্রী সকলকে ফেলিয়া সে আর-এক রাজ্যে গিয়াছে। উন্মত্ত রাজেন্দ্র সমস্ত গৃহ অনুসন্ধান করিয়াও সে মুখখানি আর একটিবার দেখিতে পাইলেন না। স্ত্রী-কন্যা লইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে রাজেন্দ্র ফরেক্কাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বড় সাধের কন্যা—বড় আদরের ধন চিরদিনের জন্য তাঁহার গৃহে বাস করিতে আসিল। নিরানন্দ গৃহ তো আর আনন্দপূর্ণ হইল না; কে একজন পরের ছেলে সব আনন্দ লইয়া আনন্দধামে চলিয়া গিয়াছে বিধবা ইন্দুর দুঃখময় জীবনের উপর দিয়া পাঁচটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। রাজেন্দ্রবাবু বিধবা কন্যাটিকে বুকে লইয়া সেই ফরেক্কাবাদে পাঁচ বৎসর কাটাইলেন। বাড়ি হইতে দাদার কত অনুরোধ আসিল, কতবার দাদা নিজে আসিলেন, কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু নিজের উপর চিরনির্বাসনদণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। কি লইয়া দেশে ফিরিবেন? যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিবেন, এই বিদেশেই চিরদুঃখিনী কন্যাকে লইয়া কাটাইয়া দিবেন।

ইন্দুর বয়স যোলো বৎসর। যৌবনের সৌন্দর্য সর্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। পিতা-মাতা কন্যার এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখেন, আর নির্জ্জনে চক্ষের জল মোছেন। এক-এক বার ভাবেন, পরেশ চলিয়া গেল, এ জ্বলন্ত দীপশিখা রাখিয়া গেল কেন? ইন্দু নিজের উচ্ছ্বলিত রূপরাশি ঢাকিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করে। সে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছে, মোটা সাদা গড়া পরে, শরীকে নিগৃহীত করিবার জন্য অনেক দিন অনাহারেই কাটাইয়া দেয়। মাথার চুলগুলি কাটিয়া ফেলিবার জন্য একবার প্রস্তাব করিয়াছিল; কিন্তু সেই কথা শুনিয়া পিতা-মাতা দুই দিন অনাহারে ছিলেন; —সে কৃষ্ণকেশগুচ্ছ আর কাটা হইল না। পিতা-মাতাকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য কত কষ্টে তাঁহাদের সম্মুখে আপনাকে সর্বদাই প্রফুল্লিত রাখে; হৃদয়ের অসীম দুঃখ কত করিয়া চাপা দেয। কিন্তু যখনই কেহ কাছে থাকে না, তখন তাহার মুখে কালি ভাঙিযা দেয; বসিয়া-বসিয়া কত কি আকাশ-পাতাল ভাবে। বিধবা যুবতীর সে ভাবনা ভাষায় ব্যক্ত করিবার চেষ্টা কবা বৃথা; সে ভাবনাব আগা নাই, গোড়া নাই; তার পদ্ধতি নাই, শৃঙ্খলা নাই। ভাবিতে-ভাবিতে হয়তো ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বোঝাটা বুঝি একটু হালকা করিয়া লয়। অথবা দুঃখিনী বিধবা সকল ভাবনা, সকল দুঃখ সেই অখিলনির্ভরের উপর ফেলিয়া দিয়া তখনকাব গৃহকার্যে মনোনিবেশ করিতে যায়। আবার যখন ভাবনার ভার চাপিয়া পড়ে, কত আশা, কত অতৃপ্ত বাসনা, কত অনাস্বাদিত সুখ, কত আকাশকুসুম, চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরে, তখন আবার দৌড়াইয়া গৃহের ছাদে কি অন্য কোনও নির্জন স্থানে গিযা, কখনও নয়নজলের সাহায্যে, কখনও দীর্ঘনিশ্বাস দিয়া সেগুলিকে বিদায় করিয়া দেয়। বিধবার দুর্বহ জীবন এমনি করিয়া কাটিয়া যায়।

ইন্দুর মা ভাবেন, এ অতুল রূপরাশি লইয়া কোথায় লুকাইব? সর্বদা চোখে-চোখে রাখিযাও তাঁহার ভয় দূর হয় না। রাজেন্দ্রবাবু বলেন, মেয়ে আমার সতী লক্ষ্মী, তাহাব মনে কোনও অপবিত্র ভাব প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই ভাবে এত দিন গিয়াছে।

কঠোর নির্মম অদৃষ্টলিপিতে আরও অনেক কথা আছে। এমন করিয়া দিন গেলেও তো হইত। এক দিন কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজেন্দ্রবাবুর শরীর সামান্য একটু অসুস্থ হইল; সেই অসুখ রাত্রে বাড়িল; হাত-পা অবশ হইতে লাগিল; ডাক্তার আসিল, চিকিৎসাও হইল; কিন্তু সব ফুরাইল। রাত্রিপ্রভাতের সঙ্গে-সঙ্গে রাজেন্দ্রবাবুর প্রাণবায়ু জামাতার উদ্দেশে চলিয়া গেল।

আর কি লইয়া ফরেক্কাবাদে বাস করিবেন? ইন্দুর মা বিধবা কন্যার হাত ধরিযা হরিহরনগরে ফিরিয়া আসিলেন। আজ নয় বৎসর পরে মা ও মেয়ে থানের ধুতি পরিযা কাঙ্গালিনীর ন্যায় গ্রামে আসিলেন। বাড়িতে কান্না পড়িয়া গেল। পাড়ার সকলে দেখিতে আসিল; মেয়ের অপূর্ব রূপ দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল; সকলেই একবাক্যে বলিল, মেয়ে তো নয়, যেন মা দুর্গা!

পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থঘরের মেয়েরা অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকে না; পাড়ায় সকলেব বাড়িতেই তাহাদের গতিবিধি করিতে হয়। স্নানের জন্য পুকুরঘাটেও যাইতে হয়। প্রথম-প্রথম কয়েক দিন বাহিরে যাইতে ইন্দুর কেমন বাধ-বাধ ঠেকিত, তাহার পর ক্রমে সে সব তাহার অভ্যাস হইয়া গেল। মেয়ের স্বভাব-চরিত্র বিনয়নম্র ব্যবহার, মাতৃভক্তি দেখিযা সকলে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল।

একদিন ইন্দু বাড়ির আরও কয়েকটি স্ত্রীলোকের সহিত পুকুরঘাটে স্নান করিতে

গিয়াছে। এ পুকুরে পাড়ার স্ত্রীলোকেরা স্নান করে বলিয়া পুরুষেরা বড় একটা এ দিকে আসেন না। সেদিন কিন্তু দৈবক্রমে দক্ষিণপাড়ার বছিরদ্দি মণ্ডলের পুত্র আমীর মণ্ডল পুকুরের ধারের খেজুর গাছ কাটিতেছিল। স্নানের ঘাটে কথাবার্তার শব্দ পাইয়া আমীর সেই দিকে চাহিয়া দেখিল;—দেখিল, স্বর্গের এক দেবী ঘাটের জলে আগ্রীবনিমজ্জিতা হইয়া স্নান করিতেছেন। এত সৌন্দর্য, এত রূপ এমন সর্বাঙ্গসুন্দরী যুবতী কখনও তাহার নয়নপথের পথিক হয় নাই। আমীর আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। উনিশ বৎসরের যুবক,—মাথায় লম্বা চুল, গৌরবর্ণ, মণ্ডল-পুত্র, অনিমেষ নয়নে সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখিতে লাগিল। সে যেন সেই রূপের সাগরে ডুবিয়া গেল। ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে,—ব্রাহ্মণকন্যা, সে সব ভুলিয়া গেল। তাহার সেই খেজুর গাছ কাটিবার শাণিত শস্ত্র তাহার হাতেই থাকিয়া গেল। কে যেন তাহাকে মন্ত্রবলে যাদু করিয়া ফেলিল! সহসা তাহার অবশ হস্ত হইতে অস্ত্রখানি জলের মধ্যে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে তাহারও চৈতন্য হইল; স্নানার্থিনী রমণীগণের দৃষ্টিও সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা দেখিলেন, একটি মুসলমান যুবক তাড়াতাড়ি খেজুরগাছ হইতে নামিতেছে।

মণ্ডল পুত্র আমীর গাছ হইতে নামিয়া আর জলের মধ্যে অস্ত্রের সন্ধান করিল না। পুকুরের ধারের কালকাসিন্দার বেড়া ডিঙাইয়া মাঠে যাইয়া পড়িল, বিশ্বসংসার তখন তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিতেছে! সুরাপান করিয়াই লোকে উন্মত্ত হয়; কিন্তু দক্ষিণপাড়ার বছিরদ্দি মণ্ডলের উনবিংশ বৎসরের উপযুক্ত পুত্র আমীর মণ্ডল আজ বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার রূপসুধাপানে সত্য-সত্যই উন্মাত্তের ন্যায় হইয়া পড়িল। ধীরে-ধীরে মাথা তুলিয়া জানুর উপর দুই হাতে ভর দিয়া আমীর একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কি ভাবিয়া যেন আবার বসিয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে আমীর ভূমি-আসন ত্যাগ করিয়া মাথা নিচু করিয়া চোরের মতো পা টিপিয়া পুকুরের ধারে কালকাসিন্দার বেড়ার নিকট গেল; দুই হাতে বেড়া একটু ফাঁক করিয়া দেখে, ঘাট অন্ধকার;—ঘাটে কেহ নাই।

কন্দর্প ঠাকুর গরীব মণ্ডল-পুত্র আমীরের স্কন্ধে যে কেন ভর করিলেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। তবে আমাদের মতে তাঁহার পক্ষে এ কাজটা নানা কারণে ভাল হয় নাই। জগতের কেহ এই দীপ্তশিখারূপিণী মূর্তিমতী পবিত্রতার দিকে কুদৃষ্টি করিতে সাহস করিল না; আর এই নিরক্ষর মণ্ডল-পুত্র তাহাকে দেখিয়া পাগল হইল? লেখাপড়া জানিলে সে না হয় কবিতা লিখিত; লম্বা চুলগুলির কেয়ারী করিত; আকাশের চাঁদের দিকে চাহিয়া থাকিত; কত হা-হুতাশ, কত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিত। শেষে ভগ্নহৃদয় লইয়া গৈরিকবসন পরিধানপূর্বক হিমালয়ে চলিয়া যাইত; সেখানে নির্জন নির্ঝরিণীতীরে, বিহঙ্গকাকলীমুখরিত শ্যাম কুঞ্জবনে তমালতলে কুটীরনির্মাণ করিয়া, প্রেমের সন্ন্যাসী সাজিয়া, প্রেমময়ীর রূপধ্যানে কিছু দিন কাটাইত। তাহা পর দেশে ফিরিয়া দীর্ঘ কেশ মুণ্ডন করিয়া গৈরিকবসন পরিত্যাগপূর্বক একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া শেষে পুত্র-কন্যা লইয়া সুখে ঘরগৃহস্থালী করিত। ব্যাপারটি বেশ শোভন হইত, গল্পটিও বেশ জমাট বাঁধিত। কিন্তু বিধিলিপি! প্রভু কন্দর্পদেবের অতখানি ভাবিবার অবকাশ ছিল না। অশুভক্ষণে আমীর মণ্ডল তাঁহার শরের লক্ষ্য হইল। বেচারা না জানে কাঁদিতে, না জানে কবিতা লিখিতে, না জানে জ্যোৎস্নাবজনীর শোভা উপভোগ করিতে।

আমীর সেই দিন হইতে কাজকর্ম ছাড়িয়া দিল। প্রথম তিন-চারি দিন সে বাড়ির বাহির হইল না; দিনরাত্রি শুধু হাঁটুর মধ্যে মাথা দিয়া বসিয়া থাকে; আর এক-এক বার

মাথা তুলিয়া কাতরনয়নে চারিদিকে চায়, —কাহাকে যেন খোঁজে। বৃদ্ধ পিতা ভাবিয়া অস্থির, মাতা কাঁদিয়া আকুল। মণ্ডলের একমাত্র লায়েক পুত্র,—সংসারের অবলম্বন। সে ভালো করিয়া খায় না, কাহারও সঙ্গে কথা কহে না, কোনও কাজে যায় না; শুধু হাঁটুর মধ্যে মাথা দিয়া দাবায় বসিয়া থাকে; আর কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সজলনয়নে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পরে আমীরের বাড়ির দাবায় কমিটি বসিল। পাড়ার মাতব্বর সরদার, সেখ প্রভৃতি সকলে আসিয়া বসিলেন। প্রতিবেশী হবিবুল্লা সরদারের অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা জননীও সেই দাবায় উপস্থিত। সকলেই একবাক্যে বলিল, ছেলের উপর পরীর দৃষ্টি হইয়াছে; সে বিষয়ের প্রমাণপ্রয়োগও যথেষ্ট হইল; নানা জনে পরীর দৃষ্টি সম্বন্ধে নানা গল্প বলিল। হবিবুল্লার মা সেদিনের জন্য নানাপ্রকার তুক্-তাকের ব্যবস্থা করিল, এবং আগামী কল্য প্রত্যুষেই কসিমপুর হইতে বিখ্যাত রোজা-গুণীন হানিফ সেখকে আনিবার ব্যবস্থা স্থির হইল। আমীর সেই সভাস্থলে বসিয়া; কত জনে কত কি বলিতেছে, কিন্তু সে কোনও কথারই জবাব দিতেছে না। বুঝি ব্রাহ্মণকন্যা ইন্দুর রূপরাশি তাহার সমস্ত শরীর অসাড় করিয়া দিয়াছিল।

পরদিন রোজা আসিল, কত মন্ত্র আওড়াইল, কত জলপড়া দিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। "শক্ত পরীতে নাগাল লইয়াছে, আপনি ইচ্ছা করিয়া না গেলে কেহ তাড়াইতে পারিবে না" এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া রোজা ঘরে ফিরিয়া গেল।

আমীরের স্কন্ধে যে শক্ত ভূত চাপিয়াছিল, সে সহজে নামিল না। সেই ভূতের গল্পই তো বলিতে বসিয়াছি। আমীরের পিতা-মাতা নিরাশ হইল; এমন কর্মক্ষম ছেলেটির এমন দশা দেখিয়া তাহারা মাথায় হাত দিয়া বসিল; তাহাদের মনে হইল, কে যেন তাহাদের অন্নের গ্রাস মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল;—কে যেন তাহাদের অন্ধের নাড়ি ভাঙিয়া দিয়া গেল। চিকিৎসা আর কি করিবে? এত বড় ওঝা যখন হার মানিয়া গেল, তখন আর চিকিৎসা নাই। এখন, ভরসা আল্লা। সেই আল্লার উপর নির্ভর করিয়াই আমীরের বাপ-মা চুপ করিয়া রহিল।

সকলে মনে করিয়াছিল, আমীরের উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে; কিন্তু সে সব কিছুই হইল না। আমীর তিন-চারি দিন বাড়িতেই বসিয়া রহিল; দিনরাত্রি বুঝি তাহার হৃদয়ের মধ্যে দেবাসুরের যুদ্ধ চলিতেছিল। শেষে অসুরেরই জয় হইল। আমীর আর গৃহে তিষ্ঠিতে পারিল না; কিন্তু কেমন করিয়া সে ব্রাহ্মণবাড়িতে যাইবে? সেখানে গেলে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে,—"কেন আসিয়াছ? কি চাও?" তাহা হইলে সে কি জবাব দিবে? লোকে যদি তাহাকে সন্দেহ করে, তাহা হইলে কি হইবে? অনেক ভাবিয়া শেষে আমীর স্থির করিল, সে পুকুরের পাড়ে কোনও স্থানে বসিয়া থাকিবে; ব্রাহ্মণকন্যা নিশ্চয়ই স্নান করিতে, জল লইতে, দুই চারিবার ঘাটে আসিবে। তাহা হইলেই সাধ মিটিবে। সে তো আর কিছুই চাহে না, শুধু সেই দেবীপ্রতিমা দেখিতে চায়, শুধু এক-এক বার প্রাণ ভরিয়া সেই রূপসুধা পান করিতে চায়। মূর্খ মণ্ডলের ছেলে মনে ভাবিয়াছিল, সেই সুন্দরীর রূপ একবার করিয়া দেখিলেই বুঝি তাহার হৃদয় শীতল হইবে। রূপদর্শনের সঙ্গে-সঙ্গে যে তাহার মনে আরও কত ভাবের উদয় হইবে, তাহা সে তখন ভাবিতে পারে নাই; তাহার তৃষিত চিত্ত একবার সেই রূপ দেখিলেই পরিতৃপ্ত হইবে, তাহাই সে মনে করিয়াছিল।

প্রাতে উঠিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমীব সেই পুকুরের ধারেব খেজুবতলায় যাইয়া বসিয়া রহিল। পুকুরের ঘাটের দিকে সরলভাবে চাহিতে তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না; সে ভয়ে ভয়ে ঘাটের দিকে পিছন করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু থাকিযা-থাকিয়া তাহার যেন মনে হইতে লাগিল, কে তাহাকে উঁচু করিযা ধরিযা তাহার মুখখানা সজোরে পুকুরের দিকে ফিরাইয়া দিতেছে। হায় হায়! মণ্ডলের ছেলে সত্য-সত্যই পাগল হইবে।

ঘাটের দিকে একটু শব্দ হইলেই আমীর চোবেব মতো চাহিযা দেখে। বেলা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। কত স্ত্রীলোক স্নান করিতে আসিল; কত হাস্যপরিহাসে পুকুরের ঘাট পরিপূর্ণ হইল; কত জন স্নান কবিয়া চলিযা গেল। বেলা হইল, কিন্তু বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা তো স্নান করিতে আসিল না। তবে কি সে আজ স্নান কবিবে না? অসুখেব কথা মনে হইতেই আমীর কেমন হইয়া গেল। তখন সে ব্রাহ্মণবাড়িতে যাইয়া কোনও প্রকাবে সংবাদ লইবে, কৃতসঙ্কল্প হইল।

পুকুরের ধাবের সেই কালকাসিন্দার বেড়ার ভিতব দিযা বাহিব হইয়া মাঠ পার হইয়া আমীর রাস্তায় উঠিল। সেইটি পুকুবেব বাস্তা। একটু অগ্রসর হইযাই একটা মোড় আছে। আমীর সেই মোড় ফিরিয়াই দেখে, সম্মুখে পথের মাঝখানে দিযা ব্রাহ্মণকন্যা একাকিনী একটি কলসী কক্ষে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাকে দেখিযাই আমীব থমকিযা দাঁড়াইল;—তাহার পব এক দৌড়ে পলায়ন।

আমীর সত্য-সত্যই পাগল হইয়াছে। তাহাব মুখে কথা নাই। সাবাদিন বন্দ্যোপাধ্যায়েব বাহিরবাড়ির উঠানের পাশের লম্বা ঘরের বারান্দায পড়িয়া থাকে। সারাদিন সে সেখান হইতে নড়ে না, কোথাও যায না; রাত্রে উঠিয়া খানিকক্ষণ রাস্তায দৌড়িয়া যখন ক্লান্তিবোধ হয়, তখন আবার আসিয়া সেই বারান্দায় পড়িয়া থাকে। তাহাব বাপ-মা কত দিন তাহাকে জোর কবিয়া বাড়ি লইয়া গিয়াছে হাত-পা বাঁধিয়া বাখিয়াছে; কিন্তু যদি কোনও প্রকারে সে একবার ছাড়া পাইয়াছে, অমনি এক দৌড়ে ব্রাহ্মণবাড়ির বাবান্দায় আসিযা হাজির। কাহারও সহিত সে কথা কহে না, কোন অত্যাচার করে না; শুধু সেই বাড়িব ভিতবকার দ্বাবের দিকে চাহিযা বসিয়া থাকে।

বিধবা ইন্দুর হৃদয় এই পাগলেব দুঃখে গলিয়া গেল। আহা! এমন জোযান ছেলে, পাগল হইয়া গেল! এই কথা সর্বদাই তাহার মনে হইত। প্রতিদিন দ্বিপ্রহবে সে পাগলকে ভাত দিয়া যাইত। একখানি কলাপাতায় করিয়া ভাত-ব্যঞ্জন দিত, আর একটা মাটির ভাঁড় দিয়াছিল, তাহাতেই জল দিত। ইন্দু প্রথম-প্রথম ভাত দিয়াই চলিয়া যাইত, কিন্তু বিকালে কি অন্য সময়ে আসিয়া দেখিত, যেমন ভাত তেমনি পড়িয়া আছে। তখন দয়াময়ী ইন্দুর সেখানে দাঁড়াইয়া যেই বলিত,—"আমীর, ভাত খাও", আর অমনি পাগল গোগ্রাসে ভাতগুলি খাইয়া ফেলিত। ইন্দু বলিত,—"আমীর, পাতখানি ফেলিযা মুখ ধুইয়া এস," আমীর অবিলম্বে আদেশ পালন করিত।

ইন্দুর এখন এক কাজ বাড়িল; প্রতিদিন পাগলকে খাওয়ানো। জেঠামহাশয় এক-এক দিন দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেন, আর বলিতেন,—"মা আমাব অন্নপূর্ণা,—আমার মায়ের গুণে পাগলও বশ হয়।" হায় ব্রাহ্মণ, কি বুঝিবে তুমি!

আর কি আত্মসংবরণ, কি ইন্দ্রিয়জয়ের শক্তি ওই নিরক্ষর চাষার ছেলে আমীরের। তাহার সাধনার ধন, তাহার জীবনের অবলম্বন, তাহার তৃষ্ণার জল, তাহার কল্পনার সর্বস্ব প্রতিদিন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল দিযা যায়; কিন্তু

যে ক্ষুধায় তাহার প্রাণ জ্বলিতেছে, যে মহাতৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, আমীর তাহা হৃদয়ের অন্তস্তলে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। একদিনও সে ভালো করিয়া তাহার দেবতার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

এইভাবে পাগলের দীর্ঘ তিন বৎসর কাটিয়া গেল। পাগল ব্রাহ্মণদের সেই বারান্দায় দিন কাটাইতে লাগিল।

একদিন দ্বিপ্রহরেব তাহার খাবার আসিল না। পাগল ভাবিয়া পায় না, কি হইয়াছে। অনেকক্ষণ পরে ইন্দুর মা আসিয়া পাগলের খাবার দিয়া গেলেন। পাগল ভাবিল, এমন তো কোনও দিন হয় না, ব্রাহ্মণকন্যা ভিন্ন আর কেহ তো এই তিন বৎসর তাহাকে খাইতে দেয় নাই। আজ কি তাহার কাজকর্ম আছে? আমীর সে দিন আর ভাত খাইল না; যেমন ভাত তেমনই পড়িয়া রহিল।

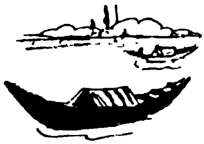
বিকালে পাগল শুনিল, ইন্দুর বড় জ্বর হইয়াছে; জ্বরের অবস্থা ভালো নয়। ব্রাহ্মণের বিধবা, ঔষধ খাইতে নাই। সেদি চলিয়া গেল; পরদিন জ্বর আরও বাড়িয়া উঠিল।—প্রেমচাঁদ কবিরাজকে ডাকিয়া আনাইল। বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয়ের নাড়িজ্ঞান অসাধারণ; তিনি ইন্দুর নাড়ি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, সান্নিপাতক্ষেত্রে জ্বর, বাঁচিবার আশা নাই, বিকারের লক্ষণ দেখা গিয়াছে। রাত্রে বাঁচে কি না সন্দেহ। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল।

কবিরাজ মহাশয়ের কথাই সত্য হইল। রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় বিধবা ইন্দু সকল দুঃখ যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া চলিয়া গেল। বাড়িতে কান্নার রোল উঠিল।

পাগল আমীর আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিল না। উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া ব্রাহ্মণবাড়ির অন্দরে প্রবেশ করিল। সেখানে যাইয়া দেখে তাহার জীবনের অবলম্বন, তাহার পাগলের নিধি, উঠানে পড়িয়া রহিয়াছে! পাগল আর স্থির থাকিতে পারিল না। আজ দীর্ঘ তিন বৎসর হৃদয়ের সহিত মহা সংগ্রাম করিয়া সে জয়ী হইয়াছিল, আজ আর সে পারিল না; আজ তাহাব পরাজয়ের দিন। উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া পাগল ইন্দুর মুখের উপরের বস্ত্রাবরণ দূরে ফেলিয়া দিল।—আর চিৎকার করিয়া বলিল, "আজ—"। চারিদিক হইতে সকলে ছুটিয়া আসিল, পাগলকে সরাইতে গেল। পাগল আপনি সরিয়া দাঁড়াইল, একবার নিমেষমাত্র মৃতার মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর ছুটিয়া বাড়ির বাহির হইয়া সে ঘনান্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেল।

আর কেহ তাহার সন্ধান পায় নাই।

১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩০৬



চপলা

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

সরস্বতী জলে

সহসা বন্যা আসিয়া সরস্বতী নদীতে খরস্রোত বহিতেছে। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা; তখনও গ্রীষ্মকালে সরস্বতীতে জল থাকিত না, কিন্তু বর্ষাকালে এত প্রবলবেগে বন্যা আসিত যে, নাবিকেরা ও নৌকা লইয়া যাতায়াত করিতে ভয় পাইত। থানেশ্বরের ছেলে বুড়া সকল কাজকর্ম ফেলিয়া নদীতীরে বসিয়া ক্রীড়াকৌতুক করিতেছে। সাহসী যুবকেরা সাঁতার কাটিতে জলে নাবিতেছে, বৃদ্ধেরা ভয় দেখাইয়া নিষেধ করিতেছেন। বালকবালিকারা কূলে-কূলে জল ছিটাইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছে। সরস্বতীতে বারো মাস জল থাকে না বলিয়া কোথাও একখানিও বড় নৌকা নাই; কচিৎ এক-একখানি ছোট ডোঙ্গা হইতে দড়ি দিয়া কূলে বাঁধা ছিল। যেখানে নগরের লোকেরা আনন্দমগ্ন, তাহা হইতে কিছু দূরে দুইটি বালিকা গাছের আড়ালে জলক্রীড়া করিতেছিল। সহসা একটি বালিকা ডোঙ্গায় উঠিয়া অপরটিকে ডাকিয়া বলিল, আয় ভাই! মজা করি। ডোঙ্গাখানি জলে ভাসিয়া দুলিতেছিল; দড়ি টানিয়া একবার কূলে আসা, আর, একবার একটুখানি দূরে চলিয়া যাওয়া, এইটুকু সেই বালিকার মজা দ্বিতীয়া ভয় পাইল, সে বলিল, না ভাই, কি হইতে কি হইবে; আমি ডোঙ্গায় উঠিব না। প্রথমা যখন ডোঙ্গায় উঠিল দড়িটা টানাটানির একটু বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিল, তখন দ্বিতীয়া কহিল, চপলা আয় না, ঢের হয়েছে। চপলা শুনিল না, সে হাসিতে লাগিল, এবং ডোঙ্গায় বসিয়া মজার খেলা খেলিতে লাগিল।

দৈবাৎ দড়িগাছি খুলিয়া গেল, এবং প্রবল স্রোতে ডোঙাখানি ছুটিয়া চলিল। যে মেয়েটি কূলে ছিল, সে চিৎকার করিয়া বলিল, চপলা ভেসে গেল গো। চপলার বয়স চতুর্দশের অধিক নহে; সে কিন্তু চিৎকার করিল না। সাবধানে ডোঙ্গাখানি ধরিয়া বসিয়া রহিল। চিৎকার শুনিয়া অনেক লোক ছুটিয়া আসিব, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া জলে নাবিল না; অনেকেই কেবল মেয়েটির দুর্ব্বহারের সমালোচনা করিতে লাগিল। এক জন অপরিচিত ব্যক্তি দৌড়াইয়া আসিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া ডোঙ্গা লক্ষ্য করিয়া সাঁতার দিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে ডোঙ্গা ও সন্তরণকারী, দর্শকগণের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া বহু দূরে চলিয়া গেল।

যে সাঁতরাইয়া গেল, সে কে? কেহই তাহা বলিতে পারিল না। তখন নানা প্রকার সমালোচনা ও দৈব দুর্ঘটনা প্রাচীন গল্পের পর, দর্শকেরা ছেলেদিগকে শাসন করিয়া ঘরে ফিরিলেন। এই থানেশ্বরে চপলার জন্য কাঁদিবার কেহ ছিল না। চপলা শৈশবে পিতৃমাতৃহীন। এক জন অতিদূর-সম্পর্কীয় ব্যক্তি সঙ্গে করিয়া গৃহে রাখিয়াছিলেন, এইমাত্র। চপলার প্রতিপালকের কন্যাটিকে বিধাতা সৌন্দয্য দান করেন নাই, কিন্তু সেই অপরাধে সুন্দরী চপলা তাঁহার বয়স্যার জননীর প্রিয়পাত্রী হইতে পারেন নাই। নানা কারণে চপলার দুঃখে কাহারও আহার ও নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল না।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

আশ্রিতা

প্রায় এক ক্রোশ পথ ভাসিয়া যাইবার পর ডোঙ্গাখানি একটা বাঁকে ঘুরিয়া প্রায় কূলের নিকটবর্তী হইল। সন্তরণকারীও সঙ্গে-সঙ্গে আসিয়া সেই স্থানে ডোঙ্গা ধরিয়া ফেলিলেন। চপলা তখনও স্থির হইয়া ডোঙ্গা ধরিয়া বসিয়া ছিল; কোনও দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই।

বলিষ্ঠ সন্তরণকারী যখন ডোঙ্গাখানি কূলে টানিয়া লইয়া চপলাকে নাবিতে বলিলেন, তখন তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল, সে নাবিতে পারিল না। যুবক ধীরে-ধীরে এক হাতে নৌকার ছেঁড়া দড়িটুকু ধরিয়া, অন্য হাতে বালিকাকে তুলিয়া কূলে নাবাইয়া দিলেন। উভয়েই আর্দ্রবস্ত্রা। চপলা চলিতে পারে না। যুবক তাহাকে বহন করিয়া নিকটস্থ পল্লীতে গেলেন।

গ্রাকের লোকেরা তাঁহাদিগকে কাপড় দিল, আহার দিল, তাঁহারা সন্ধ্যার পূর্বেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। যুবক চপলাকে বলিলেন, চল, তোমাকে গ্রামে রাখিয়া আসি। চপলা কাঁদিয়া কহিল, তাহার কেহ নাই; যাঁহার গৃহে সে আশ্রিতা, সে তাহাকে মারিবে, এবং তিরস্কার করিবে। যুবক তখন বালিকাকে লইয়া একটি প্রান্তর পার হইযা রাত্রিকালে একটি সৈন্য-নিবেশের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। যুবককে দেখিবামাত্র সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল; এবং জানাইল যে, তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য থানেশ্বরে যে সকল লোক গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে; এবং চারি দিকে তাঁহার সন্ধানে লোক গিয়াছে।

অবিলম্বে দশ জন দাসী নিযুক্ত করিবার জন্য যুবক আদেশ করিবামাত্র "আজ্ঞা যুবরাজ!" বলিয়া লোক ছুটিল। এক প্রহর রাত্রির মধ্যেই দাসী নিযুক্ত হইল, স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং চপলা রাজকুমারীর মতো সেবা শুশ্রুষা পাইতে লাগিল।

যুবক সৈন্যেরা যুবরাজ চন্দ্র গুপ্তের এই অভিনব অনুষ্ঠান দেখিয়া গা টেপাটিপি করিতে লাগিল; বয়স্কেরা বিরক্ত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল যে কাজটা ঠিক হইল না। সকলেরই সন্দেহ হইল যে, এই কুড়ানী মেয়েটা বুঝি রাজরাণী হইয়া উঠিবে। রাজকুমারের এক জন ভৃত্য দর্প করিয়া বলিল যে, শ্রীমতী ধ্রুবদেবীর কাছে সংবাদ গেলেই রাজরাণীগিরি ঘুচিয়া যাইবে। যুবকটি মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত; ধ্রুবদেবী যুবরাজের পত্নীর নাম। যুবরাজ পশ্চিম প্রদেশে যুদ্ধযাত্রার জন্য বাহির হইয়াছিলেন।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

ইতিহাস

যে চতুর্থ শতাব্দীর ঘটনা লইয়া এই আখ্যায়িকা সে সময়ের রাষ্ট্রোন্নয়নের দু-চারিটি কথা বলিতেছি। প্রাচীন ইতিহাসের সহিত অধিকাংশ পাঠকের পরিচয় নাই বলিয়া, একটি ক্ষুদ্র অখ্যায়িকা লিখিতে গেলেও ইতিহাসের কথা বলিতে হয়।

মৌর্যকুলতিলক দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী মহারাজচক্রবর্তী অশোকের সময়ে গান্ধার হইতে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত, নেপাল হইতে মহীশূর পর্যন্ত, সমগ্র দেশ একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল।

ইহা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর কথা। তাহার পর যখন খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মৌর্যবংশের অধোগতি হইল, তখন সুঙ্গবংশীয় রাজারা ভারতের সম্রাট হইয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে লিখিত আছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ক্ষুদ্র প্রদেশবিশেষের রাজা ছিলেন। এই দেশে তখন যবন, শক, তুরস্ক, চীনজাতীয়েরা আসিযা রাজত্বস্থাপন কবিতেছিলেন, এবং সমগ্র আর্যাবর্ত বৈদেশিক আক্রমণে প্রপীড়িত হইয়াছিল। অনার্যজাতীয় অন্ধ্র রাজারা কেবল দক্ষিণ প্রদেশেই প্রবল হইয়াছিলেন; আর্যাবর্তে বিদেশীয়দিগেবই প্রভাব বিস্তৃত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে কালরাত্রির আরম্ভ, খ্রিস্টোত্তব তৃতীয় শতাব্দীতে তাহাব শেষ।

এই দীর্ঘব্যাপী অন্ধকারের অবসানে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদযে নতুন প্রভাতেব সম্ভবত শ্রীগুপ্ত এই গুপ্ত-বংশের প্রথম রাজা। শ্রীগুপ্তের পুত্র ঘটোৎকচের রাজত্বের পব ৩১৯ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্র গুপ্ত বিক্রমাদিত্য নেপাল হইতে নর্মদা পর্যন্ত জয় কবিয়া, কানোজ-সন্নিহিত নূতন পুষ্পপুর বা কুসুমপুবে রাজধানী স্থাপিত করেন; এবং ওই বৎসর হইতে নূতন গুপ্তাব্দের প্রথম বৎসর গণিত হয়।

প্রাচীন পুষ্পপুর বা পাটলিপুত্রে লিচ্ছবি-বংশীয় বাজারা হীনবল হইয়া বাজত্ব করিতেছিলেন, এবং প্রধানত নেপালেই লিচ্ছবিদিগের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই লিচ্ছবি রাজারা গুপ্তদিগের অধীশ্বরত্ব স্বীকার করিতেন, এবং উঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইযাছিলেন।

৩৫০ খ্রিস্টাব্দে সমুদ্র গুপ্তের রাজত্বের আরম্ভ। সমুদ্র গুপ্তের পুত্র দ্বিতীয চন্দ্র গুপ্ত বিক্রমাদিত্য যখন যুবরাজ, এই আখ্যাযিকা সেই সমযের কথা লইয়া। আলাহাবাদের স্তম্ভলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে সমগ্র আর্যাবর্ত, বঙ্গ, কামরূপ, লিঙ্গ ও কোশল, সমুদ্র গুপ্ত কর্তৃক বিজিত হইযাছিল; এবং কেরল পর্যন্ত দক্ষিণ ভূভাগেও তিনি রাজাধিরাজ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের পব ভারতবর্ষে এমন গৌরবেব দিনের ইতিহাস আব নাই।

॥ চুতর্থ অধ্যায় ॥

রাজমন্ত্রী

মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের প্রিয় সচিব প্রিয়বর্মা, কুসুমপুরের বাজপ্রাসাদে বসিযা কতকগুলি পাঠ করিতেছিল, এমন সময়ে স্বয়ং মহারাজ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজ্যের কুশল তো?" প্রিয়বর্মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং রাজা তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। উভয়ে আসন গ্রহণ করিবার পর প্রিয়বর্মা বলিলেন, "মহারাজ, এখন শক, যবন প্রভৃতি সকলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া আদৃত হইয়াছেন; আপনাদের প্রতিও ব্রাহ্মণদের বিদ্বেষ তিরোহিত হইয়াছে; এখন বিজিত রাজ্য সুরক্ষিত করিবার দিকে বিশেষ মনোযোগী হইবার প্রয়োজন।" মহারাজ কহিলেন, "পাঞ্জাব ও গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে ক্ষত্রপ রাজগণ বিজিত হইবার পূর্বে রাজ্যটিকে অখণ্ড মনে করিতে অখণ্ড মনে করিতে পারিতেছি না।" প্রিয়বর্মা হাসিয়া বলিলেন যে স্বয়ং যুবরাজ চন্দ্র গুপ্ত যে কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী। মহারাজ কহিলেন, তোমার পুত্র বিশ্ববর্মা যখন তাঁহার সহচর ও সহকারী, তখন জয়ের আশা করিতে পারি বটে। প্রিয়বর্মা কহিলেন, "মহারাজ আপনার

অনুগ্রহের পরিসীমা নাই; আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র নরবর্মাকে আপনি শাসনকর্তা করিয়া দিয়া আমার বংশগৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিশ্ববর্মা যদি যুবারাজের সহচর হইয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার মঙ্গল হইবে বটে কিন্তু রাজ্যের কল্যাণেব জন্য একটা প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।"

রাজা মনোযোগী হইলেন, এবং প্রিয়বর্মা কহিতে লাগিলেন; "সংবাদ্ পাইলাম যে হূন নামে একটা জাতি বড় বলশালী হইয়া উঠিয়াছে; এবং অচিরাৎ তাহাদের গান্ধার প্রদেশ অধিকার করিবার সম্ভাবনা। ভারতের পশ্চিম প্রদেশ সুরক্ষিত না হইলে কদাচ ভারতবর্ষের কল্যাণ হইবে না। হূনদিগের সন্ধান লইবার জন্য উপযুক্ত লোক প্রেরণ না করিলে নয়। বিশ্ববর্মা রোমকাদি পশ্চিমদেশীয় অনেক ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, তাহা জানেন। আমার ইচ্ছা যে তাহাকে ওই প্রদেশে প্রেরণ করি।" মহারাজ সচিবের স্বার্থশূন্যতা ও হিতৈষণার চিরদিনই মুগ্ধ ছিলেন; তবুও এই প্রস্তাব শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। চিন্তা করিয়া বলিলেন, "প্রিয়বর্মা, আমি একটু ভাবিয়া দেখি, তাহার পর তোমার কথার উত্তর দিব।"

এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, পঞ্জাব হইতে যুবরাজের দূত আসিয়াছে। দূত যে সকল পত্র আনিয়াছিল, রাজা ও প্রিয়বর্মা তাহা পাঠ করিয়া অবগত হইলেন যে যুবরাজের জৈত্রসেনা নির্বিঘ্নে পশ্চিমপথ বাহিনী হইয়াছে। ওই পত্রগুলির সঙ্গে আর দুখানি পত্র ছিল; রাজা তাহা অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। যুবরাজ প্রেরিত পত্র দুখানির একখানি মাতা দত্তদেবীর নামে, এবং অন্যখানি পত্নী ধ্রুবদেবীর নামে। ধ্রুবদেবীর পত্রে অন্য কথার মধ্যে এই কথাটি ছিল;—"তুমি হয়তো ভাব, তুমি ভারি রূপসী। থানেশ্বরে একটি চতুর্দশবর্ষীয়া ক্ষত্রিয়া কুমারী কুড়াইয়া পাইয়াছি, তাহাকে দেখিলে তোমার আত্মশ্লাঘা একটু কমিতে পারে।"

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

চপলার কথা

ক্ষত্রপ রাজা স্বামী রুদ্রসেন যুদ্ধ না করিয়াই সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। কাজেই মহারাজের অনুমতির অপেক্ষায় যুবরাজের সৈন্যেরা ভরুকচ্ছে অবস্থান করিতে ছিলেন। যে সময়ে যুবরাজ চপলার উদ্ধার করেন, তাহার পর হইতে তিনমাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই তিন মাসে চপলার সঙ্গে যুবরাজের কিরূপ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দিতেছি।

চপলা একটি যবনীর শিক্ষাধীন থাকিয়া চিত্র আঁকতে শিখিতেছিল। পূর্ব হইতেই এ বিষয়ে চপলার একটু শিক্ষা ছিল; এবং সে যাহা কিছু দেখিত, তাহারই ছবি আঁকিত। সেই জন্য যুবরাজ তাহার জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চপলা ছবি আঁকিতেছে, এমন সময়ে চন্দ্রগুপ্ত গিয়া বলিলেন, কি আঁকিতেছ চপলা? চপলা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া ছবি ঢাকিয়া বলিল, "তা বলিব কেন?" যবনী হাসিয়া বলিল, "আজ একটা নাক আঁকিতেছে; বলিতেছিল যে, একটা ভালো নাক মকসো করিয়া লইয়া তার পর আপনার একটা ছবি আঁকিবে।" চপলা হাসিতে লাগিল। যুবরাজ স্মিতমুখে বলিলেন, "আমার নাকের উপর তোমার এত দৌরাত্ম্য কেন?" চপলা যবনীর গা টিপিয়া বলিল, "সে কথা বোলো

না কিন্তু। যুবরাজ বলিলেন, কি কথা?" চপলার গোটা দশেক 'না না'র মধ্যে যবনী কহিল, চপলা বলিতে ছিল যে, আপনার নাকটা খারাপ হলে দেবী রাগ কবিবেন। চপলাব লজ্জা হইল। যুবরাজ চলিয়া গেলে, চপলা যবনীকে বলিল, "মেলিনা, তুমি বড় দুষ্ট!"

আর-একদিন বিশ্ববর্মা, নন্দী ভদ্র প্রভৃতি যুবরাজের প্রিয়পাত্রদেব মধ্যে কে ভালো কে মন্দ লইয়া মেলিনা ও চপলার তর্ক চলিতেছে, এমন সময়ে যুবরাজ কুশল প্রশ্ন করিতে আসিলেন। চপলা প্রথমেই বলিল, আচ্ছা বলুন দেখি, নন্দী ভদ্র খুব ভালো মানুষ নয়? যুবরাজ বলিলেন, ভালো মানুষ বই কি; নইলে তোমাকে রোজ-রোজ বাদাম এনে দেয়? চপলা বলিল, "আচ্ছা বাদাম যদি নাই দিতেন; তবুও তো ভালো মানুষ?" মেলিনা বলিল, তিনি ভালো নয়, তা তো আর আমি বলিনি। আমি বলিতেছিলাম যে বিশ্ববর্মার মতো লোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। চপলা যুবরাজকে বলিল, "দেখুন বিশ্ববর্মা ওঁদেব গ্রিক কথা জানেন কিনা, তাই এই পক্ষপাত।"

আর-একদিনের কথা বলিতেছি। রাজধানীতে সন্ধির প্রস্তাব যাইবার পূর্বে মহারাজেব এক আদেশলিপি আসিয়াছিল, যে বিশ্ববর্মাকে গান্ধাব অভিমুখে চর স্বরূপ যাইতে হইবে। সেই আদেশ পাইবার পর যুবরাজ বড়ই চিন্তিত থাকিতেন। একদিন যুবরাজ নানা কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে চপলা আসিয়া বলিল, যে তাহাব একটা সোনাব পদক চাই। সরলা বালিকার আবেদনে তৃপ্তিলাভ করিয়া যুবরাজ কহিলেন, "কি রকম পদক, চপলা?" চপলা চিত্র আঁকিয়া বুঝাইয়া দিল। "আচ্ছা, শীঘ্রই পাইবে" বলিয়া যুববাজ পুনরূপ চিন্তামগ্ন হইলেন। চপলার তাহা সহ্য হইল না; সে বাগ কবিযা চেঁচাইতে লাগিল। যুবরাজ হাসিয়া তাহাদের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলেন।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

নতুন চিন্তা

স্বনামখ্যাত বুদ্ধঘোষ তখনও ত্রিপিটকের টীকা লিখিয়াছিলেন কি না, বলিতে পবিবারের কিন্তু তিনি প্রসিদ্ধ উপদেষ্টা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষ, যুবরাজ চন্দ্র গুপ্তকে সুগত-মাহাত্ম্যের অনুরাগী করিবার জন্য তাঁহার বুদ্ধ শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। যুবরাজ সমস্ত দিন তাঁহার সহিত ধর্ম বিষয়ে কথপোকথনেব পর অপবাহ্নে চপলার সংবাদ লইতে গেলেন। বুদ্ধঘোষ দেখবি আয়! বলিয়া মেলিনা চপলাকে ডাকিযাছিল, চপলার ক্ষুদ্র কক্ষটুকু শূন্য। সেখানে তাহার কয়েকখানি চিত্র পড়িয়াছিল; সেগুলি দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া রাজা কক্ষমধ্যে গেলেন। একটা পাখিব ছবির তলায় তাহার নতুন পদকখানিও ছিল। পদকখানি একটু নতুন রকমের যদি খুব বড় না হইত, তাহা হইলে সে খানিকে একালের লকেট বলা চলিত। যুবরাজ অন্যমনস্কে ছবি দেখিতে দেখিতে পদকের ডালাটি খুলিয়া ফেলিলেন, এবং দেখিলেন, উহার মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র চিত্র। ক্ষুদ্র চিত্রখানি দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, এবং ধীরে-ধীবে পদকখানি বন্ধ করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া, দ্রুতপদে সেই কক্ষ হইতে বাহিবে আসিলেন। কিছু দূরে অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন যে মেলিনা ও চপলা একসঙ্গে আসিতেছে। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় গিয়াছিলে? চপলা বলিল,— 'আমি ভাবিয়া ছিলাম যে, না জানি কি একটা নতুন জন্তু কিছু হইবে। মানুষ! আমরা

বুদ্ধ ঘোষ দেখিয়া আসিলাম।" চন্দ্র গুপ্ত হাসিয়া বলিলেন, "চপলা, বুদ্ধঘোষ ভারি পণ্ডিত, সাধু পুরুষ।" চপলা তখন গম্ভীর হইয়া তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিল।

চপলার চঞ্চলতার অভ্যন্তরে যে স্থিরতা ও গাম্ভীর্য ছিল, চন্দ্র গুপ্ত আজি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। চন্দ্র গুপ্ত বালিকার দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, চপলা তুমি আর কত দিন এখানে থাকিতে পারিবে? চপলার এবারে গম্ভীর হইয়া বলিল যে, আর ভালো লাগে না, তাহার কুসুমপুর দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে, সে ধ্রবদেবাকে দেখিতে চায়। যুবরাজ বলিলেন, তুমি তো কখন বড়-বড় দেখ নাই; তিনি কি তোমাকে ভালোবাসিকেন? চপলা মুখ উঁচু করিয়া যুবরাজ তাহা চোখ করিয়া বলিল, "নিশ্চয়! তিনি আমাকে খুব ভালোবাসবেন।" যুবরাজ আনন্দিত জানিতেন বটে; কিন্তু বালিকার এই প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলেন।

এই আনন্দের মধ্যে একটুখানি চিন্তারও উদয় হইল। সন্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হইল কিনা, এবং বিশ্ববর্মাকে অবিলম্বে গান্ধারে না পাঠাইলে চলে কিনা এই কথা ভাবিতে লাগিলেন।

।। সপ্তম অধ্যায় ।।

হূন-সংবাদ

আমি মহাবাজের আদেশ উপেক্ষা করিয়া এখানে বসিয়া থাকিতে পারিব না। যখন সন্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে, তখন আপনি সন্ধিস্থাপন করিয়া রাজধানীতে চলিয়া যান। আমি একজন ভৃত্য লইয়াই ছদ্মবেশে গান্ধার যাত্রা করিব। বিশ্ববর্মার কথার প্রতিবাদ করা অসম্ভব। কিন্তু যুবরাজ বলিলেন,—এ বিষয়ে আমি একটি দ্বিতীয় প্রস্তাব করিয়াছি। তাহার জন্য আব একটু প্রতীক্ষা করিলে ক্ষতি কি? বিশ্ববর্মা কহিলেন, যুবরাজ, মহাবাজ বিশেষ বিবেচনা করিয়া যে আদেশ দিয়াছেন, তাহার পালন না করিয়া অন্যবিধ প্রস্তাব করিলে কর্মভীরুতা প্রকাশ পাইবে। বিশেষত যে জন্য এই আদেশ, তাহার গুরুত্ব আমরা অনুভব করিতেছি। সে দিন শ্রমণ কুমার জাব যাহা বলিতেছিলেন, তাহাতেও হূনদিগের প্রভাব বৃদ্ধির কথায় বিশ্বাস হইতেছে। এ সময়ে কালহরণ করা রাজদ্রোহিতা। যাহা হউক, যুবরাজ বিসন্নচিত্তে অনুমতি দিলেন; কিন্তু তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছিল। এবং বিশ্ববর্মা যুবরাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া একটি বৃক্ষমূলে গিয়া বসিলেন, টলেমির আকাশের তারাগুলির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বিশ্ববর্মা জন্য গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, অনেক নক্ষত্রের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। এইজন্য তিনি যখন আকাশের দিকে চাহিয়া বসিতেন, কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিত না। অনেকক্ষণ পরে, যিনি নক্ষত্রগণের পতি, যিনি নরভাগ্যের নেতা, সজলনয়নে তাঁহাকে প্রাণিপাত করিলেন। যদিও মেলিনা ভিন্ন অন্য কেহ এ কথা জানিত না, তবুও কথাটা খুলিয়া বলাই ভালো, যে বিশ্ববর্মা চপলার আনন্দময়ী প্রতিমার অনুপীড়িত হইয়াছিলেন। কর্তব্যের অনুরোধে গান্ধারে যাইতেছেন, কিন্তু চপলার জন্য মন উদ্বিগ্ন হইতেছে। চপলা তাঁহার আয়ত্তের অতীতে, বহু ঊর্ধ্বে, তাহাই মনে করিয়া পীড়িত হইতেছিলেন। চপলার প্রণয়প্রার্থী হইলে যুবরাজের সহিত এ বন্ধুত্ব আর থাকিবে না। সেই জন্য মনে-মনে সঙ্কল্প করিতেছিলেন যে রাজ্যের সেবার জন্য, ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য তিনি, আপনার মনের ব্যথা মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিবেন।

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

দু-চারিটি সাংসারিক কথা

যুবরাজ যখন রাজধানীতে ফিরিলেন, তখন দক্ষিণ প্রদেশ হইতে সংবাদ আসিল যে মালয় উপকূলে চের-রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এই বিদ্রোহ নম্বুরি ও নাযারেরা উপস্থিত করিয়াছিল। ইতিহাসে ইহার তারিখ ৩৮৯ খ্রিস্টাব্দ যুবরাজ অনেক দিন পরে রাজ্যে ফিরিয়াছেন বলিয়া, এবারে মহারাজ সমুদ্র গুপ্ত স্বয়ং দক্ষিণাপথে গমন করিলেন। এই বিদ্রোহের সুবিধায় চের-রাজ্য জয় করিয়া সিংহল পর্যন্ত যাত্রা করিবার অভিপ্রায়ে মহারাজ বহু সৈন্য লইয়া রাজধানী হইতে চলিয়া গেলেন। দুটি বৎসর রাজ্যভার সম্পূর্ণরূপে যুবরাজের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। যুবরাজ দেখিলেন যে প্রিয়বর্মা যেখানে মন্ত্রী, সেখানে রাজ্যশাসন অতি সহজ।

বিশ্ববর্মা যখন হূনদিগের সংবাদ সবিশেষ ভাবে লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন মহারাজ তখন সিংহল জয় করিয়া ফিরিয়াছিলেন, এবং তখন তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। যুবরাজই সমগ্র রাজকার্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

মহারাজের সিংহল-জয়ের প্রায় তিন বৎসর পরে মালবের শাসনকর্ত্তা নরবর্মা পরলোক গমন করিলেন। প্রিয়বর্মা একে বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার উপর এই শোকের আঘাত। তিনি এখন কদাচিৎ প্রয়োজন উপলক্ষে রাজগৃহে আসিতেন; নচেৎ গৃহেই থাকিতেন। মালবের শাসনকর্তার নিয়োগ বিষয়ে অনুমোদন চন্দ্র গুপ্ত যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত সানন্দে তাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। সে কথা পরবর্তী অধ্যায়ে বলিতেছি।

॥ নবম অধ্যায় ॥

নতুন-পুরাতন

একদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর প্রিয়বর্মা গৃহের বারান্দায় শয়ন করিয়া আছেন এবং একটি ক্ষুদ্র শিশু তাঁহার নিদ্রার বিঘ্ন জন্মাইয়া আনন্দদান করিতেছে। শিশুটি বৃদ্ধের নাতি। তিন বৎসরের বয়সের ছেলেটি বৃদ্ধের পৈতাগাছটি লইয়া এক, পাঁচ, তিন করিয়া তার গুণিতেছে; মুখে হাত দিয়া, দাঁত নাই কেন, তাহার অনুসন্ধান করিতেছে; এবং সর্বাঙ্গে নূপুর-পরা ছোট পায়ের ধুলা মাখাইয়া দিতেছে। দেখিতেছিলেন শিশুর করস্পর্শে আনন্দে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। বালক দাদা-দাদা বলিতেছিল; এবং তিনি মুহূর্তের জন্য বৃদ্ধত্ব ভুলিয়া যৌবনের অতীত তীরের শৈশবসুখ স্মরণ করিতেছিলেন। মনে হইল যেন তিনি আবার শিশু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া শিশুদের সঙ্গে খেলা করিতেছেন। দীর্ঘ দিবা-নিদ্রার পর যেমন কখনও-কখনও অপরাহ্নে প্রভাতের ভ্রান্তি হয়, বৃদ্ধের যেন তেমনই ভ্রান্তি হইয়াছিল।

বৃদ্ধ যখন পুনর্জন্ম লাভ করিয়া স্বপ্নে মগ্ন, তখন শিশুর মাতা দেখিলেন যে দুষ্ট ছেলেটা বড় উৎপাত করিতেছে। তিনি তাহাকে টানিয়া আনিতে গেছে যে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, শিশু তাহা গ্রাহ্য করিল না। যুবতী হয়তো জানিতেন না, যে এ সংসারে ঠাকুরদাদার মতো মিষ্ট পদার্থ আর নাই! যুবতী শিশুকে একটু জোর করিয়া কোলে তুলিতে গেলেন, শিশু একটি টানে তাহার গলার হারগাছি ছিঁড়িয়া ফেলিল। রণজয়ী শিশু হারগাছি

ফেলিয়া দিয়া যখন চুন ধরিল, তখন বৃদ্ধের স্বপ্ন ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন, থাক না মা লক্ষ্মী, টানাটানি করে কি হবে? আমাকে কিছু বিরক্ত কচ্চে না।

বৃদ্ধের মুখের কথা মুখে আছে, এমন সময় যুবরাজ চন্দ্র গুপ্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিলেন, এবং যুবতী কোনও প্রকারে চুল ছাড়াইয়া গৃহের মধ্যে চলিয়া গেলেন। যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, চপলা, তোমার ছেলে খুব দুষ্ট হয়েছে? তা হোক, এসো বন্ধু, আমার কোলে এসো! যুবরাজ ছেলের নাম রাখিয়াছিলেন বন্ধু। পরেও ইনি বন্ধু বর্মা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন; সে কথা ইতিহাসজ্ঞেরা জানেন।

বন্ধু কিন্তু ছেঁড়া হারগাছির সঙ্গে একটা পদক পাইয়াছিল; সেইটিতে সে মনোযোগ দিযাছে। পদকটি দৈবাৎ খুলিয়া গেল, এবং একখানি কাগজ বাহির হইয়া পড়িল। যুবরাজ তাড়াতাড়ি হাতে লইয়া তাহা রক্ষা করিলেন। বহুদিন পূর্ব হইতে যুবরাজের জানা ছিল যে চপলা বিশ্ব বর্ম্মার ক্ষুদ্র ছবি আঁকিয়া পদকে পুরিয়া রাখিয়াছিল। যুবরাজ হাসিয়া-হাসিয়া সে প্রতিবৃতিটি পদকে পুরিয়া পদক বন্ধ করিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইলেন; চপলার ভারি লজ্জা হইল। সে জানিত না যে, যুবরাজ তাহার পদকের কথা সব জানেন।

চপলা ভালো করিয়া কাপড় গুছাইয়া পরিয়া বাহিরে আসিয়া ছেলে কোলে নিল এবং প্রিয়বর্মা যুবরাজকে বসিতে বলিলেন। যুবরাজ তখন বিশ্ববর্মার মালব শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত হইবার সংবাদ দান করিলেন। চপলা বলিল, না, বাবা এ বয়সে অত দূর কি করে যাবেন? যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, আমরা তাহার সুব্যবস্থা করিব। চপলা তখন আবার বলিল, তা হলে আপনি দেবীকে নিয়ে মালবে মাঝে-মাঝে যাবেন বলুন? যুবরাজ স্বীকৃত হইলেন। চপলা এখনও তাঁহার আদরের আদরিণী ছোট বোনটি।

১৫ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩১১

যুদ্ধ ও সন্ধি



সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

বিনোদচন্দ্র সরমাসুন্দরীকে লইয়া নির্বিঘ্নে দিনযাপন করিতেছিলেন। হঠাৎ ভ্রাতা অতুলচন্দ্র সস্ত্রীক পৈত্রিক ভিটায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার স্ত্রী সুবালা বড়বউ। বিনোদচন্দ্রের স্ত্রী সরমা মেজবউ। ঈশ্বরের কৃপায় বিনোদচন্দ্রের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল, এবং সেই কৃপা ঘনীভূত হইয়া উত্তরোত্তর বিনোদের সুখবৃদ্ধি করিতেছিল। বিনোদের পুত্র অধির এইবার এন্ট্রেন্স পাশ করিবে।

অতুলচন্দ্রের উপর ঈশ্বরের কৃপা কন্যারূপে বর্ষিত হইয়াছিল। অতুলচন্দ্রের গতিক দেখিয়া ভয় হইয়াছিল যে, এবংবিধ কৃপাবারি-বর্ষণ স্থগিত না হইয়া বরং বর্ধিত হইবে। গগনে মেঘের পুনঃসঞ্চার দেখিয়া অতুলচন্দ্র স্থির কবিয়াছিলেন যে, পৈত্রিক-ভদ্রাসান সমান অংশে বিভাগ করিয়া লইয়া প্রথম কন্যার বিবাহের ব্যয়নির্বাহ করিবেন।

অতুলচন্দ্র উত্তর-পশ্চিমে একটা ব্যাঙ্কে কর্ম করিতেন। বিনোদচন্দ্র গুড়েব ব্যবসায় করিতেন।

বড়বউ কখনও মেজবউকে দেখেন নাই। সরমা অতি সমাদরে বড়বউ ঠাকুরাণীকে অভ্যর্থনা করিল। বড়বউ তাহা গ্রহণ করিয়া মেজবউকে বাধিত করিলেন। অতুলচন্দ্র বিনোদের গুড়ের ব্যবসায়ের উন্নতির উপর লক্ষ্য করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন, এবং বিনোদচন্দ্র অগ্রজের ক্ষীণ শরীর লক্ষ্য করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিল।

বিনোদচন্দ্রের পুত্র অধর সকলকে যথাবিহিত প্রণামপুরঃসর আপ্যাযিত করিযা সেবায় নিযুক্ত হইল। অতুলচন্দ্রের কন্যা পুঁটি পিতৃব্যের গুড়ের কারখানা দেখিবার নিমিত্ত বহির্বাটীতে গেল।

একটু অবসর পাইলে বিনোদ রন্ধনশালায় পত্নীর নিকট গিয়া বলি,—"দাদা কেন আসিয়াছেন, জান?"

সরমা একটু হাসিয়া বলিল,—"পৈত্রিক ভদ্রাসন বিভাগ করিতে।" বিনোদ ভাবিল,—"সরমা কি বুদ্ধিমতী"।

সরমা ভাবিল,—"বিনোদ কি বোকা!"

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর উভয়পক্ষ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে অতুলচন্দ্র তাঁহার নির্দিষ্ট কামরায় সহধর্মিণী সুবালার সহিত পরামর্শ নামক মানবধর্মে রত হইলেন।

সেই সুন্দর ভদ্রাসন, বড়-বড় কামরা, সুসজ্জিত শয্যা, বৃহৎ উদ্যান, বিস্তীর্ণ জলাশয়, গরুবাছুরের পাল, সুবালা সমস্ত লক্ষ্য করিয়াছিল। ইহার মধ্যে কতটা পৈত্রিক সম্পত্তি, এবং কতটা বিনোদের নিজের সঞ্চিত, তাহা অতুলচন্দ্র জ্ঞাত ছিলেন না। বহুবৎসর পূর্বে পিতার মৃত্যুর পরে অতুলচন্দ্র একবারমাত্র বাড়ি আসিয়াছিলেন; তখন কনিষ্ঠ বিনোদ স্কুলে পড়িত। পিতৃহীন সহোদরকে মাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া অতুলচন্দ্র কর্মস্থলে চলিযা গিয়াছিলেন। তখন কয়টা গরু ছিল, এবং পুষ্করিণীটা কত বড় ছিল, এবং আমবাগানটা কত দূর অগ্রসর হইয়াছিল, কিংবা বহির্বাটীতে কয়টা কামরা ছিল, এবং পুষ্করিণীর

উত্তরাংশের তালগাছকয়টা জন্মাইয়াছিল কি না, তাহা তিনি লক্ষ করিয়া দেখেন নাই। পাঁচ বৎসর পূর্বে মাতা যখন কাশীতে দেহত্যাগ করেন, তখন সেখানে বিনোদের সহিত অগ্রজের সাক্ষাৎ হয়। বিনোদ বলিয়াছিল,—"দাদা, এবার বাড়িটার কি হইবে?" অতুলচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"ও সব ভাবনা তোমায় করিতে হইবে না।"

সুবালা বলিল,—"তুমি এতদিন উপার্জন করিয়া কি ছাই করিয়াছ? তুমি কাঙাল, আর এরা নবাবের মতো সমস্ত বিষয়টা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।"

অতুলচন্দ্র,—"এখন উপায়? ইহার মধ্যে আমার কতখানি ভাগ, তাহা তো নির্ধারণ করা শক্ত। উপরন্তু একটা গুড়ের কারখানা করিয়া বিষয়টা জটিল করিয়া ফেলিয়াছে।"

সুরমা,—"তুমি চিরকালই হতভাগা থাকিয়া যাইবে। এ বিষয় সমস্ত তোমার। তুমি চুল চিরিয়া হিসাব করিয়া লও, নচেত তোমার সহিত আমার ইহজন্মে সম্বন্ধ নাই।"

॥ ৩ ॥

অতুলচন্দ্র গৃহিণীর ন্যায়সঙ্গত বিচারে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, পৈত্রিক ভদ্রাসন ও স্থাবর সম্পত্তি ক্রমে-ক্রমে দৃঢ়ভাবে কনিষ্ঠের হস্তগত হইয়াছে। তাহার উদ্ধার করা সহজ কথা নয়। তজ্জন্য কাঠখড় চাহি, উকিলের পরামর্শ চাহি, এবং একবার সাহস করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া চাহি। অতুলচন্দ্র একবার ভাবিলেন যে,—"ইহাতে বিনোদের মত কি?" হয়তো পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিলে বিনোদ অর্ধেকটা অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারে। কিন্তু তাহা ছাড়া সম্ভব নহে, কেন না, বিনোদ নিজে পরিশ্রম করিয়া সম্পত্তিটা বর্ধিত করিয়াছে। ইহাই তাহার সম্পূর্ণ চালাকি।

ক্রমেই অতুলচন্দ্র ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুভব করিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। সেই অস্থিরতা ক্রমে ঘোরতর ঝটিকারূপে মস্তকে বহিতে লাগিল। সহজ কথায়, অতুলচন্দ্র রাগিয়া উঠিলেন, এবং ক্রোধান্ধ হইয়া হিতাহিত-জ্ঞান হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িলেন।

ক্রমে গৃহিণী ও কর্তা উভয়ে যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। যেমন গুপ্ত পরামর্শ একটা প্রথা, তেমনি আড়ি পাতিয়া শুনাও একটা প্রথা। আত্মরক্ষার্থ ইহা অনেক স্থলে উপকারে আসে। অতুলচন্দ্রের পরামর্শে সরমার দাসী গদার মা অতি পরিষ্কারভাবে কান পাতিয়া শুনিয়াছিল। গদার মা পুরুষানুক্রমে (স্ত্রীবিভাগে) এই ব্যবসায় করিয়া আসিতেছিল, সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে কান পাতিয়া ফেলিতে হইয়াছিল।

গদার মা বিনোদকে পুত্রের ন্যায় ভালোবাসিত, এবং গদার মৃত্যুর পর বিনোদেব বাড়িতে আর চুরি করিত না। এইরূপে স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া গদার মা কর্তব্যনুষ্ঠান করিতে ত্রুটি করিল না। কথাটা বিনোদের কানে উঠিল, এবং কালক্রমে অর্ধঘণ্টার মধ্যেই সরমার কানে গেল, এবং কান হইতে মরমে প্রবেশ করিল।

সেই শান্তির উদ্যানে একটা বেতর ঝড় বহিল। পাড়ার বন্ধুবর্গ তাহার লক্ষণ বুঝিল।

॥ ৪ ॥

সকলে লক্ষ করিয়া দেখিল, অতুলচন্দ্র পাড়ার হৃষীকেশ ভট্টাচার্য ও ভজহরি মোক্তারের সহিত প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানে গেলেন। হৃষীকেশ ভট্টাচার্য ইতিপর্বে গুড়ের কারবারে কর্মচারি ছিলেন। তহবিল আত্মসাৎ করিয়া বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সকলে লক্ষ্য

করিয়া দেখিল যে, বেলা দশটা বাজিয়া গেল, অথচ কেহ ঘাট হইতে প্রত্যাবর্তন করিল না।

সরমা বড়বউকে জিজ্ঞাসা করিল,—"দিদি, তুমি আজ দুধ কিনিতে দিয়াছ কেন? আমাদের গরুর যথেষ্ট দুধ হয় তো?"

বড়বউ গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"এ সংসারে কার দুধ কে খায়? পুঁটির অল্প দুধে কুলায় না, আর আমার ইচ্ছা নাই তোমাদের দুধ লইয়া পুঁটিকে খাওয়াই। আমরা কয়দিন আছি মাত্র, তার জন্য এত কথা কেন?"

ইত্যবসরে পুঁটি অধরের হাত ধরিয়া বাগানে আম পাড়িতেছিল, তাহা দেখিয়া বড়বউ ধীরপাদবিক্ষেপে কন্যার নিকট অগ্রসর হইলেন, এবং কোনও কারণ ব্যক্ত না করিয়া পুঁটির পৃষ্ঠে ক্রোধের উচ্ছ্বাসটা প্রচুরভাবে ঝাড়িয়া দিলেন। পুঁটি মুখব্যাদান করিয়া কাঁদিল, এবং অধর ত্রাসে দৌড় দিয়া পুষ্করিণীর পাড়টা পার হইয়া গেল।

গদার মা জিজ্ঞাসা করিল,—"আহা! মেয়েটাকে অত মারা কেন?"

সুরমা,—"মেয়েটা তো আর তোমাদের নয় যে, তোমরা বসিয়া-বসিয়া তার মাথাটা খাইবে। তুমি নিজের কাজে যাও।"

তৎপরে পুঁটির উপর যথাবিধি নীতিবাক্য প্রয়োগ করিয়া এবং অত বড় ডাগর মেয়ের অত বড় ডাগর ছেলের সঙ্গে হাস্য তামাসা করা অবৈধ তাহা বুঝাইয়া দিয়া বড়বউ পুনরায় খাস-কামরায় প্রবেশ করিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহরে অতুলচন্দ্র বাটিতে ফিরিয়া আসিলেন। সুবালা জিজ্ঞাসা করিল,— "পরামর্শ স্থির হল?"

অতুলচন্দ্র—হাঁ; উকিলের পরামর্শে বুঝিতে পারিলাম যে, গুড়ের কারখানা ছাড়া অন্যান্য সম্পত্তির পুরা অর্ধেক আমার।

॥ ৫ ॥

সুবালা তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। গুড়ের কারবার স্বতন্ত্র হইলেও জমিটার অর্ধেক যায় কোথা? তাঁহার বোধ হইল যে, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ফাঁকি দিতেছে। এই অন্যায় অনুষ্ঠানে এবং পুঁটির দশা ভাবিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতুলচন্দ্র ব্যথিতচিত্তে অনেক আশ্বাসবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

বিনোদ হঠাৎ দশটার গাড়িতে কলিকাতায় চলিয়া গেল। বিনোদ একখানা টেলিগ্রাম পাইয়াছিল। তাহার মর্ম কি, কেহ জানিত না।

সেই অভিনব সংবাদ পাড়ায় রাষ্ট্র হওয়াতে সকলে বলিল, বিনোদ কলিকাতায় কৌন্সিলির পরামর্শ লইতে গিয়াছে।

কৌন্সিলির পরামর্শ! কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা! কার খাইয়া বিনোদ বড়মানুষ? অগ্রজ অতুলচন্দ্র জ্বলিয়া রুদ্রমূর্তি হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন,—"ওর গুড়ের কারখানায় আগুন লাগাইয়া দে!"

হৃষীকেশ ভট্টাচার্য আসিয়া বলিল,—"উহা অপেক্ষা সোজা উপায় আছে। এ ভদ্রাসন তো আপনারই, ইচ্ছা করিলে আপনি নিজের তালা লাগাইয়া রাখিতে পারেন। আপনি সকলকে বলিয়া দিন যে, আপনারই টাকা লইয়া এ কারবার চলিয়াছিল, এবং আপনিই ইহার পুরা লাভের দাবিদার।"

এ কথা সুবালার বড় ভালো লাগিল, এবং তৎক্ষণাৎ গ্রামস্থ ভদ্রলোকের সমক্ষে অগ্রজ অতুলচন্দ্র বিহিতভাবে সপ্রমাণ করিলেন যে, চতুর্দশ বৎসর ধরিয়া এলাহাবাদ হইতে এই গুড়ের কারবারের মূলধন ও খরচা তিনি দিয়া আসিতেছেন।

সকলে বলিল,—"ঠিক। আপনিই এ লাভের সম্পূর্ণ মালিক। আমরা জানি, বিনোদবাবু গুড়ের কারবার হইতে দশ হাজার লাভ করিয়াছেন, এবং তৎসমস্ত তাঁহার স্ত্রীধনে পরিণত করিয়াছেন।"

বড়বউ স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তাহা হইলে পৈত্রিক সম্পত্তি বিনোদ কিছুই পাইতে পারে না, কেন না, তাহার অর্ধাংশের দাম প্রায় দশ হাজার টাকা। এখনই গুড়ের কারখানা দখল করো ও বাটী হইতে উহাদের তাড়াইয়া দাও।"

॥ ৬ ॥

বাড়ি হইতে তাড়াইবার কথা সরমার কানে গেল। সরমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাক্স গুছাইল, এবং অধরকে ডাকিয়া হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অধর বলিল,—"মা, আমরা যাব কোথা? উনি কি ইচ্ছা করিলে আমাদের বাড়ি হইতে তাড়াইতে পারেন?"

সরমা বলিল,—"বাবা, উহারা গুরুজন, পিতার সমান। আমাদের শান্তভাবে চলিয়া যাওয়া ভাল।"

অধর পুরাতন ও নূতন বহিগুলি, পুরাতন ও নূতন কাপড়গুলি একে-একে গুছাইতে লাগিল। গদার মা ছুটিয়া গ্রামে গেল, এবং তাহার আত্মীয়স্বজনকে ডাকিয়া বাগানের পাকা আম ও বাটীর পুরাতন বাসনগুলি সুবিধা বুঝিয়া একে-একে সরাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরে বিনোদ কলিকাতা হইতে ফিরিল। তখন সরমা ঘাটে বসিয়া।

বিনোদ ধীরে-ধীরে সরমার নিকটে গিয়া বসিল। বিনোদ বলিল,—"সরমা, আমাদের সর্বনাশ হইয়াছে।"

সরমা বলিল,—"কিসের সর্ব্বনাশ?"

বিনোদ,—"গুড়ের কারবারে আমার পাঁচ হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে, এবং আরও পাঁচ হাজার টাকার দাবি করিয়া পাওনাদারগণ আমার ও দাদার অন্যান্য সম্পত্তি ক্রোক করাইবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছে। তাহারা দাদাকেও জড়াইয়াছে। দাদাকে না জড়াইলে তাহারা ভদ্রাসন বেচিতে পারিবে না।"

সরমা আকাশের দিকে চাহিল, এবং পুনর্বার স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "এখন উপায়?" বিনোদ। "উপায় কেবল এই যে, দাদাকে প্রমাণ করিতে হইবে, তাঁহার সহিত গুড়ের কারবারের কোনও সম্বন্ধ ছিল না, এবং ভদ্রাসনে আমার কোনও অধিকার নাই। আমি এখন তোমাকে ও অধরকে লইয়া পথের ভিখারি। বাকি কেবল দাদার অনুগ্রহ।"

॥ ৭ ॥

সন্ধ্যা গিয়া যেমন প্রভাত হয়, তাহাই হইল। সরমার চক্ষুর জল শিশিরের সহিত শুকাইল। বিনোদ গ্রামের মান্যগণ্য জমিদার জ্ঞানদাবাবুর বাটীতে স্ত্রী-পুত্রকে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে গেলেন।

বেলা দশটার সময় গুড়ের কারখানায় তালা পড়িয়া গেল, এবং বড়বাবুর তরফে লোক খাড়া হইল। তাহার দাপটে কারখানার কর্মচারিগণ ভাগিয়া গেল।

অপরাহ্নে সদরালার আদালত হইতে নাজির সাহেব ক্রোকি পরওয়ানা লইয়া রঙ্গস্থলে উপনীত হইলেন। অতুলচন্দ্র ক্রোধে গর্জিয়া বলিলেন,—"ও সব চালাকি আমি জানি! ওই গুড়ের কারখানা আমার, কেবল আমার, ইহাতে বিনোদের কোনও অংশ নাই। গ্রামস্থ লোক সকলে সাক্ষী।"

সকলে বলিল,—"হাঁ, ইহা ঠিক।"

নাজিরসাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"সেই কথাই ঠিক। তবে প্রমাণের প্রয়োজন নাই।"

বিনোদ দূর হইতে হাঁপাইতে-হাঁপাইতে দৌড়িয়া আসিল, এবং বলিল,—"নাজিরসাহেব! ইহাতে দাদার কোনও অংশ নাই। আমি প্রমাণ করিব। আমার দায়ে দাদার সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে না।"

গ্রামের ভজহরি মোক্তার কথাটা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলেন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,— "এটা কিসের ক্রোক?"

নাজির পরওয়ানা পাঠ করিয়া শুনাইলেন যে, ইহাতে বিনোদ ও অতুলচন্দ্রের বিরুদ্ধে পাঁচ হাজার টাকার দাবি দিয়া বিনোদের পাওনাদাবগণ উভয়ের স্থাবব ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করাইতেছেন।

তাহার পর মুচি ঢাকে কাঠি দিল। গ্রামস্থ লোক কাণ্ডটা বুঝিল। অতুলচন্দ্র হঠাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সকলে বলিল,—"উহাকে তুলিয়া লইয়া যাও। ইনি নিজের জালে নিজেই পড়িয়া গিয়াছেন।"

॥ ৮ ॥

ধীর নিস্তব্ধ নিশি। অতুলচন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিনোদ! এখন উপায়? আমার হাতে এক হাজার টাকাও যে নাই।"

বিনোদ সরমার নিকট গেল। সরমার মুখের জ্যোতি আবার মুখে আসিয়াছিল। সরমার সম্মুখে আবার কত শান্তির আশা, কত সুখের ছবি একে-একে নৃত্য করিতেছিল।

সরমা নিজের পুরানো বাক্স হইতে গহনাগুলি বাহির করিয়া ধীরে-ধীরে স্বামীর হস্তে দিল, এবং স্বামীর মুখচুম্বন করিয়া বলিল,—"এগুলি বড়ঠাকুরের পায়ে রাখিয়া দাও।"

সেই আত্মত্যাগ বড়বউয়ের হৃদয়ে ছুরিকার ন্যায় বিঁধিল। বড়বউ আসিয়া সরমাকে কোলে লইলেন, এবং না জানি কোন সনাতন স্বর্গীয় বিধানানুসারে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু বর্ষিত হইল।

পরদিন প্রত্যুষে উভয় ভ্রাতা গহনার পুঁটুলিটি লইয়া জ্ঞানদাবাবুর নিকট গিয়া গহনাগুলি বন্ধক রাখিয়া পাঁচ হাজার টাকা লইয়া আসিলেন, এবং পাওনাদারগণকে সন্তুষ্ট করিলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিষয় ভাগ হইল না। গুড়ের কারবারও বন্ধ হইল

না; বরং তিন বৎসরের মধ্যে উভয়ের দশ হাজার টাকা লাভ হইল। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পুঁটির বিবাহ জ্ঞানদাবাবুর পুত্রের সহিত ঘটা করিয়া হইয়া গেল। বিবাহসভায় জ্ঞানদাবাবু সরমাদেবীর গহনাগুলি অতি আদরে পুত্রবধূকে পরাইয়া দিলেন, এবং সকলকে বলিলেন,—"এ যাঁহার গহনা, আমার পুত্রবধূ যেন তাঁহারই মতো হয়।"

১৬শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩১২



ইন্দু

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

চারু ছেলেমানুষ। তাকে 'ধরে বেঁধে' তার স্বামীর ঘরে দিয়া আসিতে হয়। চারুর স্বামী মন্মথ, চারুকে কথা কহাইবার জন্য কত চেষ্টা করে, চারু কিন্তু কলাবউটির মতো এক হাত ঘোমটা টেনে, 'গুটিসুটি' হয়ে, বিছানার এক পাশে জড়ের মতো পড়ে থাকে! মন্মথ কত ডাকে, কত সাধে, কত অভিমান করে, কখনও রাগও করে, কিন্তু চারু ফিরে চায় না! কত হা হুতাশ, কত দীর্ঘশ্বাস, নিষ্ঠুর চারু তবু কথা কয় না! চারুর মা ও খুড়ি, দুই এক দিন 'আড়ি' পাতিয়া, জামাই বেচারার এই দুর্দশা দেখিলেন। চারুর এই ব্যবহারে জামাই পাছে, সত্যই বিরক্ত হন, মা ও খুড়ির এই এক আশঙ্কা জন্মিল; তাই চারুকে কোনরূপে 'জাগান' দিয়া, 'রাতারাতি' যুবতীভাবাপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের বিশেষ চেষ্টা পড়িয়া গেল! চারুকে তাঁরা কখনও বকিতেন, কখনও ভয়, কখনও বা লোভ দেখাইতেন, কিন্তু কেমন 'একগুয়ে' মেয়ে চারু, সে সব কথা সে কানেই তুলিত না! এজন্য চারুকে এক আধ দিন মার কাছে একটু বেশি রকম লাঞ্ছিতও হইতে হয়; কিন্তু তবু চারু বাগ মানিল না! কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া, মা ও খুড়ি, হারি মানিলেন। ইতিমধ্যে চারুর দিদি ইন্দু, শ্বশুরবাটী হইতে আসিল! ইন্দু আসিলে তার মা ও খুঁড়ি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন; ইন্দুকে বলিলেন, 'আমরা তো চারুকে 'এঁটে' উঠতে পাললেম না, এখন, বাছা, তুই যা পারিস কর! চারু তো তোর কথা শোনে, তুই কেন রাত্রে তাকে সঙ্গে করে মন্মথর ঘরে নিয়ে যাসনে?'' ইত্যাদি।

পিতা মানসিংহ কর্তৃক সেনাপতি পদে অভিষিক্ত জগৎসিংহ যেমন, উল্লাসে গর্বে, স্বীয় রণপাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট হইয়াছিল, ইন্দুও তেমনই এই ব্যাপারে কৃতিত্ব দেখাইতে, আপনার সমস্ত কৌশল, সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত করিল।

ইন্দু এখন প্রতিরাত্রে চারুকে মন্মথের ঘরে দিয়া আসে, নানারূপ কথাবার্তায় চারুর মুখ ফুটাইতে ও লজ্জা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে। মন্মথ এক দিন তাস খেলিবার কথা তুলিল; ইন্দু দেখিল, পরামর্শটা মন্দ নয়, এই উপায়ে, মন্মথর সহিত চারুর ভাবটা সহজে হইতে পারিবে; কেন না, সে জানিত, চারু খেলা তেমন জানুক না জানুক, খেলিতে কিন্তু তার ভারি উৎসাহ! তা হলে কি হয়, চারু তো সহজে মন্মথের সঙ্গে খেলিতে 'রাজি' হয় না। ''বরের সঙ্গে আবার খেলা, ছি! দিদির যেমন কাজ!'' কিন্তু দিদি যে কিছুতেই ছাড়ে না, একে দিদির বকুনি, তাতে মায়ের অপমানের ভয়, চারু কি মুশকিলেই পড়েছে গা! চারু মনে-মনে মা দুর্গা, কালী কত দেবতাকেই মানে, ''কবে ও তাদের বাড়ি থেকে যাবে'', কিন্তু কেমন নিষ্ঠুর দেবতা, তার মিনতি কেহ শুনে না। শেষ আর কি করে, দুই এক দিন দেখিয়া, চারু অগত্যা খেলিতে স্বীকৃত হইল, কিন্তু ঘোমটা কিছুতেই কমাইল না। দিদি চলিয়া গেলে, চারুর আর খেলা হইত না, কাজেই ইন্দুকে বসিয়া থাকিতে হইত। বাজি শেষ হওয়া পর্যন্ত সব দিন চারুর ধৈর্য থাকিত না। সে খেলিতে-খেলিতে প্রায়ই ঘুমাইয়া পড়িত। মন্মথের অনুরোধে, ইন্দু সে বাজিটা শেষ না করিয়া যাইতে পারিত না। রাত্রির এই বন্দোবস্তে কিন্তু ইন্দুর উদ্দেশ্য সফল হইল না, চারুর মুখ ফুটিল না। দিদি চলিয়া গেলেই আবার যে চারু সেই চারু! বিশেষত চারু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই সন্ধ্যা

হইতে না হইতে ঘুমাইয়া পড়িত। কাজেই দিনমানেও চারুকে মন্মথের ঘরে আনিবার বন্দোবস্ত করিতে হইল। চারু অনেক কান্নাকাটি, আপত্তি করিল, কিন্তু কে তার কথা শুনে বল! শেষ 'দুপুর বেলাতেও' চারুকে দিদির সঙ্গে ঘরে আসিতে হইত! বিন্তিখেলায়, মন্মথ ইচ্ছা করিয়া মাঝে-মাঝে খেলার নিয়ম ভাঙ্গিত; চারুর সেটা অসহ্য হইত, সে নিজে মুখ ফুটিয়া মন্মথকে কিছু বলিতে পারিত না বটে, কিন্তু দিদিকে তখনই কানে কানে বলিত, "ও কি? অমন কেন?" আবার, গোলাম-চোরে, মন্মথ প্রায়ই সাধ করিয়া "গোলাম-চোর" হইত! চারুর তাতে ভ'রি আনন্দ, ভারি উৎসাহ! সে সময় চারুর অজ্ঞাতে, তার ঘোমটা একটু সরিয়া যাইত, কোনওদিন হয়তো সেই মুহূর্তে মন্মথর সহিত, তার 'চোকোচোকী" হইয়া যাইত, মন্মথের চক্ষে হাসি ফুটিয়া উঠিত! সে হাসি যেন "হেরে গিয়ে হেসে চাওয়া।" চারু কিন্তু তাহাতে বড় অপ্রতিভ হইত। লজ্জায় মুখ নামাইত! অঙ্গুলিস্পর্শে লজ্জাবতী লতা যেমন 'গুটিসুটি" হইয়া যায়, চারু তেমনই জড়সড় হইয়া পড়িত, কোনওদিন বা পলাইয়া যাইত। বেশি পিড়াপিড়ি ভালো নয় বলিয়া, ইন্দুও তাহাতে আর আপত্তি করিত না! চারু চলিয়া আসিলেও, ইন্দু, মন্মথের সহিত গল্প করিত। তবে প্রায়ই ইন্দুর দুই-একজন "সমবয়সি" যা দুই একজন ঠাকরুণ দিদি, সে সময়ে আসিয়া জুটিতেন; নানা রকমের কথাবার্তা, হাসি তামাসা চলিত। মন্মথ বেশ মিষ্টি মিষ্টি মজার গল্প করিতে পারিত; সে গল্প শুনিতে ইন্দুর বড় ভালো লাগিত। ক্রমে মন্মথের সহিত তাসখেলা ও গল্প করা, ইন্দুর একটা নেশা হইয়া দাঁড়াইল! মন্মথ যদি আহারান্তে দৈবাৎ বাহিরে যাইত, ইন্দু অমনি মন্মথকে ডাকাইতে পাঠাইত। আসিতে বিলম্ব হইলে, অভিমান করিত। মন্মথ শীঘ্রই ইহা বুঝিল; বুঝিয়া কি জানি কেন, ইচ্ছা করিয়া মাঝে-মাঝে আসিতে বিলম্ব করিত। শেষ আবার সাধিয়া ঠাকুরঝির অভিমান ভাঙ্গাইত! কে জানে এ খেলা খেলিয়া কি লাভ! সরলা ইন্দু অত শত বুঝিত না, সে অকপটে মন্মথকে বিশ্বাস করিত; মন্মথ যেন তার "সমবয়সি"! এইরূপে, আমোদে আহ্লাদে, হাসি গল্পে দিন কাটিতে লাগিল। এইরূপে মন্মথের প্রতি ইন্দুর স্নেহ ও বন্ধুত্ব গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইল। ইন্দু চারুকে ধরিয়া দিবার জন্য জাল বিস্তার করিয়াছিল, এখন উর্ণনাভের মতো, সে জালে আপনিই জড়িত হইতে লাগিল।

॥ ২ ॥

"কলকাতা"
নং বেচু চাটুর্যের লেন।
২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১
'ইন্দু!—

"কয় দিন তোমার চিঠিপত্র পাইতেছি না কেন? ভালো আছ তো? বাড়ি হইতে প্রতাপপুর যাইবার পূর্বে লিখিয়াছিলে, 'সেখানে গিয়া খুব ঘন-ঘন পত্র দিব।' কিন্তু এ দুই সপ্তাহ মধ্যে, কেবলমাত্র একখানি চিঠি দিয়াছ, এরই নাম, 'যেবা রোগী ছিল বসে, বৈদ্যে শোয়ালে এসে!'

"তোমার পত্র পাইতে বিলম্ব হইলে যে কত অধীর হই, তা তো তুমি জানো! জানিয়াও যে ইচ্ছা করিয়া বিলম্ব করিবে, এ বিশ্বাস তো হয় না! তাই এত ভাবনা!

"শুনিলাম, জামাইষষ্ঠীতে মন্মথ ভায়া তোমাদের ওখানে আসিয়াছেন। চারুকে তো

কত দিন দেখি নাই! সে এখন কত বড়টি হয়েছে? মন্মথের সঙ্গে বেশ কথাবার্তা কয় তো?

"ইন্দু, চার বছর আগে, তুমিও যখন তোমার বোনটির মতো ছিলে, সে দিন মনে পড়ে কি? সে সব কথা মনে হলে বোধহয় এখন তুমি খুব লজ্জিত হও, কিন্তু আমার পক্ষে এখন সে স্মৃতি বড় মধুর! তাই বলে আবার তোমাকে পাকা গুটি কাঁচিয়ে বসতে বলিনে, কেন না, সে দিন আর ফিরবে না বলেই সে সব স্মৃতি এত মধুর মনে হয়। আবার তেমনি করে, তোমায় ভালোবাসার পাঠশালে হাতে খড়ি দিয়ে, অক্ষরপরিচয় করাতে হবে, সে আশঙ্কাটা যদি থাকত, তবে হযতো, তার নামেও চমকে উঠতাম! কিন্তু সে ভয় আর নেই, এখন তো তোমার 'গুরুমারা বিদ্যা!'

"তা সে কথা থাক! আজকাল বোধহয় তোমরা খুব আমোদে আছ! তা বেশ! কিন্তু দেখো, যেন নূতন আমোদ পেয়ে, পুরানোদের একেবাবে ভুলো না। শাস্ত্রের বিধিটা যেন মনে থাকে,—'সেবকান্ন পুরাতনঃ!'

"এখন, তামাসা থাক! সত্যই তোমার পত্রের জন্য পথ চেয়ে আছি! কেমন আছ? আমি অমনই বেঁচে আছি! এখন বিদায়। ইতি—

"তোমারই ভূপেন।"

চিঠিখানি যে ইন্দুর স্বামীর, তা আর আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের বলিতে হইবে না।

ইন্দু পত্রখানি পড়িয়া কি ভাবিতে-ভাবিতে উপরের ঘরে যাইতেছিল। চিঠিখানি তখনও হাতে। সেই সময় মন্মথও নিচে নামিতেছিল, সিঁড়ির ঘরে উভয়ের দেখা হইল। মন্মথ হাসিতে-হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কার চিঠি ঠাকুরঝি?" "কই কারু নয়" বলিয়া, একটু হাসিয়া, ইন্দু চিঠিখানি হাতের মুঠায় লুকাইল। মন্মথের প্রথমে যে সন্দেহটুকু ছিল, এখন তাহা দূর হইল। সে আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, "চিঠি দেখাবে বলেছিলে যে, দেখাও।" ইন্দু, "না না সে চিঠি নয়," বলিয়া পাশ কাটাইতেছিল, মন্মথ পথ আটকাইল, বলিল, "চিঠি দেখাও নইলে কিন্তু ছাড়ব না।" ইন্দু চিঠির খানিকটা বাহির করিয়া হাত দূরে রাখিয়া বলিল, "এই দেখ!" মন্মথ ক্ষিপ্র হস্তে চিঠিখানি লইতে গেল, ইন্দু সেই অবকাশে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু পারিল না, মন্মথ তাব হাত ধরিল। সহসা ইন্দুর হাসি তামাসা সব বন্ধ হইয়া গেল। সে প্রফুল্ল মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল, খুব বিরক্তি ও দৃঢ়তার সহিত ইন্দু বলিয়া ফেলিল, "ও কি মন্মথ, হাত ছাড়!" মন্মথ অপ্রতিভ হইয়া, তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মন্মথ, ইন্দুকে হাস্যময়ী চপলপ্রকৃতিই জানিত, বুঝি তাই এতটা সাহস করিয়াছিল; আজ, সেই চপলার ক্ষণিক প্রভাবে, সে একেবারে স্তম্ভিত হইল!

॥ ৩ ॥

মন্মথ যখন বাহিরের ঘরে একাকী থাকিত, তখন ছোট-ছোট বালক বালিকার দল বড় মজা পাইয়া যাইত। কেহ একটা বটের পাতায় কতকগুলি ধূলা, দুখানা খোলাম্ কুঁচি, হল বা গোটাকত তেলাকুচা আনিয়া বলিত, 'মন্মথ বাবু খাও।" কেহ বলিত, "টুমি নাকি চারু ডিডির নাম করেছ! ওহো! বউ-এর নাম করেছে, সব্বাইকে বলে ডেব।" কেহ

বা মন্মথর হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে বলিত," টোমায় চারু ডিডি ডাকচে।" মন্মথ ইহাদিগকে এক আধবার যে তাড়া তুড়ি না দিত, তা নয়; কিন্তু আসলে সে বিরক্ত হইত না। বরং মাঝে-মাঝে সেই ছেলেখেলায় যোগ দিত। মধুর রসের সম্বন্ধ না হইলে বুঝি এতটা মধুর ভাবের প্রবাহ বয় না।

এই সব বালক বালিকার পশ্চাতে, আর এক দল বালিকা থাকিত। তাহারা বাহিরে আসিবার পথে, সদর দরজা ভেজাইয়া, তাহার ফাঁকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উঁকি দিয়া সব দেখিত। আর মাঝে মাঝে হাতছানি দিয়া, সেই ছোট দলকে ডাকিয়া, নূতন-নূতন তামাসা শিখাইয়া দিত। মন্মথের সহিত চোখোচোখি হইলেই "ওলো দেখেছে লো" বলিয়া ঝমঝম রবে সেই বালিকার দল অন্দরের দিকে ছুটিয়া যাইত। আবার টিপি টিপি আসিত, হাসিত, পলাইত। ইহারা চারুর অনেকটা সমবয়সি। মন্মথ অন্য দিন এ সব বেশ উপভোগ করিত। আজ ইহারা অনেকক্ষণ ছুটাছুটি, লাফালাফি করিল, কিন্তু মন্মথ সে দিকে বড় মনোযোগ দিল না। তখন সেই 'গৃহ-হারা আনন্দের দল" যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল। মন্মথ অন্যমনস্কভাবে একখানি ইজিচেয়ারে শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ঘুম আসিল, না। মনটা বড় চঞ্চল। মুদ্রিতচক্ষু মন্মথ, কি একটা ভাবিতেছিল, এমন সময় শুনিল,—

"ঘুমুলে ঘুমুলে পান খেলে না,
পান সেজেছি এলাচ দানা;"

মন্মথ হাসিয়া চক্ষু মেলিল। দেখিল, সম্মুখে একটি কৃত্রিম পান হাতে দাঁড়াইয়া তাহার এক অষ্টমবর্ষীয়া শ্যালিকা। মন্মথ তাহাকে যেই হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল, সে অমনি পানটি মন্মথের গায়ে ছুড়িয়া হাসিতে-হাসিতে একদৌড়ে পলাইয়া গেল। এমন সময় কে ডাকিল, "জামাই বাবু! 'দিদিমণি' আপনাকে ডাকচে।" সে ডাক মধুর বীণাধ্বনির মতো মন্মথের কানে বাজিল। মন্মথ তখন কাঁচাপোকায় আকৃষ্ট আরসুলার মতো ঝির অনুসরণ করিল।

॥ ৪ ॥

মধ্যাহ্নের সেই ঘটনার পর মন্মথ বাহিরে চলিয়া গেলে ইন্দুও মনে মনে বড় অপ্রতিভ হইল। আজ সহসা কোথা হইতে তার এতটা দৃঢ়তা আসিল? সে নিজেই একটু বিস্মিত হইল। ভাবিল, কাজটা ভালো হয় নাই। ভগ্নীপতি হাত ধরেছিল, তা সেটা আর এমন দোষের কি হয়েছে। তখন আর কোনও কথা ইন্দুর হৃদয়ে ঠাঁই পাইল না, শুধু মনে হইল, তার এই ব্যবহারে না জানি মন্মথ কত কষ্টই পেয়েছে! ছি! ইন্দু অপ্রতিভ হইয়া আপন মনে জিভ কাটিল।

সে দিন বৈকালে অন্যদিনের চেয়ে 'সকাল সকাল' মন্মথের জলখাবারের ডাক পড়িল। অন্যদিন মন্মথের শাশুড়ি তাকে জলখাবার দেন, 'আজ ইন্দু জলখাবার দিতেছে। ইন্দু জলখাবার দিল বটে, কিন্তু মুখ তুলিয়া মন্মথের দিকে চাহিতে পারিল না। নতমুখে বলিল, "মন্মথ জল খাও।" মন্মথ প্রথম ভাবিয়াছিল, বুঝি আজ জলখাবারে কিছু ভেল আছে, কিন্তু মধ্যাহ্নের ঘটনায় সে সন্দেহ তার মনে স্থান পাইল না। সে ইন্দুর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল, তখনও ইন্দু অবনতমুখী। মন্মথ মুগ্ধনেত্রে দেখিল, সেই অপ্রতিভ মুখে আজ এক অপূর্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্মথ ব্যাপার বুঝিল, মনে-মনে হাসিয়া

ডাকিল, "ঠাকুরঝি!" ইন্দু মুখ তুলিল, চারি চক্ষে মিলিবামাত্র উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সেখানে আর কেহ নাই দেখিয়া, মন্মথ সপ্রতিভভাবে বলিল, "কই—চিঠি!" চিঠি ইন্দুর আঁচলে বাঁধা ছিল, একটু হাসিয়া চিঠিখানি খুলিয়া ইন্দুর মন্মথের হাতে দিল। মন্মথ পত্রখানা আগাগোড়া পড়িল, পড়িয়া ফিরাইয়া দিল। কিন্তু একটা তামাসার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না,—তামাসার মাত্রাটা কিছু বেশি চড়িল— "যাও ছি! অমন কললে কিন্তু আর আসব না", বলিয়া গমনোদ্যতা ইন্দু যেন ঈষৎ কোপ-কুটিল-কটাক্ষে মন্মথের দিকে চাহিল। সে অপাঙ্গে বুঝি একটু হাসিও খেলিয়াছিল।"— তখন "যাই" বলিয়া হাসিতে হাসিতে মন্মথও বাহিরে গেল।

মন্মথ কাল বাড়ি যাইবে, আজ রাত্রে তাই খেলার ধুমটা একটু বেশি। "অনেক রাত হয়েছে এখন যাই" বলিয়া ইন্দু একবার উঠিতে চাহিতেছিল, কিন্তু মন্মথ বাধা দিল; বলিল, "রাত আর কই হয়েছে, আর আজকের রাত বই তো নয়।" ইন্দু ভাবিল, তা বটে। সরলা বালিকা আবার খেলিতে বসিল। চারুর তখন অর্ধেক রাত্রি।

ঝম-ঝম-ঝম, বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। গুরু-গুরু দুরু-দুরু গভীর গর্জনে মেঘ গর্জিতেছে। সেই "ঘোনা ঘোরা বাদল" নিশীথে, ইন্দু আব মন্মথ খেলিতেছিল, গল্প করিতেছিল, হাসিতেছিল, আর ইন্দু মনে-মনে মন্মথের রসিকতার প্রশংসা করিতেছিল। রাত্রি গভীর, সংসার সুসুপ্ত, কেবল মন্মথ আর ইন্দু খেলায়, গল্পে, হাসিতে বিভোর। সেই বিভোর অবস্থায় খেলিতে খেলিতে কি একটা কারণে তাস লইয়া উভয়েব মতদ্বৈধ ঘটিল। ক্রমে তাস লইয়া টানাটানি, কাড়াকাড়ি, হাসাহাসি আরম্ভ হইল। সহসা গৃহমধ্যে প্রচণ্ডবেগে একটি 'দমকা' বাতাস প্রবেশ করিল। প্রদীপ নিবিয়া গেল। গৃহের সঙ্গে সঙ্গে একটি জীবনও অন্ধকার হইয়া গেল!

ধীরে, অতি ধীরে, ইন্দু, সে গৃহ ত্যাগ করিল। উদ্বেলিত কণ্ঠে মন্মথ ডাকিল, "ঠাকুরঝি!" ইন্দু ফিরিল না। বুঝি সে কথা তার কানে গেল না।

মন্মথ পরদিন অতি প্রত্যুষে বাড়ি চলিয়া গেল। চারু আবার হাসিয়া খেলিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। কয়েদী যেমন জেলখানা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মুক্ত বাতাসে আপনাকে স্বচ্ছন্দ মনে করে, সে তেমনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইন্দু কিন্তু বড় বিমর্ষ। এই বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া লেখাপড়া-জানা এক নবীনা ঠাক্‌রুণ দিদি, ইন্দুর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া সুর করিয়া বলিলেন,—

"সোনার নাতিনী, এমন যে কেনি
হইলি বাউরি পারা,
সদাই রোদন, বিরস বদন,
না বুঝি কেমন ধারা।"

ইন্দুর সমবয়স্কারাও বিদ্রূপ করিতে ছাড়িল না। কেহ বলিত, "নে ভাই ইন্দু, তোর আর বাড়াবাড়ি দেখে বাঁচিনে। ভগ্নীপতি তো সবারই আছে লো!" কেহ বা সুর আর একটু চড়াইল, "কি লো, মন্মথ গিয়ে তুই যে একেবারে ব'য়ে গেলি। লোকের বর বিদেশে গেলেও তো এমন হয় না।"

ইন্দুর মাও ক্রমে ইন্দুর এ পরিবর্তন লক্ষ করিলেন; বলিলেন, 'ইন্দু, তোর হল কি? দিন রাত অমন করে কি ভাবিস বলতো, দিনকে দিন যে শুকিয়ে উঠলি।"

ইন্দু কোনও উত্তর দিত না। শুধু নতমুখে, কাঁদ-কাঁদ হইয়া থাকিত। কোনও দিন বা অন্যের অলক্ষ্যে কাঁদিয়া ফেলিত।

আজ অনেক দিনের পর ভূপেন্দ্র ইন্দুর হস্তাক্ষর পাইলেন, সাগ্রহে তাড়াতাড়ি পত্র খুলিলেন—

"প্রিয়তম"!

"সত্যই এ পোড়ারমুখী তোমায় ভুলিয়াছিল, নহিলে এমন গুরুতর পাপ করিবে কেন! আমার এ অপরাধের ক্ষমা নাই! তোমাকে অনেক কথা লিখিব বলিয়া এ পত্র লিখিতে বসিয়াছিলাম কিন্তু তা আর পারিলাম না। আমার মন বড় খারাপ হইয়াছে, সকল কথা পরে লিখিব। কেমন আছ? ইতি

"পাপিষ্ঠা"

'ইন্দুবালা"

"একি এ? একি আমার ইন্দুর পত্র? হাঁ, ইন্দুর হস্তাক্ষরই তো বটে।" ভূপেন্দ্র একবার দুইবার-তিনবার কতবার পত্র পড়িলেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। ভূপেন্দ্রের মনে কত রকমের অনুমান উঠিতে লাগিল, শেষ পত্র বন্ধ করিয়া ভূপেন্দ্র ভাবিলেন, ছি আমি কি পাগল! কিন্তু—কিন্তু ইন্দু এমন কবিয়া পত্র লিখিল কেন? আবাব ওই কথা? শেষ ভূপেন্দ্র সিদ্ধান্ত করিলেন, আমোদে মত্ত হইয়া আমায় পত্র দিতে বিলম্ব করিয়াছে বলিয়া ইন্দু নিজেই বড় অপ্রতিভ হইয়াছে। তাই অনুতাপ করিয়া এমনতর লিখিয়াছে। এ সামান্য কথাটাও এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। আমি কি নির্বোধ! ভূপেন্দ্র ফেরত ডাকে উত্তর দিলেন—

"আমার ইন্দু!"

"পত্র দিতে বিলম্ব হইয়াছে, তা এত লজ্জা কি? আর এই সামান্য কারণে এমন অপরাধীর মতো পত্র দিয়াছ কেন? এ তো অতি তুচ্ছ কথা, যদি প্রকৃতই তুমি না বুঝিয়া কোনও গুরুতর অপরাধ করিয়া, এমনই করিয়া অনুতপ্ত হইয়া, আমায় জানাও, আমি তোমার সে প্রথম অপরাধও মার্জনা করিতে প্রস্তুত। যা হোক, এর জন্য এত অপ্রতিভ হবার কারণ নাই। তুমি যে আমায ভুলিতে পার না, তা আমি বেশ জানি। কিন্তু এমন করে পত্র দিতে আর দেরি করো না, লক্ষ্মী আমার।

"অন্য অন্য কথার উত্তর দাও নাই কেন?

"চারুদের কেমন ভাব হল জানিতে উৎসুক আমি। মন্মথ এখন কোথায়?

"কেমন আছ। আমি ছুটির চেষ্টায় আছি। ছুটি পেলেই তোমায় আনিতে যাব। আর যদি এর মধ্যে অন্য সুযোগ পাই, তবে ততদিনও অপেক্ষা করিতে হবে না। এ সুখবরের জন্য কি খেতে দেবে, দাও। ইতি।"

ইন্দু যথাসময়ে এ পত্রের উত্তর দিল—

"তুমি আমার অপরাধ যত সামান্য মনে করিতেছ, আসলে তা নয়। পাপিষ্ঠা আমি, তোমার নিকট অবিশ্বাসিনী হইয়াছি, আমায় লইয়া তুমি কি আর সুখী হইতে পারিবে। একদিন বিস্তারিত জানাইব। আজ থাক।"

পত্র পড়িয়া ভূপেন্দ্রের মাথা ঘুরিয়া গেল। মিছে কথা এ, ইন্দু পাপিষ্ঠা, ইন্দু অবিশ্বাসিনী, অসম্ভব এ। —ঘন-ঘন পত্র দিব বলিয়া এত বিলম্ব করিয়াছে, ইন্দুর কি

ছেলেমানুষি! কিন্তু তবু ভূপেন্দ্রের মনের মেঘ কাটিল না। কি এক অজ্ঞাত অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁর প্রাণ "আকুলি ব্যাকুলি" করিতেছিল।

ভূপেন্দ্র ছুটি লইয়া ইন্দুর কাছে যাওয়াই স্থির করিতেছিলেন, কিন্তু পর দিন তাঁর শ্বশুরের পত্রে জানিলেন, মন্মথ শ্বশুরবাটি হইয়া শীঘ্র কলিকাতায় পড়িতে আসিতেছে। এই সুযোগে ইন্দুকে আনা সহজ হইবে মনে করিয়া, ভূপেন্দ্র তখনই শ্বশুরকে পত্র লিখিলেন; উত্তরে শ্বশুরও দিন স্থির করিয়া জানাইলেন। স্থিরীকৃত দিনে যথাসময়ে ভূপেন্দ্র স্টেশনে উপস্থিত হইলেন। মন্মথও গাড়ি হইতে নামিল। ইন্দু কই? ভূপেন্দ্র অতিমাত্র আগ্রহে, মন্মথকে শুধাইলেন, "তোমার ঠাকুরঝি?" মন্মথ সংক্ষেপে বলিল, "তাঁর আসা হইল না।" "কেন?" —"ঠিক বলিতে পারি না।" "সব ভালো তো।" —"হাঁ।"

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে ভূপেন্দ্রের উদ্বেগ বাড়িল মাত্র। উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে বাসায় ফিরিলেন। বাসায় আসিয়া দেখেন, ইন্দুব একখানি চিঠি। ইন্দু শুধু লিখিযাছে, "প্রিয়তম! একবার এসো।" ভূপেন্দ্রের আসন টলিল, সাহেবকে বলিয়া কহিয়া কোনও রূপে পাঁচ দিনের ছুটি লইয়া সেই দিনই সন্ধ্যায় ট্রেনে, "নদী যথা ধায় সিন্ধু পানে", ভূপেন্দ্র ইন্দুর উদ্দেশে ছুটিলেন। পরদিন বেলা দশটাব পর ভূপেন্দ্র প্রতাপপুরে পৌঁছিলেন। যাহাকে দেখিবার জন্য ভূপেন্দ্র এত ব্যাকুল, সম্মুখে ওই যে সৌধ, ওই সৌধে ভূপেন্দ্রেব সেই প্রেমপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। তবে আজ সেই সুখের মন্দিরে প্রবেশ করিতে ভূপেন্দ্রের মন সহসা এত কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে কেন? দূব হইতে চারু কিরূপে ভূপেন্দ্রকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে অমনি "ভূপেনবাবু এসেছে গো!" বলিতে-বলিতে ছুটিয়া বাড়ির মধ্যে গেল। ইন্দুর সহিত চোখাচোখি হইয়া চারু এক মুখ হাসিয়া মাথা নাড়িতে-নাড়িতে শাসাইল "দিদি আজ।" বোধহয় চারুব তখন মনে হইতেছিল, "দিদি আমার এবার বড় জ্বালানই জ্বালিয়েছে, এখন আমিও তেমনি দাদ তুলব," তাই সংক্ষেপে এই শাসনবাক্য প্রয়োগ করিল। চারুর এই বালিকা-সুলভ কল্পনা বুঝিয়া সকলেই হাসিযা উঠিল, ভূপেন্দ্রের আগমন-সংবাদে ইন্দুব মুখও প্রফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু "দিদি আজ!" এই কথায় কি জানি সহসা কেন সে প্রফুল্ল মুখকমল নিমেষে শুকাইয়া উঠিল।

আজ বহু দিনের বিচ্ছেদের পর দম্পতির মিলন হইল। ইন্দুর সেই বিষাদমলিন মূর্তি দেখিয়া ভূপেন্দ্র ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইন্দু, এমন দেখচি কেন?" ইন্দুর কিছু বলিল না, স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু বিষাদের হাসি হাসিল। ছিন্ন মেঘের কোলে সৌদামিনী যেমন হাসে, অনেক দিনের পব ইন্দু আজ তেমনই হাসিল। কিন্তু তখনই আবার জলভরা মেঘের মতো গম্ভীর হইয়া উঠিল। ভূপেন্দ্র আগ্রহভরে ইন্দুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছিলেন, ইন্দু সরিয়া গেল; বলিল, "আমার ছুঁও না," ভূপেন্দ্র একটু হাসিয়া, ইন্দুকে কোলে টানিয়া লইলেন। তখন ইন্দুর হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল। ভূপেন্দ্র আবাব স্নেহ-কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ইন্দু এমন দেখচি কেন? অমন করে, অপরাধীর মতো চিঠি পত্রই বা লিখতে কেন? আর মন্মথের সঙ্গে যেতেই বা আপত্তি কললে কেন?" ভূপেন্দ্র দারুণ আগ্রহে, একবারেই তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ইন্দু আত্মহাবা হইয়া, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া, কাঁদিল। পদস্খলিত ভক্ত যেমন ইষ্টদেবের সম্মুখে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদে, পথ-হারা শিশু যেমন জননীর কোল পাইয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদে, ইন্দু তেমনি করিয়া কাঁদিল।

তার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া, স্বামীর বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ইন্দু সরিয়া দাঁড়াইল। দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"তবে শোনো।"

ইন্দুর সেই উন্মাদিনী মূর্তি দেখিয়া ভূপেন্দ্র মহাভীত হইয়াছিলেন, সমস্ত আলোচনা করিয়া, ইহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় কি এক অঘটন ঘটিয়াছে। "আর বলতে হবে না—ইন্দু আমি বুঝেছি," বলিয়া, ভূপেন্দ্র তাড়াতাড়ি আবার ইন্দুকে বুকে ধরিলেন!

"না, বুঝ নাই। বুঝিলে এ কালসাপিনীকে এমন আদর করিয়া বুকে লইতে না," বলিয়া ইন্দু আবার কাঁদিয়া ফেলিল;—"যা বুঝি নাই, তা আর বুঝে কাজ নাই ইন্দু! তুমি যে অপরাধই করে থাক, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম।" ইন্দু ভূপেন্দ্রের নিষেধ শুনিল না। তবু বলিল,—"না; শোন!" "না, ইন্দু না, শুনে আর কাজ নাই! এসো, অন্য কথা কই," বলিয়া ভূপেন্দ্র, ইন্দুর সেই রোদন-লোহিত, অশ্রুসিক্ত, অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি ধরিয়া বারবার চুম্বন করিলেন; তার পর, অতি যত্নে চোখের জল মুছাইয়া, ইন্দুকে আপনার পাশে বসাইলেন। অতি সাবধানে অন্য প্রসঙ্গ পাড়িলেন, ক্রমে ইন্দুও সে সকল প্রসঙ্গে যোগ দিতে আরম্ভ করিল, তাহার সেই মলিন মুখ আবার যেন প্রফুল্ল হইল, নির্বাণোন্মুখ দীপ আবার জ্বলিয়া উঠিল! ভূপেন্দ্র বুঝিলেন, তবে বুঝি বা এখনকার মেঘ কাটিয়া গেল! এমন সময় কে ডাকিল—'ইন্দু চুল বাঁধবে এসো!" "তবে যাই" বলিয়া ইন্দু উঠিল, ভূপেন্দ্রও উঠিয়া বিদায়-চুম্বন দিলেন; এবং ইন্দুও প্রতিচুম্বন করিল—সে চুম্বন বড় তপ্ত, বড় গাঢ়! কিন্তু সহসা কি মনে করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, তার পর স্বামীর পানে চাহিয়া, চাহিয়া ইন্দু চলিয়া গেল।

ভূপেন্দ্র বাহিরে যাইতেছিলেন, সিঁড়ির ঘরে একটু দাঁড়াইয়া শুনিলেন, পাশের ঘরে চেনা গলায় কে বলিতেছে, 'ইন্দু, আয় লো, তোর মাথা বেঁধে দি;" ইহার পরের চরণ ভূপেন্দ্রের জানা ছিল, ভূপেন্দ্র একটু হাসিয়া, বাহিরে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে পথে, তাঁহার অঙ্গুলিস্থিত হীরকাঙ্গুরীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল—এই যে হীরক, ইহা খাঁটি না নকল? ভাঙ্গিয়া দেখিলে হয় না? নকল হয় হোক, ভাঙ্গিয়া কি লাভ? আমি তো জানি ইহা খাঁটি। তবে সে ভুল ভাঙ্গিয়া কাজ কি? ভূপেন্দ্র এই ভাবিয়া আবার আপনার মন দৃঢ় করিলেন।

আর, ইন্দু? ইন্দু চুল বাঁধিতে বাঁধিতে বড় অন্যমনস্ক হইতেছে। সেই নবীনা ঠাকুরুণদিদি, চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে অনেক রঙ্গ করিতেছিলেন—কিন্তু ইন্দু আজ সে হাসি তামাসায় যোগ দিতে পারিতেছে না! ইন্দু যেন কি এক গভীর চিন্তার মগ্ন! চুল বাঁধা শেষ হইলেন, ঠাকরুণদিদি,—

"সাদা মনে কালো ফিতের বেঁধে দিলাম চুল,
স্বামীর পায়ে মনটি রেখো, হয় না যেন ভুল।"

বলিয়া বেশ করিয়া মুখখানি মুছাইয়া দিয়া, একটি "টিপ" পরাইয়া, ইন্দুর মুখে চুমো খাইলেন! ইন্দু বিষাদের হাসি হাসিল। ঠাকরুণ দিদি বুঝিয়া গেলেন,—

"মুখের হাসি চাপলে কি হয়—
প্রাণের হাসি চোখে খেলে!"

সেই দিন সন্ধ্যার পর চারু তার ঘরে গিয়া দেখে—সর্বনাশ। দেখিয়াই সে চিৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো! তোমরা শিগগির এসো গো, দিদি কেমন কচ্চে!" চিৎকার শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিলেন, দেখিলেন, ছিন্নকণ্ঠ পক্ষিণীর মতো ইন্দু ভূমিশয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায়

ছটফট করিতেছে। ইন্দু কখন যে তার ঠাকুরমার কৌটা হইতে আফিং চুরি করিয়া খাইয়াছে, তাহা কেহ জানে না। "ওমা আমার কি হলো গো!" বলিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে মা ইন্দুর মাথা কোলে তুলিয়া লইলেন। তখন ডাক্তার ডাকিতে লোক ছুটিল। ইন্দু একবার কাতর দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া চোখের জল ফেলিল। তারপর চারুকে লক্ষ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "একবার ডাক চারু, একবার ডাক!"

ধীরে-ধীরে ভূপেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। সকলে উঠিয়া গেল! উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভূপেন্দ্র বলিলেন, "ইন্দু, ইন্দু এ কি?" "বলি" বলিয়া ইন্দু একখানি চিঠি ভূপেন্দ্রের হাতে দিল, তার পর ভূপেন্দ্রের পায়ে মাথা রাখিয়া, কাতরকণ্ঠে বলিল, "আমার বুকে দিন রাত নরকের আগুন জ্বলছে, এ পাপের বোঝা আমি আর বহিতে পারি নে,—তুমি আমায় ক্ষমা করে চরণে ঠাঁই দিলে, কিন্তু আমার জ্বালা নিভিল কই? আর বলিতে পারি না, চিঠিতে সব রইল, আমার দশা যেন সবাই শোনে।"

মনের আবেগে, বহু কষ্টে, ইন্দু এই কয়টি কথা বলিল; তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, বলি-বলি করিয়াও আর কিছু বলিতে পারিল না। ইন্দু তখন নির্বাক হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বৃন্তভ্রষ্ট ফুল্ল কুসুম যেন কর্দমস্পৃষ্ট হইয়া আকাশের পানে চাহিয়া-চাহিয়া শুকাইয়া যায়, ধরণীলুণ্ঠিতা ইন্দুও তেমনই কাতর দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া প্রতিমুহূর্তে শুকাইয়া উঠিতেছিল।

ক্রমে মৃত্যুযন্ত্রণায় ইন্দুর চক্ষু মুদিয়া আসিল। উদ্দামহৃদয়ে আকুলকণ্ঠে ভূপেন্দ্র ডাকিল, "ইন্দু!" বাণবিদ্ধ হরিণী যেমন জীবনের শেষ মুহূর্তেও বংশীরবে শিহরিয়া উঠে, স্বামীর কণ্ঠস্বরে ইন্দু তেমনই শিহরিল! তার পর ধীরে-ধীরে সেই বিবেকবিক্ষত, অনুতপ্ত প্রাণ দেহবিমুক্ত হইল!

৬ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, কার্তিক ১৩০২



আগন্তুক

যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

পিতৃমাতৃহীন ললিতমোহন কলিকাতায় মাতুলালয়ে থাকিয়া কোনও কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমন সময় হরিপুরের কন্যাদায়গ্রস্ত রামতারণ চক্রবর্তী মহাশয় অনেক সাধ্যসাধনাব পর, ললিতমোহনের মাতুলের সম্মতিক্রমে ললিতের কণ্ঠে স্বীয় দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা কমলিনীকে দোদুলামানা করিয়া নিজের ইহ ও পরলোকের পথ নিষ্কণ্টক ও জামাতার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ কণ্ঠকাকীর্ণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। বিবাহের অল্প দিন পরেই ললিতমোহন বি. এ. পাশ করিয়া সরস্বতীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীর সেবা করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার বিলাত গিয়া সিভিল সার্বিস পরীক্ষা দেওয়া অথবা ব্যারিস্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের আশা নবপরিণীতা বধূর সামান্য দুই একটা সুখস্বচ্ছন্দতার নিকট নিতান্ত লঘু হইয়া পড়িল। অবশেষে ললিতমোহন আশি টাকা বেতনে পঞ্জাব প্রদেশে একটি গভর্মেন্টের চাকুরি পাইয়া মাতুল মাতুলানীর চরণে প্রণামপূর্বক পশ্চিম যাত্রা করিলেন। পত্রদ্বারা শ্বশুর মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সহধর্মিণীকে নিজের পৈত্রিক গৃহে লইয়া যাইবেন, এমন কথারও উল্লেখ থাকিল।

কিন্তু মানুষে গড়ে, আর দেবতায় ভাঙ্গে। অল্প দিনে প্রত্যাবর্ত্তন করা দূরে থাক, বৎসরের পর বৎসর করিয়া ক্রমে পাঁচটি বৎসর অতীত হইল, ললিতমোহনের দেশে আর আসা হইল না। এই পাঁচ বৎসরে তাঁহার ৮০ টাকা বেতন ২৫০ টাকায় পরিণত হইল। তাঁহার ঈষৎগুম্ফের রেখা বেশ সুন্দর সংযত গুম্ফে পরিণত হইল। তাঁহার বিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশে উপনীত হইল, কিন্তু তাঁহার দেশে আর আসা হইল না। কলিকাতা কলেজের সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ কুঞ্চিতকেশ ঈষৎ শীর্ণ বালক ললিতমোহন এক্ষণে মাংসল, বিস্তৃতবক্ষ সুন্দব যুবাপুরুষে পরিণত হইয়াছেন, কিন্তু দেশের কেহ তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দেখিতে পায় নাই। এই পাঁচ বৎসরেব মধ্যে একবার তাঁহার শ্বশুর তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে পশ্চিমে আসিয়া জামাতার বাসায় প্রায় ১৫ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহাও প্রায় তিন বৎসরের কথা। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে ললিত ২/৩ বার অবকাশ লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখনই তিনি অবকাশ লইবার ইচ্ছা করিতেন, তখনই হয় তাঁহার বেতনবৃদ্ধি কি পদোন্নতি, যাহা হউক, এই প্রকার একটা শুভ ঘটনা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা হইত, সুতরাং তাঁহার অবকাশ লওয়া আর ঘটিয়া উঠিত না। এ দিকে তাঁহার মাতুল মহাশয় ভাগিনেয়কে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেও যথার্থ সুবুদ্ধি বিষয়ী লোকের ন্যায় ললিতকে উপদেশ দিতেন, অনাবশ্যক অবকাশ লইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ কোনও ক্রমে বিপদসঙ্কুল করা উচিত নহে। এই পাঁচ বৎসরে কমলিনীর সহিত তাঁহার অনেক আলাপ-পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু সে ডাকঘরের মধ্যস্থতায়। প্রতি সপ্তাহেই ললিতমোহনের নিকট তাঁহারই স্ব-হস্তলিখিত শিরোনামে একখানি করিয়া পত্র আসিত। তাহার মধ্যে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে কত মান অভিমান, কত বিরহ বেদন, কত সরল প্রণয়ের উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইত, তাহা ললিতমোহনই জানিতেন। আবার প্রতি সপ্তাহে যখন গ্রাম্য ডাকপিয়ন সুন্দর বাঙ্গালা অক্ষরে "পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামতারণ

চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু" এবং খামের এক কোণে ইংরাজি অক্ষরে "K. D." চিহ্নিত পত্র লইয়া চক্রবর্তী মহাশয়ের দ্বারে সমাগত হইত, তখন কমলিনী দেবীর নাড়ি পরীক্ষা করিলে স্বয়ং ধন্বন্তরিকেও বলিতে হইত যে, কমলিনীর বড় জ্বর হইয়াছে। তাঁহার ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইত, তাহা তিনিই বুঝিতে পারিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রামে সপ্তাহে একদিনমাত্র ডাকপিয়ন আসিত, সুতরাং প্রত্যহ এই বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া হইবার অবসর হইত না। সেই ফুল-শয্যায় একদিন ভিন্ন স্ত্রী পুরুষে আর কখনও চাক্ষুষ সন্দর্শন হয় নাই।

॥ ২ ॥

একদিন পৌষমাসের মধ্যাহ্নে একটি পরম সুন্দর বলিষ্ঠ যুবা হরিপুরের প্রান্তর অতিক্রম করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে এক জন বাহক একটা বড় পোর্টম্যান্টো মস্তকে করিয়া চলিয়াছে। রেল-স্টেশন হইতে হরিপুর প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ। বাহক গুরুভার মস্তকে বহন করিয়া এই পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করাতে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সমভিব্যাহারী যুবা এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়াও কিছুমাত্র ক্লিষ্ট হয়েন নাই। কেবলমাত্র প্রান্তরের উন্মুক্ত বাতাসে ও গ্রাম্যপথের ধূলায় তাঁহার নিবিড় কুঞ্চিত কেশকলাপ অসংযত ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামে প্রবেশ করিয়াই যুবা এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামতারণ চক্রবর্তী মহাশয়ের বাটী কোথা?" সে ব্যক্তি অতি স-সম্ভ্রমে করযোড়ে বলিল, "পশ্চিম পাড়ায় আজ্ঞে।"

আগন্তুক বিনা বাক্যব্যয়ে পশ্চিমপাড়ায় উক্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং একটি কৃষকবালকের নিকট চক্রবর্তীর বাটী জানিয়া লইয়া সদরবাটীর প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন।

প্রাঙ্গণটি বেশ পরিষ্কৃত, গোময়লিপ্ত। প্রাঙ্গণের উত্তর পার্শ্বে চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডীমণ্ডপের পূর্ব দিকে অন্দরমহল। যখন আগন্তুক চক্রবর্তী মহাশয়ের বাটীতে প্রবেশ করিলেন, তখন দেখিলেন, সপ্তদশবর্ষীয়া একটি অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী প্রাঙ্গণের পার্শ্বস্থ প্রাচীরে "ঘুঁটে" দিতেছেন। যুবতীর লাল পাড় শাড়ির অঞ্চল তাঁহার মস্তকের পশ্চাৎভাগ দিয়া আসিয়া কটিদেশে জড়িত হইয়াছে? উভয় হস্ত গোময়লিপ্ত হওয়াতে আগন্তুককে দেখিয়াও বস্ত্র সংবৃত করিতে পারিলেন না। অপরিচিত আগন্তুক তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্র যুবতী ব্রীড়াবনতবদনে অন্তঃপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পর মুহূর্তে যুবা শুনিলেন, অন্তঃপুরে এক জন বামাকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, তোর গোবর দেওয়া হল?"

অন্য রমণী উত্তর করিলেন, "বাইরে কে এক জন বাবু এসেছেন।"

আগন্তুক শুনিলেন যে, যুবতীর নাম "কমল"। নাম শুনিয়াই আগন্তুকের মুখ যেন একটু লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি পর মুহূর্তেই আত্মসংবরণ করিয়া বাহকের নিকট হইতে পোর্টম্যান্টো লইয়া চণ্ডীমণ্ডপের এক পার্শ্বে রক্ষা করিলেন, এবং বাহককে হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন করিতে বলিলেন। স্বয়ং চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বিস্তৃত মাদুরের উপর উপবেশন করিলেন। বেলা প্রায় এগারোটা; প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে এক খণ্ড কাষ্ঠে ধান্য আছড়ান হইতেছিল। কাষ্ঠের নিকট ধান্যের স্তূপ, একপার্শ্বে একটি অসম্পূর্ণ মরাই, অন্য দিকে বিচালীর গাদা। আগন্তুক উপবেশনপূর্বক নীরবে ধান্যস্তূপের দিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময় বাটীর

মধ্য হইতে একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ি কোথায় গা?"

আগন্তুক সচকিতে তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমার বাড়ি? — কাটোয়ার কাছে; কর্তা কোথায় গা?"

"ঠাকুর মশাই ও গাঁয়ে তাগাদায় গেছেন।"

"কখন আসবেন?"

"এবেলা কি আর আসতে পারবেন? আসতে সেই বৈকাল বেলা।"

"কর্তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করিতেই হইবে; কি করব, আজ আমাকে থেকে যেতে হবে।"

"তা বস।"

প্রৌঢ়া অন্তঃপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলে আগন্তুক আবার নীরবে অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া অবশেষে আপন মনে একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "সেই ভালো।"

এমন সময় তাঁহার বাহক হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্বক প্রাঙ্গণে আসিয়া যে কৃষক ধান আছড়াইতেছিল, তাহার অনতিদূরে এক আঁটি বিচালীর উপর উপবেশনপূর্বক তামাকুর চেষ্টায় মনোনিবেশ করিল।

কৃষক মুহূর্তের জন্য নিজ কর্ম হইতে বিরত হইয়া একটি কলিকা বাহির করিয়া তাহাতে গৃহপ্রস্তুত তামাকু দিয়া অন্তঃপুরে অগ্নির সন্ধানে প্রস্থান করিল। শীতকালে বেলা এগারোটার সময় পল্লীগ্রামে অনেক বাড়িতেই অগ্নিদেব আবির্ভূত হন না, কিন্তু চক্রবর্তী মহাশয়ের অন্তঃপুর হইতে ধূম-চিহ্ন দেখিয়া ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কৃষক অগ্নির আবির্ভাব কল্পনা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

আগন্তুক বাহককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ি কোথা?"

"এখান হতে তিন কোশ উত্তুরে।"

"তা হলে এবেলা এইখানেই আহারাদি করো"—

"আজ্ঞে আমার বড় বেটার এই পাশের গাঁয়ে বিয়ে হয়েছে। অনেক দিন এ বাগে আসিনি—আজ যদি এলুম তবে একবার বেই বাড়ি হয়ে ঘর যাব।"

"তবে আহারাদি কি সেখানে করবে? এই রৌদ্রে এলে, আবার রৌদ্রে যেতে বড় কষ্ট হবে।"

"গরিবের আবার কষ্ট। আর সে গাঁ এখানকার খুব কাছে, মাঠে আসতে সেই যে অশদগাছটা বাঁহাতি দেখা যাচ্ছেলেন, সেই যার তলায় তুমি ধুলো ঝেড়ে নিলেন, সেই গাছটা হতে এক রশি পথ হবেন। এখেনে চাট্টি জলপান নিয়ে সেখানে যাব।"

এমন সময় সেই কৃষক অন্তঃপুর হইতে তামাকু সাজিয়া আনিয়া আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি তামাক খাওগা?"

আগন্তুক অসম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন করিলে বাহক ও কৃষক উভয়ে একত্র বসিয়া ধূমপানে নিযুক্ত হইল, এবং এ বৎসর কি প্রকার ফসল হইয়াছে, চক্রবর্তী মহাশয়ের কয় বিঘা আবাদ আছে, পুব্বু মাঠে বড় জমিটা কার, কয়খানা লাঙ্গল আছে, ইত্যাদি গ্রাম্য বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইল।

আগন্তুক বাহককে তাহার প্রাপ্য ও কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়া বলিলেন, "যদি ও

গাঁয়ে যাবে, তা হলে আর এখানে বিলম্ব করিবার আবশ্যক কি? বাটীর ভিতর হইতে জলপান চাহিয়া লইয়া তোমার বেহাইবাড়ি যাও।"

ইত্যবসরে "তারার মা," সেই প্রৌঢ়া চক্রবর্তী মহাশয়ের বাটীর পরিচারিকা বাহিরে আসিলে আগন্তুক তাহার দ্বারা মুড়ি ও একটু গুড় আনাইয়া বাহককে প্রদান করিলেন; বাহকও মুড়ি খাইতে-খাইতে প্রস্থান করিল।

॥ ৩ ॥

"কমল, বেলা হল, খা'না এই বেলা, নেয়ে আয় না মা, মিছামিছি বেলা করিস কেন? বাড়িতে কুটুম এসে বসে আছে, যা মা যা!"

"যাই মা!"

অন্তঃপুরে মাতা-পুত্রীর উক্তরূপ কথাবার্তা শুনিয়া আগন্তুক অবিলম্বে পোর্টম্যান্টো হইতে নিজের গামছাখানি বাহির করিয়া প্রাঙ্গণস্থ কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুখ হাত ধুইব, পুষ্করিণী কোন দিকে?"

কৃষক কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া তিনি পথে বাহির হইয়া দেখিতে পাইলেন, পূর্বোক্তা কমলিনী পিত্তল-কলসি কক্ষে অন্তঃপুর-দ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুষ্করিণীর অভিমুখে গমন করিতেছেন। যুবা নিঃশব্দে অথচ বেশ শান্তভাবে দূরে থাকিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। পল্লীগ্রামের পথে এ সময় বড় একটা লোকজন থাকে না। একে ধান্যচ্ছেদনের সময়, তাহাতে বেলা প্রায় এগারোটা। পুরুষমানুষেমাত্রই নিজ-নিজ ক্ষেত্রে অথবা খামারে ব্যস্ত। স্ত্রীলোক পথে দুই-চারি জন থাকিলেও কেহ অপরিচিত রূপবান যুবাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল না। কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেও বোধহয় আগন্তুক তাহার উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পথে যাইতে-যাইতে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষশাখা ভগ্ন করিয়া দন্তধাবন করিতে লাগিলেন।

যে প্রদেশে চক্রবর্তী মহাশয়ের বাস, তথাকার প্রথা এই যে, স্ত্রীলোকেরা স্নান করিতে যাইবার সময় গৃহে তৈলমর্দন না করিয়া পুষ্করিণীতীরে গিয়া তৈলমর্দন করে। বিশেষত আজকাল সে প্রথা অনেক স্থানে তিরোহিত হইলেও আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে উক্ত প্রথা বিশেষ প্রবল ছিল। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, আমাদের নায়ক পাঁচ বৎসরে আশি টাকা হইতে আড়াই শত টাকায় যখন উপনীত হইয়াছেন, তখন সে সময় আজকালকার অনেক পূর্বে। কমলও প্রথানুসারে তৈলপাত্র হস্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইয়া যুবতী তৈলপাত্র, কলসি ও গাত্রমার্জনী রক্ষা করিয়া, নিকটস্থ এক গৃহস্থের বাটীতে, বোধহয় সমবয়স্কার অনুসন্ধানে, প্রবেশ করিলেন। বোধহয় যুবতী দেখিয়া থাকিবেন যে, ঘাটে কেহ নাই, একাকী নীরবে স্নান পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকদিগের কোষ্ঠীতে বড় লেখে না, সুতরাং কমল যে সঙ্গিনীর চেষ্টায় নিকটস্থ গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন, তাহাও বিচিত্র নহে। কমলিনীর এই তৈলপাত্র-রক্ষা ও নিকটস্থ গৃহে গমন দেখিয়া আগন্তুক আপন মনে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ভালো!"

যুবতী চক্ষুর অন্তরাল হইবামাত্র যুবা শশব্যস্তে আসিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে সেই তৈলাধার হইতে তৈল লইয়া স্বয়ং নিজ গাত্রে মর্দন করিতেছেন, এমন সময় কমলিনী সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখেন,—সর্বনাশ!

কমলের মুখে আর কথা সরিল না। তাঁহার সখী তাঁহাকে বিস্ময়চকিতা দেখিয়া প্রথমে কিছু বুঝিতে পারেন নাই, পরে অদূরে পরমরূপবান যুবাকে দেখিয়া নিজেও একটু চকিত হইয়া কমলকে বলিলেন, "ও কে ভাই?"

আর "কে ভাই!" কমল নির্বাক! অপরিচিত যুবা কোন সাহসে অপরিচিতা কামিনীর আনীত তৈল নিজ শরীরে মর্দন করিতেছেন, তাহা তিনি ভাবিয়াই পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থা হইয়া সঙ্গিনীকে বলিলেন, "কি জানি ভাই! আজ আমাদের বাড়িতে এসেছে, বাবার কাছে কি দরকার আছে; কিন্তু আমি ওর আক্কেল দেখে ভাই অবাক হয়েছি! আমি তেল মাখবার জন্য তেল আনলেম, আর ও আমার বাটি থেকে দিব্যি বসে-বসে তেল নিয়ে মাখছে!" কথাটা বাস্তবিকই অন্যায়। এ প্রকার অন্যায় কোনও ভদ্রলোক করিতে সাহস করেন না, এবং কোনও রমণীও এ প্রকার অন্যায় ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহেন। আগন্তুকের এই উৎকট বেয়াদবি যে সখীদ্বয়ের পক্ষে নিতান্তই বিসদৃশ বোধ হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। কমলের সঙ্গিনী কিছু মুখরা, কিন্তু বুদ্ধিমতী। সে যুবার এই অপরাধ কোনক্রমেই ক্ষমাযোগ্য বলিয়া মনে করিল না; কাজে কাজেই তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বেশ দুই কথা আরম্ভ করিল। "অসভ্য," "চোয়াড়," "বেহায়া," এবং শেষে আগন্তুকেব সুন্দর মুখমণ্ডলের প্রতি কিছুমাত্র দয়ামায়াপ্রকাশের চিহ্নপ্রদর্শন না করিয়া বরং সেই সুন্দব মুখমণ্ডলের প্রতি অগ্নিদেবের মনঃসংসযোগের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া স্বয়ং ধীরে-ধীরে আসিয়া কমলের কলস ও গামোছা লইয়া সখীকে বলিল, "আয় ভাই! আমাদের খিড়কিতে যাই।"

তৈলপাত্র সেইখানে পড়িয়া রহিল। আগন্তুক নীরবে সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন, কোনও প্রতিবাদ করিলেন না, অথচ ক্ষমাভিক্ষারও কোনও আয়োজন করিলেন না দেখিয়া, কমল সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন।

কমল প্রস্থান করিলে যুবা আর কালবিলম্ব না করিয়া স্নান আহ্নিক সমাপ্ত করিলেন, এবং তৈলপাত্র ধৌত করিয়া লইয়া চক্রবর্তীর গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন; চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া এক ধারে তৈলপাত্র রক্ষা করিলেন, ও সিক্ত বস্ত্র নিপীড়ন করিয়া পদপ্রক্ষালন পূর্বক সিক্ত বস্ত্র বাতাসে ছড়াইয়া দিলেন, এবং পোর্টম্যান্টো হইতে একখানি তোয়ালে আরশি ও চিরুণী লইয়া কুঞ্চিত কেশপাশ সংযত করিলেন। তার পর বেশ লক্ষ্মী ছেলেটি হইয়া একখানা সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন।

॥ ৪ ॥

প্রায় দশ মিনিট পরে হঠাৎ শুনিলেন, অন্তঃপুরে গৃহিণী একট রুক্ষস্বরে বলিলেন, "তুই গেছিস তো আজ নয়। নাওয়া কি আর শেষ হয় না?"

আগন্তুক বুঝিলেন, এইবার কমল নিজের নির্দোষতা প্রমাণ করিবার জন্য এবং তৈলপাত্রের তিরোধানের ব্যাখ্যার জন্য নিশ্চয়ই তাঁহার নাম করিবেন। তাহা হইলে যাহা হয় একটা কিছু হইবে। কিন্তু আগন্তুক বেশ নিশ্চিন্তভাব দেখাইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার আকৃতিতে অপরাধজনিত কোনও প্রকার চাঞ্চল্য-লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

আগন্তুক শুনিলেন, কমলিনী অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিলেন,—

"মা চুপ করো, চেঁচিও না। আমাদের বাড়িতে যে লোকটা এসেছে, ও মিন্সে ভালো মানুষ নয়। আমার পিছনে পিছনে কখন ঘাটে গেছে আমি কি জানি? আমি ঘাটে

তেল রেখে সইকে ডাকতে গেছি, আর এসে দেখি, আমার তেলের বাটি থেকে তেল নিয়ে বসে বসে দিব্যি মাখছে। আমার তো রাগে সর্বাঙ্গ জ্বালা করতে লাগল। সই পোড়ারমুখো মিন্সেকে বেশ দু কথা শুনিয়ে দিয়েছে।"

গৃহিণী কন্যার কথায় অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। যুবতী কন্যাকে অপমান করিলে কোন গৃহিণী অগ্নিশর্মা না হইয়া থাকেন? গৃহিণী সরোষে বলিলেন, "ছোঁড়া ভালো মানুষ হলে কি আর কর্তা বাড়িতে নেই শুনেও বসে থাকে? আমি আড়াল থেকে দেখেছি ছোঁড়ার চোক যেন নাটাই ঘুরছে। তিনি আসুন, ওর সাদা কাপড় আর বাঁকা টেরি কেটে ভদ্র-আনা বার করব। যা হক মা তুই আর বাড়ির বার হসনে। তারিণীর মা এলে ছোঁড়াকে ওর পিণ্ডি গেলবার ঠাঁই করে দেবে এখন।"

বলা বাহুল্য যে, গৃহিণী ক্রোধে এতই আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, আতিথ্যসংকারের পবিত্র নিয়মগুলি তাঁহার হৃদয় হইতে অপসৃত হইয়াছিল। অদূরে সদর-বাড়িতে অপরিচিত পুরুষ উপবিষ্ট, এবং সেই অপরিচিতকে উদ্দেশ করিয়া যে সকল অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করা হইতেছে, সেগুলি ভদ্রমহিলার ঠিক উপযুক্ত নহে, এবং সেই কথাগুলি অপরিচিতের শ্রবণপথে পড়িবার অত্যন্ত সম্ভাবনা, ইহা তিনি একেবারে বিস্মৃত হইলেন। দিবা দ্বিপ্রহরে অভুক্ত ব্রাহ্মণ অতিথিকে অনাহারে প্রত্যাখ্যান করা মহা পাপ, বোধহয়, এই মহাবাক্য তাঁহার হৃদয়ে অতি ক্ষীণভাবে বিদ্যমান ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার বাড়ির কৃষককে দিয়া যুবাকে বহিষ্কৃত করেন নাই। আগন্তুক মাতা-পুত্রীর সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের কথা যখন উচ্চ সপ্তক হইতে নিম্ন সপ্তকে অবরোহণ করিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারমাত্রাবশেষ অগ্নির ন্যায় 'গণ-গণ' করিতে লাগিল, এবং কন্যার গৌরবরক্ষণে সচেষ্ট মাতৃহৃদয় আপনা-আপনি গুমিয়া-গুমিয়া পুড়িতে লাগিল, তখন আগন্তুক আপন মনে সহাস্যে আবার বলিলেন, "হল ভালো!"

অনেকক্ষণ পরে সেই প্রৌঢ়া দাসী তারিণীর মা একটা ঘটিতে পানীয় জল ও একটা বাটিতে কিছু মুড়ি ও একটু গুড় আগন্তুকের নিকট রাখিয়া গেল। তারিণীর মার ভাব দেখিয়া যুবা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, যে উত্তাপে গৃহিণী মনে-মনে দগ্ধ হইতেছিলেন, সেই উত্তাপে তারিণীর মাও তাঁহার উপর হাড়ে চটিয়াছে। সে নিতান্ত হতশ্রদ্ধা করিয়া খাদ্যসামগ্রী তাঁহার নিকট রাখিয়া চলিয়া গেল। তিনিও অম্লানবদনে সেগুলির সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। জলযোগ শেষ করিয়া তিনি আবার সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

বেলা দুইটার সময় তারিণীর মা চণ্ডীমণ্ডপের এক পার্শ্বে একখানা অনতিপ্রশস্ত পিঁড়া ও এক ঘটি জল ও একখানা পদ্মপত্র রক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং গৃহিণী, কেন না বাটীতে আর তেমন পুরুষ মানুষ নাই, আবক্ষ অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া পত্রে অন্ন প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন। আগন্তুক একবার অন্নদাত্রীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আবার সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিলেন। ব্যঞ্জনাদির পরিবেশন শেষ হইলে তারিণীর মা বলিল, "ভাত দেওয়া হয়েছে গো।"

আগন্তুক বিনা আড়ম্বরে গিয়া ভোজনে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার উপস্থিতিতে অথবা তাঁহার অন্যায় ব্যবহারে কেহই সন্তুষ্ট নহেন। তিনি আহার শেষ করিয়া স্বয়ংই উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া

তারিণীর মা অগত্যা বলিল, "থাক না গো, সকড়ি আমি নেবো এখন; বামুনের ছেলে কি আর সকড়ি পরিষ্কার করে?"

যুবা আচমন করিলে তারিণীর মা উচ্ছিষ্ট লইয়া চলিয়া গেল ও কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া তাঁহার নিকট একটা তাম্বুল রাখিয়া গেল। তিনি তাম্বুলগ্রহণপূর্ব্বক সেই অনাবৃত মাদুরে শয়ন করিয়া আবার কাগজ দেখিতে লাগিলেন। বোধহয়, যুবার দিবা-নিদ্রা অভ্যাস নাই।

হরিপুরের পশ্চিমপাড়ার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ই একটু লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ; কারণ, তাঁহার চারিখানা লাঙ্গল এবং অন্দরমহল দ্বিতল। পূর্ব-পাড়ায় পাঁচ সাত খানা দ্বিতল গৃহ ছিল, কিন্তু পশ্চিমপাড়ায় চক্রবর্তীর দ্বিতল গৃহই 'একোমেবাদ্বিতীয়ং"। গ্রামের পশ্চিম দিকের মাট হইতে তাঁহার আবাস বৃক্ষরাজির ভিতর দিয়া অনেক দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যাইত।

বেলা ৪টার পর চক্রবর্তীর অন্তঃপুরে নীচেকার বারান্দায় মহিলা-সমিতির অধিবেশন হইয়াছে। প্রত্যহই এই প্রকার অধিবেশন হইত। পাড়ার ১২/১৩ জন স্ত্রীলোক এই সময চক্রবর্তী-গৃহিণীর নিকট সমাগত হইয়া নানাপ্রকার সাংসারিক কথাবার্তা কহিত। কোনও-কোনও দিন কমলিনী দাশুরায়ের পাঁচালী বা কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িতেন, আর অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তদগতচিত্তে তাহা-শ্রবণ করিত। যে দিন পুস্তক-পাঠ না হইত, সে দিন প্রৌঢ়ারা দলবদ্ধ হইয়া গৃহিণীর নিকট সাংসারিক কথা কহিতেন, এবং যুবতীরা অন্যত্র হইয়া সখীগণের নিকট নিজের নিজের হৃদয়-দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতেন। ছোট-ছোট বালক বালিকারা এ দিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিত। চক্রবর্তী মহাশয়ের বাটীতে বালক বালিকা কেহ না থাকিলেও প্রতিবাসী বালকবালিকাগণ তাহাদের কমল দিদির নিকট থাকিতে বড় ভালোবাসিত। কারণ, কমল কাহারও পুতুলের বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া দিতেন, কাহারও মাথা বাঁধিয়া দিতেন, এবং সময় মতো সকলকে কিছু-কিছু মিষ্টান্ন দিতেন, এবং কমলাদিদির নিকট বালক-বালিকার বড় অসদ্ভাব ছিল না।

আজও প্রচলিত প্রথামতো বামা ঠাকুরাণী, ঘোষগিন্নি, হারাণের মা ইত্যাদি পল্লীপার্লামেন্টের ব্রাইট, ফসেট, ব্রাডলা, সালিসবরীগণ সমবেত হইয়াছেন। বামা ঠাকুরাণী গ্লাডস্টোন, কারণ একে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা, তারপর বালবিধবা, এবং এই পশ্চিমপাড়া তাঁহার জন্মস্থান। সকলেই তাঁহার "দেখতা"। তিনি সম্পদে বিপদে, আহ্লাদে বিষাদে, রহস্যে রসিকতায় সর্ব্বত্রই সমভাবে বর্তমান। আবার সৌভাগ্যবশতঃ পল্লীস্থ যুবামাত্রেরই তিনি "ঠানদিদি"।

এ হেন ঠানদিদি ওরফে বামাঠাকুরাণী, ওরফে গ্লাডস্টোন, কমলিনীর মাতার নিকট যখন আগন্তুকের ব্যবহারের কথা শুনিতে পাইলেন, তখন ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আহা বউমা আমাকে ডাকতে হয়, আমি এসে ছোঁড়ার তেল মাখা বার করতুম। তার কানে পাক দিয়ে কান থেকে টস-টস করে তেল বার করতুম না। এত রসিক? পরের বউঝির সঙ্গে রসিকতা করেন! ছোঁড়া কোথা গেল? একবার খবর নেব নাকি?"

গৃহিণী তাচ্ছিল্যভাবে বলিলেন, "বাইরে পড়ে বুঝি ঘুমুচ্ছেন।"

বলা বাহুল্য, কমলিনীর সখীও এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন,

"ঠাকুরমা তোমাকে আর সে কষ্ট করতে হবে না, মিন্সেকে যা বলবার তা আমি বলেছি, আমি তেমন মেয়ে নই।"

"বেশ করেছিস!"

গ্রামান্তর হইতে এক হাঁটু ধুলা মাখিয়া একটা মাছ ও একটা কপি হাতে করিয়া গৃহস্বামী চক্রবর্তী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া কত ধান আছড়ান হইয়াছে, কত ধান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়া চণ্ডীমণ্ডপে দৃষ্টনিক্ষেপ কবিয়া আগন্তুকের পাদুকা ও বস্ত্রাদি দেখিতে পাইলেন। চণ্ডীমণ্ডপের দিকে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ওখানে কে গা?"

গৃহস্বামীর কণ্ঠস্বরে আগন্তুক সসম্ভ্রমে আসিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ করিলে চক্রবর্তী মহাশয় আহ্লাদে গদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,

"বাবাজী? ললিতমোহন? কতক্ষণ? কেমন আছ?"

"আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে আছি ভালো। প্রায় বেলা ১০টার সময় আসিয়াছি।"

"তা এখানে কেন? বাটীর মধ্যে না গিয়া বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে?"

"এখানে নির্জনে একটু বিশ্রাম কবিতেছিলেন—" চক্রবর্তী মহাশয় মনে করিলেন, তবে বুঝি অন্তঃপুরে গিয়াছিলেন, আহারাদি সম্পন্ন করিয়া বাহিরে আসিযাছেন। বলিলেন, "বস বাবা, হাত-পা ধুয়ে আসি।"

ব্রাহ্মণ বাড়ির মধ্যে গিয়াই পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ললিত কখন এসেছে? কি খাওযা-দাওয়া হল? আমি বাড়িতে ছিলাম না—"

বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে গৃহিণী বলিলেন, "কে ললিত? জামাই? কোথা?"

"কেন, বাইবে,—চণ্ডীমণ্ডপে!"

"সে কি? ও কি জামাই? ও মা যাব কোথা? কি অভাগ্গি!"

সকলের বিস্ময়ের উপর বিস্মষ! "পোড়ারমুখো বেহায়া ছোঁড়া" জামাতা! একমাত্র কন্যা কমলিনীর স্বামী! পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের তিনটা পাশ করা ২৫০৲ টাকা বেতনের, কার্তিকের সম রূপবান যুবা জামাতা!

কমলিনীর সই যখন শুনিল যে, ওবেলাকার সেই স্নানের ঘাটেব সেই মিন্সে আর কেহই নহেন, তাঁহার প্রাণসখী কমলিনীর প্রাণেশ্বর ললিতমোহন, তখন আর তাহাব লজ্জার সীমা রহিল না। কিন্তু সে সদাই সপ্রতিভ, গৃহিণীকে বলিল, "সইমা! আমরা মাখনচোরার কথাই জানিতাম, কিন্তু তেলচোরার কথা ত জানতেম না। তাহলে ধরে ফেলতেম।"

এমন সময় চক্রবর্তী মহাশয় জামাতার হস্তধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ কবিলেন।

১১শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩০৭



বিদায়

দীনেন্দ্রকুমার রায়

মতিলাল স্বগ্রামেই বিবাহ করিয়াছিল। বিবাহের পূর্বেও অনেকবার শুভদৃষ্টি হইয়াছিল, কেহ সাক্ষী হয় নাই, কিন্তু শেষ শুভদৃষ্টিটা কি শুভক্ষণেই ঘটিয়াছিল! —চন্দ্র-সূর্য পর্যন্ত সাক্ষী হইয়া রহিল, আত্মীয়-কুটুম্ব তো দূরের কথা! নির্বোধ প্রেম অপ্রতিহত গতিতেই চলিতেছিল, কিন্তু অনেক দিন পরে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিঘ্ন আসিয়া সমস্ত গোলমাল করিয়া দিল। মানুষ মাটির উপর ঘর বাঁধিয়া বেশ সুখে এবং নিশ্চিন্ত মনে ঘরকন্না করে—কিন্তু কোথা হইতে একটা অচিন্তিতপূর্ব ঝড় আসিয়া ঘরদ্বার ভাঙিয়া সমভূমি করিয়া দেয়। বাহ্যপ্রকৃতিতেই যে শুধু এমন হয় তাহা নহে, মানবজীবনেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

অতি শৈশবকালে মতিলাল মাতৃ-পিতৃহীন হইলে, তাহার মাতুল রামগোবিন্দবাবুই তাহাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন, এবং এই কার্য তাহার মাতুলানীর চক্ষে কিঞ্চিৎ বিসদৃশ বোধ হইলেও, মতিলালের স্নেহবঞ্চিত দুর্বল শিশুহৃদয় তাহার মাতুলের দীপ্ত স্নেহালোকে ক্ষুদ্র পল্লবের ন্যায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে তিনিই বিশেষ আড়ম্বরে তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

মতিলালের মাতুল রামগোবিন্দবাবু কলিকাতার কোনও ব্যাঙ্কের কেশিয়ার ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার পার্থিব স্বার্থও এই ব্যাঙ্কের সহিত সম্পূর্ণরূপে বিজড়িত ছিল। তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত, সংসার খরচ বাদে অল্প যাহা বাঁচিত, সমস্তই ব্যাঙ্কে জমা রাখিতেন। আশা করা যায়, যে টাকাটা জমানো ছিল, তাহাতেই তাঁহার বার্ধক্য একরকমে কাটিয়া যাইত। কিন্তু যে কথা মানুষের মনে একবারও উদিত হয় না, বিধাতা বহুপূর্বেই তাহা অদৃষ্টে লিখিয়া রাখেন। হঠাৎ একদিন ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া রামগোবিন্দবাবুকে পথে বসাইয়াছিল। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিবেচনা করিল, ব্যাঙ্ক ফেল হইবার সম্ভাবনা। রামগোবিন্দের পূর্ব হইতে জানিতে বাকি ছিল না, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই বিলক্ষণ দশ টাকা সরাইয়াছেন।

কিন্তু বৈষয়িক বুদ্ধির অভাববশতই হউক, বা অন্য কোনও কারণেই হউক, তাঁহার গৃহে একপয়সাও আসে নাই। কলিকাতায় সপরিবারে বেশিদিন বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকা চলে না, গাড়ি-ঘোড়া এবং তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া তিনি পল্লীগ্রামে পৈতৃক ভিটায় উপস্থিত হইলেন। বৎসর বৎসর দুর্গোৎসবের সময় যে গ্রাম তাঁহাকে মহা সমারোহে এবং উচ্ছ্বসিত প্রীতিভরে অভ্যর্থনা করিত, আজ তাঁহার এই দুর্দিনেও সে তাঁহাকে তাহার ছায়াচ্ছন্ন স্নিগ্ধ ক্রোড়ে সস্নেহে গ্রহণ করিল। প্রতিদিন প্রভাতের তরুণ সূর্য তেমনি নবীন রাগে পূর্ব দিক উদ্ভাসিত করিয়া আকাশপ্রান্তে উঠিতে লাগিল, তরুশাখায় বিহঙ্গের তেমনি আনন্দকাকলী, গ্রাম প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী তেমনি চঞ্চল স্রোতে বহিয়া যাইতেছিল, এবং নদীতীরে উন্মুক্ত প্রান্তরে রাখালের দল পূর্ববৎ গরু চরাইয়া গান গাহিয়া ফিরিতেছিল; কিন্তু রামগোবিন্দবাবুর হৃদয়ে ঝটিকার বিরাম ছিল না।

যে সকল বন্ধুবান্ধবের বিশ্বাস ছিল, তাঁহার হস্তে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত আছে, গৃহে তাহারা দুই -চারি দিন তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে আসিয়া

সন্ধ্যাকালে ম্লান দীপালোকে বহির্মণ্ডপের এক সতরঞ্চীর উপর বসিয়া তাম্র কূটধূমের সহিত প্রচুর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল, কিন্তু যখন তাহারা বুঝিল, লোকটা বাস্তবিকই শূন্যহস্তে বসিয়া আছে, এবং পরিবার-প্রতিপালনের উপায়ান্তর না দেখিয়া বাক্‌স চৌকি বিক্রয়পূর্বক মোটা-ভাত ও মোটা কাপড়ের সংস্থান করিতেছে, তখন সেই শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু এবং আত্মীয় প্রতিবেশীগণ মধুহীন মধুচক্রের ন্যায় তাঁহার প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শন করিতে লাগিল। যাহারা গোপনে তাঁহাকে ভয় করিত, তাহারা এখন প্রকাশ্যে অসম্মান দেখাইতে লাগিল;—নকুড় ভট্টাচার্য বিজয়া দশমীর দিন তাঁহার দরজা দিয়া অন্যান্য বার অপেক্ষা বেশি ঘটা করিয়া ঢাক বাজাইয়া গেল। তাঁহার দরজায় আসিযা ঢাকিদিগের ঢাকে কিঞ্চিৎ জোরে কাঠি দিবার কি আবশ্যক ছিল, তাহা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া রামগোবিন্দ বাবু অন্ধকার ঘরে একাকী বসিয়া নিজের পূর্বকথা ভাবিতে লাগিলেন।

কিন্তু বেচারা মতিলালের বিপদই সর্বাপেক্ষা বেশি হইয়াছিল। মাতুলের উপর নির্ভর করিয়া সে এত দিন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া আসিয়াছে; কোনও দিন কাহারও নিকট মস্তক অবনত করা আবশ্যক বোধ করে নাই, এবং সম্মুখে যখন যে বাধা আসিয়া পড়িয়াছে, বিলাতি জুতার তলায় তাহাই নিষ্পেষিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে; আজ ক্ষুদ্রের উপেক্ষা ও সামান্য সামান্য বাধা তাহার পক্ষে অসহ্য এবং দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া পড়িল, এবং যে পর্বতের সুশীতল শৃঙ্গকে অটল মনে করিয়া সে তাহার উপর নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি নিতান্ত উদাসীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, সেই পর্বতশৃঙ্গের পতনের সঙ্গে তাহার উন্নত মস্তক একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

পিতামাতার আদরের কন্যা বলিয়া মতিলালের স্ত্রী সোনামুখী অধিকাংশ সময়েই পিতৃগৃহে বাস করিত; মতিলাল দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া দুই-এক মাস অন্তর যখন বাড়ি আসিত, তখন দিবসের অধিকাংশ সময় বন্ধুগৃহে তাস-পাশা লইয়া ব্যস্ত থাকিত। রাত্রিকালে মতিলাল আপনার প্রবাসশ্রান্ত বিরহক্লান্ত হৃদয়টিকে প্রিয়তমার গভীর প্রেম, আদর এবং মান অভিমানের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করিত।

মতিলালের শাশুড়ির বিশ্বাস ছিল, তাঁহার জামাতা একটা লোকের মতো লোক, ইচ্ছা করিলেই সে হাকিম হইতে পারে, এবং সোনামুখীকে একরাত্রির মধ্যে সোনা-রূপায় মুড়িয়া দিতে পারে; এমনকি নদীতে স্নান করিতে গিয়া প্রতিবেশিনী রমণীগণের কাছে জামাইয়ের প্রশংসা করিতে-করিতে তাঁহার দুঘণ্টা কাটিয়া যাইত, কিন্তু জামাতৃবরকে এরূপ প্রশংসমান চক্ষে দেখিবার কি ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন। তবে মতিলালের বিলাতি জুতার মস-মস শব্দ, টেরির নৈপুণ্য ও শার্টের বৈচিত্র্য দেখিয়া সেই সরল পল্লীগৃহিণীর এরূপ ধারণা হওয়া অসম্ভব ছিল না।

যাহা হউক, এইরূপ একটি সুসভ্য জামাতা লাভ করিয়া তিনি মনে-মনে বিশেষ গর্ব অনুভব করিতেছিলেন। মতিলাল দিবসে বাড়িতেই আহারাদি সম্পন্ন করিত, রাত্রে শাশুড়ি তাহার দ্বিতলস্থ শয়নকক্ষে ষোড়শোপচারে আহার যোগাইতেন; আহারবিষয়ে মতিলালের বাল্যকাল হইতেই সবিশেষ পারিপাট্য ছিল, দৈবাৎ কোনও ব্যঞ্জন তাহার সুনিপুণ রসনেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অনুকূল না হইলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন, এবং প্রাণপণ শক্তিতে নিজের ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করিতেন।

মতিলালের শ্বশুরের আর-একটি জামাতার নাম ছিল কালাচাঁদ। সে অতি গরীব

এবং লেখাপড়ারও কোনও ধার ধারত না। সে এক উকিলের মুহুরিগিরি করিত, এবং সংসারে আর কেহ না-থাকাতে বাধ্য হইয়া তাহাকে শ্বশুরালয়েই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। তাহার গায়ে ইস্ত্রিকরা শার্ট ও পায়ে বিলাতি জুতা, এ উভয়েরই অভাব লক্ষিত হইত, সুতরাং শ্বশুরবাড়িতেও সে তদুপযুক্ত আদর লাভ করিত। নিচের তলায় একটি অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে তাহার শয়নকক্ষ নিরূপিত হইয়াছিল, আহারের সময় তাহার সম্মুখে যে অন্ন প্রদত্ত হইত, তাহার কথা কালাচাঁদই ভালো বলিতে পারে।

অতএব সেই অন্নে উদর পূর্ণ করিয়া মলিনবস্ত্রধারী চিন্তাক্লিষ্ট কালাচাঁদ যখন শয্যায় পড়িয়া অন্ধকারের মধ্যে ছারপোকার দশংনজ্বালা অনুভব করিত, এবং আরশুলার দল চঞ্চল-পক্ষ সঞ্চালন পূর্বক সেই নিস্তব্ধ গৃহটিকে বিলক্ষণ সজাগ করিয়া তুলিত, তখন দ্বিতলের কেরোসিনের আলোকে সমুজ্জ্বল একটি সুসজ্জিত কক্ষে মতিলালের বিরামসুখের নিভৃত কল্পনায় তাহার চিত্ত অত্যন্ত উৎক্ষিপ্ত ও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

অনেক দিন এইরূপে কাটিল, তাহার পরই উল্লিখিত বিপদ। এই বিপদের পর হইতে মতিলালের মাতুলানী মতির উপর আরও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। এতদিন তাহাকে চাকরি-বাকরি সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন নাই, দুই-এক সময় যদি তিনি সেরূপ কোনও ভাব দেখাইতেন, তাহা হইলে মতিলালও এমন ভাব দেখাইত যে, সে তাহার মামীর পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করিতেছে না, এবং মামার উপর তাহার দাবি মামীর দাবির অপেক্ষা অল্প নহে। কিন্তু এখন মাতুলানীর আর সে সঙ্কোচ নাই, তিনি একদিন প্রকাশ্যে বলিলেন,— "বাবু, এতদিন তোমাকে পুষিলাম, এখন আর আমাদের সে দিন নাই, এখন তুমি তোমার নিজের পথ দেখো।"

মতিলালের ভারি রাগ হইল, মামি কথাটা যে কিছু অন্যায় বলিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু সত্য কথাতেও অনেক সময় বড় রাগ হয়, তাহার মনে হইল, "আমি একবেলা একমুঠো খাই, সেটা কি এতই অসহ্য হইল। ভালো, আজ হইতে আর মামার অন্ন স্পর্শ করিব না।" রামগোবিন্দবাবুর কানেও কথাটা উঠিল, তাহার উপর গৃহিণী নানা অলঙ্কারে কথাটিতে বেশ সাজাইতেও ভুলেন নাই। বিপদে এবং বিবিধ প্রকার চিন্তায় রামগোবিন্দবাবুর মন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না, এ দিকে তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত খিট্‌খিটে হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"ছোঁড়াটা কি নিমকহারাম, আমি কি তাহাকে কখনও একবিন্দুও স্নেহ করি নাই? কষ্ট দেখিয়া আজ সে-ও আমাকে ছাড়িতে চায়?"—তিনি মতিলালকে কোনও কথাই বলিলেন না। মতিলাল ভাবিল, "সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও মামা কি একটা কথাও বলিতে পারিলেন না, অন্নকষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমাকে এতই পর মনে করিলেন? মাতুল ও ভাগিনেয়ের মধ্যে গভীর বিচ্ছেদ ঘটিল।

কষ্টে ও দুঃখে মতিলালের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, কিন্তু সে বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট তাহার কষ্টের কারণ ব্যক্ত করিল না। এখন স্ত্রীই তাহার একমাত্র বন্ধু, সখী, অমাত্য, সুহৃদ,—সব। হৃদয় যখন বিদীর্ণ হইয়া যায়, তখন আর-একখানি কোমল হৃদয়ের মধুর সহানুভূতি এবং নীরব সান্ত্বনা লাভ করিতে ইচ্ছা হয়; মতিলালের পক্ষে তাহার অভাব হয় নাই। মতিলাল যখন তাহার স্ত্রীর স্কন্ধদেশে মস্তক রাখিয়া আবেগভরে বলিল,—"আর না, আমি আজই কাজকর্মের সন্ধানে বাহির হইব, কিন্তু হায়, তোমাকে বেশি দিন না দেখিয়া বিদেশে কেমন করিয়া থাকিব?"—তখন সোনামুখী তাহার উচ্ছ্বসিত হৃদয়বেগ কষ্টে সংবরণ করিয়া বলয়ালঙ্কৃত দুখানি কোমল করপল্লবে স্বামীর অবনত মস্তক বুকে চাপিয়া ধরিল,

এবং বিষয়াদাচ্ছন্ন কোমল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"এখন দিনকতব এখানেই থাক, এমন মন লইয়া বিদেশে যাওয়া ভালো নয়। আমি এখন তোমাকে কিছুতে ছাড়িব না।"

কিন্তু কেন বলা যায় না, মতিলালের উপর শাশুড়ির আদরও যেন কমিয়া আসিতে লাগিল। হয়তো তাঁহার মনে হইয়াছিল, জামাতার হাকিম হইবার ক্ষমতা থাকিলে সে মামার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তাঁহার স্কন্ধে ভর করিতে আসিবে কেন? অতএব একদিন তিনি নিঃসঙ্কোচে পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন,—"ভাত হইয়াছে, মতিকে উপব হইতে ডাকিয়া আন।"

কামিনী-ঝি অবিলম্বে দৌত্যকার্য সম্পন্ন করিল। নিজের প্রতি তখনও পর্যন্ত মতিলালের অগাধ বিশ্বাস; সুতরাং মনে কিঞ্চিৎ বিস্ময় এবং ভ্রূযুগলে যথেষ্ট বিরক্তির সঞ্চয় করিয়া বলিল,—"কেন, এখানে?"

ঝি বিদিত করিল, বামুনঠাকুর নিচে ভাত ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে, মার শবীর খারাপ, দিদিমণিও ভাতের থালা টানিতে অশক্ত।

বাস্তবিক সে দিন সোনামুখীর বড় জ্বর। কিন্তু নিচে গিয়া আহার করা (অবশ্য শ্বশুরবাড়িতে) মতিলালের কখনও অভ্যাস ছিল না, সুতরাং এই অনভ্যাসেব কার্যে কেহ তাহাকে রাজি করিতে পারিল না, রাত্রি দশটার সময় সোনামুখী ক্লান্তদেহে কাঁপিতে-কাঁপিতে থালা হাতে করিয়া স্বামীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। মতিলালকে আহারের জন্য অনুরোধ করিলে সে বলিল, তাহার ক্ষুধা নাই। সোনামুখী তখন স্বামীর বক্ষঃস্থলে তাহার জ্বরক্লিষ্ট উত্তপ্ত ললাটখানি স্থাপিত করিয়া কহিল,—"জ্বরে এতক্ষণ উঠিতে পারি নাই, তাই ভাত আনিতে বিলম্ব হইয়াছে, রাগ করিযাছ কি?" —মতিলাল সস্নেহে সোনামুখীব অসংযত চূর্ণকুন্তলরাশি ধীরে-ধীরে স্বস্থানে বিন্যস্ত করিয়া বলিল,—"তোমার অসুখ হইয়াছে, কেন কষ্ট করিয়া ভাত বহিয়া আনিলে?" —সোনামুখী উত্তর করিল,—"তা হোক, আমার অসুখের জন্য তোমার খাওয়া বন্ধ হইবে? তুমি ওঠ।" মতিলাল স্ত্রীর অনুবোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না।

শ্বশুরবাড়িতে প্রতিদিন আদর কমিতেছে, মতিলাল যে তাহা বুঝিতে পাবে নাই, এমন নহে, কিন্তু সোনামুখীর গভীর স্নেহ সেই অনাদরকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রাখিত, সোনামুখী সমস্ত বুঝিতে পারিত, এবং তাহার একটুখানি হৃদয়ের সমস্ত যত্ন দিয়া স্বামীর পরিচর্যা করিত।

একদিন রাত্রে সোনামুখী রন্ধনশালায় গিয়াছে, তাহার যে বিশেষ কিছু আবশ্যক ছিল, তাহা নহে। স্বামী-স্ত্রীতে মধ্যাহ্নে কথা উঠিয়াছিল, সে কালে মেয়েরা কেমন ভাত-ব্যঞ্জন রাঁধিত, এবং বন্ধন ভালো হইলে আপনাকে কত সৌভাগ্যবতী মনে করিত, কিন্তু এ-কালের মেয়েরা বড় বাবু হইয়া পড়িয়াছে, গা ধুইতে, চুল বাঁধিতে আর নভেল পড়িতেই তাহাদের সমস্ত বেলা কাটিয়া যায়। সোনামুখী বিছানার উপর সকোপে উঠিয়া বসিল, দুই হাতে স্খলিত বেণী জড়াইতে-জড়াইতে বিস্ফারিতনেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি রাঁধতে পারি কিনা, আজ তা দেখতে পাবে—সেটা কি এতই শক্ত কাজ?"

ব্যঞ্জনাদি রন্ধন শেষ হইলে সোনামুখী বলিল,—"মা, একবার ভাঁড়ার ঘরের চাবিটা দাও তো।"

মা উত্তর দিলেন "চাবি কি হবে?"

"চাট্টি বালাম-চাল নোব।"

মা বলিলেন,—"রাতে আর বালাম চাল রাঁধবার দরকার নেই।"

সোনামুখী আর কোনও উচ্চবাক্য করিল না। স্বামীর জন্য চাট্টি বালাম চাউল রাঁধিবে, তাহাতেও মার আপত্তি! ইহা অপেক্ষা আর কি বেশি হতাদর হইতে পারে?—দুঃখে-অভিমানে বালিকার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু আজ তাহার অভিমান করিবার সময় নহে।

কামিনী-ঝি তাহার চোখে জল দেখিতে পাইল, কিন্তু কারণ বুঝিল না, তাই হাসিতে-হাসিতে বলিল,—"কি গো দিদিঠাকুরুণ, উনোনের ধুমোতে যে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল, সাধ করে কি এমন বেড়ি না ধরলেই নয়?"

সোনামুখী অঞ্চলে চোখ মুছিয়া বলিল,—"যা, আর জ্বালাসনে, দুটো পয়সা দিচ্ছি, একদৌড়ে দুপয়সার বালাম-চাল কিনে এনে দেতো।"

কামিনী যেন আকাশ হইতে পড়িল; বলিল,—"কেন, এ আবার কি রকম রঙ। ভাঁড়ারে তো বালাম-চালের অভাব নাই।"

সোনামুখীর অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, বলিল,—"তা থাক, রাজার ভাণ্ডারে টাকা-কড়ির অভাব নেই, তাতে গরীবের কি?"

কামিনীর বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল—সে ব্যগ্রভাবে বলিল,—"হ্যাঁগো, দিদিঠাকরুণ, এমন কথা বলছ কেন?—তোমার মুখে কখনও তো এমন কথা শুনিনি।"

মাতার কঠিন কথা সোনামুখী কিছুতেই দাসীর নিকট প্রকাশ করিল না, বুঝি আর কেহ হইলে সে কথা বলিয়া ফেলিত; কিন্তু সোনামুখী বড় চাপা মেয়ে; তাহার আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হইয়া কামিনী বাজার হইতে চাউল কিনিয়া আনিয়া দিল।

রন্ধনশেষে সোনামুখী স্বামীর জন্য অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া তাহার শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইল। শাশুড়ির চাউলের কথাটা মতিলাল শুনিতে পাইয়াছিল, সন্ধ্যা হইতে সে নিজের অবস্থার কথা চিন্তা কবিতেছিল, দারিদ্রের মর্মভেদী যন্ত্রণা মনে করিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। সোনামুখী আহারার্থ ডাকিলে মতিলাল বলিল,—"আমার অসুখ হয়েছে, কিছু খাব না।"—কিন্তু বুদ্ধিমতী স্ত্রীর নিকট তাহার এ ছল নিষ্ফল হইল। সোনামুখী মতিলালের কপালে, বুকে হাত দিয়া বলিল,—"না কিছু অসুখ হয়নি, আমার মাথা খাও—উঠে চাট্টি খাও।"

মতিলাল কিছুই খাইল না, সোনামুখীর সাধের রান্না ভাত-ব্যঞ্জন শুকাইতে লাগিল, সোনামুখীও অনাহারে স্বামীর পাশে শুইয়া পড়িল; দুঃখে-কষ্টে তাহার বুক ফুলিতে লাগিল, মতিলালও গভীর চিন্তায় মগ্ন—শুধু এক-একটি উচ্চ দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া শূন্যে বিলীন হইতেছিল। রাত্রি অনেক হইয়াছিল, ক্ষুদ্র গ্রাম নিঃশব্দ, সকলেই নৈশ আহার শেষ করিয়া নিরুদ্বেগচিত্তে নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিল, শুধু একটি অট্টালিকার নির্জন কক্ষে এই শান্তিহীন ব্যথিত-দম্পতি বিনিদ্র-রজনী অতিবাহিত করিতেছিল; দুজনের কাহারও মুখ দিয়া একটিও সান্ত্বনার কথা বাহির হইল না।

মতিলাল এতদিন সহিয়া আসিয়াছে, আর অধিক সহ্য করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইল; অর্থোপার্জনের চেষ্টায় বিদেশে যাইবে, স্থির করিল। গোপনে সমস্ত দিন বিদায়ের আয়োজন করিয়া মতিলাল স্ত্রীর নিকট শেষ বিদায় গ্রহণের জন্য সন্ধ্যাকালে শ্বশুরবাড়ি চলিল।

বৈশাখ মাসের সন্ধ্যাকাল। মতিলালের শ্বশুর ভবানীচরণের অট্টালিকার সম্মুখে কপোতাক্ষ অলস স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, মাঝিরা নদীতীরে নৌকা বাঁধিয়া কোনও নৌকায় গান আরম্ভ করিয়াছে, কোনও নৌকায় রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছে। নদীর অপব পার হইতে দুই-একখানি নৌকার ক্ষীণ আলোক নদীবক্ষে পড়িয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন খানিকটা জায়গা লইয়া জলে আগুন লাগিয়াছে।

একখানি ভাড়াটে-গাড়ি 'খন্ খন্ ছন্ ছন্' শব্দে রাজপথ ধ্বনিত করিয়া বাজাবের দিকে ছুটিয়া চলিল; মতিলাল শ্বশুরের অন্ধকারাচ্ছন্ন অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ধীরে-ধীবে দরজায় আঘাত করিল।

ভিতর হইতে ঝি জিজ্ঞাসা করিল,—"কে?"

মতিলাল অনুচ্চরে উত্তর করিল, "শ্যামলাল বাড়ি আছ?"

মতিলালের শাশুড়ি বলিলেন,—"মতি বুঝি, বলো, শ্যাম বাড়ি নেই।"

মতিলাল বলিল,—"তা হলে এখন যাই।"

কামিনী ভিতর হইতে বলিল,—"দাদাবাবু এলে বল্‌বো, আপনি তাঁর খোঁজ কচ্ছিলেন।"

মতিলাল আর কোনও উত্তর করিল না। দ্বারের সম্মুখ হইতে ফিরিয়া রাস্তার ধারে একবার বসিল; পূর্বকথা সকল তাহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে হইল, সে বাড়িতে থাকিলে শ্বশুরালয়ে প্রবেশের পূর্বে সন্ধ্যায় সময় কোনও দিন দরজা বন্ধ হইত না, এবং যদি দৈবাৎ কখনও তাহা বন্ধ হইত, তবে তাহার সাড়া পাইবামাত্র দ্বার খুলিযা দিবার জন্য পাঁচ জনে ছুটিয়া আসিত। হায় সে দিন!

যাহা হউক, অতীত স্বপ্নেব কথা মনে করিয়া ব্যথিত হওয়া বৃথা,—"আর দেখা হইল না, যদি আবার ফিরিযা আসিতে পারি দেখা করিব"—এই ভাবিয়া মতিলাল উঠিল; দুই পদ অগ্রসর না হইতেই 'ঝন্' করিয়া দরজা খুলিয়া গেল, মতিলালের সে দিকে ফিরিয়া চাহিবার ইচ্ছা ছিল না, বোধকরি তখন চিন্তা-স্রোত তাহার অতীত জীবনের উপর দিয়া তীব্রবেগে প্রবাহিত হইতেছিল।

কিন্তু তাহার চিন্তা সহসা অর্ধপথে অবরুদ্ধ হইল! চারিগাছি মলের মৃদু শব্দ তাহাব কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে-সঙ্গে সোনামুখীর কোমল করতল তাহার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল; সোনামুখী নিতান্ত করুণ ও ব্যথিত স্বরে বলিল,—"ওগো যেয়ো না, শোন।"

সেই অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া মতিলাল রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,— "এখনও ফিরিতে বলিতেছ? কোথায় ফিরিব, তোমার পিতৃগৃহে?—আজ তাহার শেষ। তোমার কাছে শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু হায়, পথে দাঁড়াইয়া বিদায় লইতে হইল। বহুদূরে যাইতেছি; কবে ফিরিব, জানি না। ঈশ্বর যেন তোমাকে সুখে রাখেন, তোমার অযোগ্য, প্রবাসী স্বামীর কথা কখনও-কখনও মনে করিও।" মতিলাল দেখিতে পাইত, সোনামুখীর চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই উচ্ছ্বসিত অশ্রু আত্মগোপন করিতে পারিল না, মতিলাল দুই হস্তে তাহার দুই হাত ধরিয়াছিল, অশ্রুধারে মতিলালের হাতদুখানি ভাসিয়া গেল।

মতিলাল স্নেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"সোনামুখী, কাঁদিতেছ? তুমি যাহাতে অসুখী হও, এমন কোনও কাজ তো আমি করি নাই।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সোনামুখী উত্তর করিল,—"তাহা জানি, আমার জন্য তুমি

অনেক সহিয়াছ; হতভাগিনী আমি নিজের সুখের জন্য তোমাকে অসুখী করিয়াছি; কিন্তু আমি আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিব, স্থির করিয়াছি।"

মতিলাল পত্নীব দুই স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি করিতে চাও?"

সোনামুখী তাহার স্পন্দমান হৃদয়ের সমস্ত সাহস একত্রিত করিয়া সংক্ষেপে উত্তর করিল, —"তোমার সঙ্গে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিব। এত দিন বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু আমার ভুল ভাঙিয়াছে; যেখানে তোমার অনাদর, সেখানে আমি আদরের ভিখারিনী নহি। সংসারে অনেক অনাথ-দরিদ্রের স্থান আছে, আমাদেরও স্থান হইবে। চলো, আব বিলম্ব নহে, আমার যাহা কিছু সম্বল আঁচলে বাঁধিয়া লইয়াছি।"

"বাড়িতে সকলের কাছে একবার বিদায় লইবে না?"

"ভগবান যদি দিন দেন, আবার আসিয়া লইব, এখন তার সময় নয়।"

স্নেহ ও প্রশংসায় মতিলালের বক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দুর্ভাগ্যের নিম্নতম সোপানপ্রান্তে দাঁড়াইয়াও আজ তাহার মুহূর্তের জন্য মনে হইল, জগতে তাহার অপেক্ষা অধিক সুখী কেহ নাই। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম এবং স্ত্রী স্বামীর ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া সেই অন্ধকার নিশীথে সংসারসমুদ্রেব আবর্তের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

উভয়ে একবার নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশের দিকে চাহিল;আকাশ মেঘনির্মুক্ত, নদীর বক্ষ দিয়া বায়ুপ্রবাহ হু-হু স্বরে বহিয়া বৃক্ষশাখা কম্পিত করিতেছিল, অদূরে বনান্তরালে শৃগালের দল একবার চিৎকার করিয়া নিবৃত্ত হইল, এবং নদীবক্ষে তরণীমধ্য হইতে দিবসের পরিশ্রমে শ্রান্ত দাঁড়ি-মাঝিরা তখনও গান গাহিতেছিল। মতিলাল স্ত্রীর হস্ত ধরিয়া সেই অট্টালিকার নিকট হইতে ধীরে-ধীরে বিদায় গ্রহণ করিল, কেহই তাহা দেখিল না। শুধু একটি দীর্ঘনিশ্বাস সেই অট্টালিকার প্রান্তে একটি বালিকার ব্যথিত হৃদয়ের গভীর কাতরতা নৈশ-প্রশান্তির মধ্যে বিলীন করিয়া দিল, এবং একটা জেলে একাকী বাসজালে মাছ ধরিতে-ধরিতে অন্যমনে গাহিয়া উঠিল ঃ—

"মান করে চলে যেয়ো না সখা,
ওগো সখা ফিরে এসো!"

৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২



জলাঞ্জলি

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

বৃদ্ধ হরশঙ্কর পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন,—"হেমচন্দ্র, আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, তুমি আমার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র; তোমার উপর সংসারের ভার দিয়া আমি কাশীবাসী হইব, মনস্থ করিয়াছি। বিষয়-সম্পত্তি যাহা কিছু রাখিয়া গেলাম, সযত্নে রক্ষা করিও; অপব্যয় করিয়া নষ্ট করিলে তোমাদেরই কষ্ট পাইতে হইবে—আমি আর কয়দিনই বা আছি। মনে সাধ ছিল—তোমাদের জন্য কত কি করিব; কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। তোমাদের শরীর-মন যাহাতে ভালো থাকে, তাহাই করিও। আর দেখিও বাবা, তোমার ছোট ভগ্নী হৈমবতীর যেন কোনওরকম কষ্ট না হয়—তাহার কোন-কষ্টের কথা শুনিলে আমি আর এ বৃদ্ধ বয়সে বাঁচিব না! বধূমাতাকে বলিয়া দিবে, তিনি যেন হৈমবতীকে আপনার মতো দেখেন। জামাতা বিপিনের পড়াশুনা যাহাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিবে। নিয়মমত চিঠিপত্র লিখিও—আর কি বলিব—তোমরা সুখে থাকিলেই আমার সুখ।"

হৈমবতীকে জন্মদান করিয়াই হরশঙ্করের স্ত্রী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। হরশঙ্কর একাধারে জনক-জননী হইয়া কন্যাটিকে বুকে করিয়া মানুষ করেন। কন্যা যতই বড় হইতে লাগিল, তাহার আকৃতি-প্রকৃতি ততই তাহার মাতার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যখন বয়স দশ কি এগারো বৎসর, তখন মেয়েটিকে দেখিলে মনে হইত, যেন তাহার মায়ের মুখ অবিকল ভাবে কে তাহার মুখে বসাইয়া দিয়াছে। চলন-চালন, ধরন-ধারণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কণ্ঠস্বর, হাসি, সকলই তাহার মায়ের মতো। হরশঙ্কর অনেক সময়ে অবাক হইয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন—কি আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য;—দেখিতে দেখিতে মৃত সহধর্মিণীর সহস্র পূর্বস্মৃতি সুখে-দুঃখে মূর্তিমতী হইয়া আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিত। মাতৃহারা ক্ষুদ্র বালিকা কি মন্ত্রবলে কি বৃহৎ সৃষ্টিছাড়া স্নেহ-আকর্ষণে বৃদ্ধের সমস্ত হৃদয় কাড়িয়া লইল, তাহা জ্ঞানের অগোচর।

হৈমবতী চৌদ্দ বৎসরে পদার্পণ করিলে তাহার বিবাহের জন্য বৃদ্ধের বিপরীত ভাবনা উপস্থিত হইল। বিবাহান্তে কন্যা যে পরগৃহে গিয়া বাস করিবে, ইহা ভাবিলেও বৃদ্ধের কষ্ট বোধ হইত। মনে-মনে স্থির প্রতিজ্ঞা করিলেন, কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকে ঘরে রাখিবেন।

অনেক অনুসন্ধানের পর হরশঙ্কর এক ভদ্র গৃহস্থের রূপবান পুত্রেব সহিত খুব সমারোহে কন্যার বিবাহ দিলেন, এবং জামাতাকে ঘরজামাই করিয়া রাখিলেন। আহার-পরিচ্ছদ সকল বিষয়ে হরশঙ্কর পুত্র হেমচন্দ্রের সহিত জামাতার সমান ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পুত্রকে মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া পকেট-খরচা দিতেন—জামাতারও তাহাই করিয়া দিলেন।

বিবাহের দুই বৎসর পরে হৈমবতীর এক পুত্রসন্তান জন্মলাভ করিল। বৃদ্ধের আর আনন্দের সীমা রহিল না। নূতন বিষয়-সম্পত্তি পাইলে লোকের মনে যত না সুখ হয়, বৃদ্ধ ততোধিক সুখী হইলেন।

কিছু বড় না হইতেই শিশু আর বুড়ার কাছ ছাড়া হইত না—বৃদ্ধ সমস্তক্ষণ তাহাবে কোলে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। "এটা দাও, ওটা দাও" করিয়া ছেলেটি বৃদ্ধকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। "দাদা, গগ যাব"—অমনি গাড়ি জুতিতে বলিয়া বুলোকে (ছেলেটির আদরের নাম ছিল "বুলো") লইয়া বৃদ্ধ রাস্তায় একটু ঘুরাইয়া আনিতেন। হরশঙ্কর তামাক খাইতে বসিলে বুলো তাঁহার মুখ হইতে নল কাড়িয়া লইত—নিজে হাতে করিয়া দাদার মুখে নল পুরিয়া দিত—সে ধরিয়া থাকিবে আর দাদাকে তামাক খাইতে হইবে। শিশুর কাছে হার মানিয়া বুড়া একেবারে আত্মসমর্পণ করিলেন!

বিপিন কালেজে চলিয়া গেলে, হৈমবতী বৃদ্ধ পিতার আহারের আয়োজন করিত। কখনও কখনও শখ করিয়া পিতার জন্য স্বহস্তে ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া আনিত। আহারের সময় ছেলেটিকে কোলে করিয়া পিতার নিকট আসিয়া বসিত। দাদা আসনে আসিয়া বসিলেই বুলো গম্ভীরভাবে বলিত,—"দাদা কাবে, কাও" যেন তাহার আজ্ঞার অপেক্ষায় দাদা এতক্ষণ বসিয়াছিলেন। দাদা কিছু মুখে তুলিয়া দিলে অমনি সে তাড়াতাড়ি বলিত, "বালো"—অর্থাৎ "আরও দাও"। শিশুর আধ-আধ মিষ্ট কথাতে বৃদ্ধের নীরস প্রাণও যেন আনন্দে নৃত্য করিত।

পুত্রের নিকট হরশঙ্কর যেদিন কাশী যাইবার কথা উত্থাপিত করিলেন, তাহার পরদিন যাত্রার সমস্ত আয়োজন করিলেন। আত্মীয়স্বজন সকলে আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। হৈমবতী বিষাদক্লিষ্ট সরল সুন্দর মাতৃমুখে আসিয়া যখন পদধূলি গ্রহণ করিল, তখন বৃদ্ধের দুই চক্ষু বাষ্পে ভরিয়া উঠিল। হৈমবতী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ মনের কষ্ট চাপিয়া কন্যার মস্তকের উপর শীর্ণ হাতখানি রাখিয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—"মা, কাঁদিও না, তুমি চিরসুখী হও, আমার এই একমাত্র প্রার্থনা।" বুলো দাদার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল,—"আমি গগ যাব।" হৈমবতী—পাছে পিতার মনে কষ্ট হয়—ছেলেটিকে অনেক কষ্টে ভুলাইয়া লইল। বৃদ্ধ অন্ধকার মনে আস্তে-আস্তে গাড়িতে গিয়া উঠিলেন। সোনার পুরী অন্ধকার হইয়া গেল।

।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।।

হরশঙ্কর চলিয়া গেলে তাঁহার অভাব হৈমবতী ও তাহার পুত্র সর্বাপেক্ষা অধিক অনুভব করিতে লাগিল। হৈমবতী নানা উপায়ে মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিত। সে মনকে বুঝাইত—পিতা সুখে থাকিলেই আমার সুখ—পশ্চিমে থাকিলে এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার শরীর ভালো থাকিবে—চিঠিপত্রেও তো তাঁহার সংবাদ পাইব—ইত্যাদি। হাজার প্রবোধ সত্ত্বেও পিতার অদর্শনজনিত দুঃখ হৈমবতীকে ছাড়িল না। কিন্তু শিশুর কাছে প্রবোধও নাই, সান্ত্বনাও নাই; বিচারও নাই, তর্কও নাই। সে মনে করিল, হঠাৎ এ কি হইল—দাদা কই, কোথায় গেল। সকালে দাদার পরিবর্তে যখন ঝি আসিয়া তাহাকে কোলে লইয়া বেড়াইতে লাগিল, তখন সে মনে-মনে ভারি অপমানিত বোধ করিল। দাদা নাই, কাহার মুখে নল পুরিয়া দিবে, কে পাখি দেখাইবে, কে 'গগ' চড়াইবে? তাহার ভারি কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। থাকিয়া-থাকিয়া সে দাদামহাশয়ের ঘরে ঢোকে, আর "দাদা গগ গেছে, চলি গেছে" বলিয়া ম্লানমুখে ফিরিয়া আসে। তাহার খেলা বন্ধ হইল, খাওয়া বন্ধ হইল—সে দিন দিন যেন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। শিশুরা কষ্ট হইলে কথায় প্রকাশ করিতে পারে না, কেবল মনে মনে গুমরাইতে থাকে; সেইজন্য মনের কষ্টে তাহাদের

শরীর একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। হৈমবতী ছেলেকে ভুলাইয়া অন্যমনস্ক করিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু সে কিছুতেই আর দাদাকে ভুলিতে পারিল না।

ছয় মাস অতীত হইতে না হইতে হরশঙ্করের অবর্তমান হেতু সংসার একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্রের স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা বৃদ্ধ থাকিতে এতদিন চুপচাপ করিয়াছিল—কিছুই করিতে পারিত না; কিন্তু এক্ষণে তাহার সমস্ত রুদ্ধ আক্রোশ অতিনিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। শ্বশুর থাকিতে হৈমবতীর সর্বাপেক্ষা আদর-যত্ন ছিল, তাহার অপেক্ষা হৈমবতীর গহনাপত্র অনেক বেশি, সে নিঃসন্তান আর হৈমবতী পুত্রবতী—হিংসায়-ক্রোধে লাবণ্য এতদিন জ্বলিয়া পুড়িত। এক্ষণে সে ঝাল ঝাড়িতে লাগিল। প্রত্যেক বিষয়ে হৈমবতীর সহিত খুঁটিনাটি আরম্ভ করিল। এমন কি, নির্দোষ শিশু বুলোও তাহার দুই চক্ষের বিষ হইয়া দাঁড়াইল। "মাসিমা! মাসিমা!" করিয়া বুলো লাবণ্যের কোলে উঠিতে চাহিত, কিন্তু লাবণ্য তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিত না। পাছে স্বামীর পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়, সেইজন্য হৈমবতী এ সকল বিষয়ে তাঁহাকে কিছুই জানিতে দিত না। নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করিত। পিতাকেও এ সব বিষয়ে কিছুই লিখিত না। পথের ভিখারিনী হইলেও নিজের কষ্ট জানাইয়া পিতার মনে কষ্ট দিবে, হৈমবতীর এমন প্রকৃতিই ছিল না।

লাবণ্য হৈমবতীকে জব্দ করিবার জন্য যখন বুলোরও দুধের ভাগ কমাইয়া দিতে আরম্ভ করিল, তখন হৈমবতী স্বামীকে এ সকল বিষয়ে আর না-জানাইয়া থাকিতে পারিল না। বিপিন শুনিয়া মর্মান্তিক ব্যথিত হইল, কিন্তু সে আর কি করিবে, তাহার কি ক্ষমতা—পরের অনুগ্রহে তাহার জীবনযাপন! সে কিছুই বলিল না, কেবল অক্ষমের চিরসম্বল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, এবং মনে-মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকিবে না—ফার্স্টআর্টস পাশ করিলেই কোনও উপায়ে একটা চাকরির জোগাড় করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া আলাদা হইয়া থাকিবে।

লাবণ্য স্বামীর নিকট হৈমবতীর নামে রাতদিন অভিযোগ আরম্ভ করিল। হেমচন্দ্র তাহাতে বড়-একটা কান দিত না। কিন্তু বহুকাল ধরিয়া ঝড়-বৃষ্টির উপর্যুপরি আঘাতে বৃহৎ অট্টালিকাও ভূমিসাৎ হইয়া যায়—লাবণ্য জপাইতে-জপাইতে ক্রমে হেমচন্দ্রের মন ভগ্নীর বিরুদ্ধে ফিরাইয়া লইল, এবং শেষে এমনি একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে হেমচন্দ্র রীতিমত ভগ্নীদ্বেষী হইয়া দাঁড়াইল।

একদিন রাত্রে হেমচন্দ্র আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে আসিলে লাবণ্য চক্ষু মুছিতে-মুছিতে আসিয়া কহিল,—"ওগো, শুনেছ, পাশের বাড়ির মতি হালদার তার স্ত্রীকে বলেছে,—কর্তা উইলে অর্ধেক বিষয় ঠাকুরঝির নামে লিখে দিয়েছেন। এই একটু আগে হালদারের স্ত্রী এসে আমাকে বলে গেল। তা হলে আমরা দাঁড়াই কোথায় বলো!" শুনিয়া হেমচন্দ্র শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাড়াইল,—"বল কি, সত্যি নাকি!" মুহূর্তমধ্যে তাহার অন্তর হইতে স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা, সমস্ত অন্তর্হিত হইয়া গেল—হৈমবতী তাহার পরম শত্রু, এবং যে কোনও উপায়ে তাহার প্রতিশোধ লইতে হইবে, ইহাই তাহার মনে জাগিতে লাগিল। মনে-মনে ধিক্কার দিতে লাগিল,—এত দিন কেন সে লাবণ্যের কথা শুনে নাই। রাত্রে ঘুম হইল না।

পরদিন ভোর না হইতে-হইতে সরকারকে ডাকিয়া হেমচন্দ্র বলিয়া দিল,—"আমার

বিনা' অনুমতিতে বিপিন কিংবা হৈমবতীকে একপয়সাও দিবে না—যদি দাও, তৎক্ষণাৎ তোমায় দূর করিয়া দিব।" তাহার পর হেমচন্দ্র বিপিনের মাষ্টারকে ছাড়াইয়া দিল, তাহার পকেট-খরচা বন্ধ করিয়া দিল, এবং পিতাকে চিঠি লিখিল—কুসংসর্গে পড়িয়া বিপিন মাটি হইয়া যাইতেছে— পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, কাহারও কথা শোনে না; মদ্যপান অভ্যাস করিয়াছে। এই সকল কারণে তাহার পকেট-খরচা বন্ধ করিয়া দিয়াছি; ইত্যাদি। উত্তরে বৃদ্ধ হরশঙ্কর লিখিলেন,—"হেমচন্দ্র, জামাতার কথা শুনিয়া যে পর্যন্ত দুঃখিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। আমি তো এক্ষণে মৃত বলিলেই হয়,—তোমার উপর সমস্ত ভার দিয়াছি। তুমিই আমার স্থানীয়। যাহাতে বিপিন সৎপথে আইসে, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। দেখিও, অতি সাবধানে বিবেচনাপূর্বক স্নেহের সহিত সকল কার্য করিবে। হৈমবতী কিংবা জামাতার মনে যাহাতে কষ্ট হয়, এমন কার্য কখনও করিও না।" হৈমবতী, বিপিন, কাহাকেও কিন্তু বৃদ্ধ এ-সকল বিষয়ে কিছু লিখিলেন না।

হেমচন্দ্র যখন সমস্ত খরচ বন্ধ করিয়া দিল, হৈমবতী তখন আপনার গহনা বিক্রয় করিয়া আবশ্যক খরচপত্র চালাইতে লাগিল। ক্রমে সব নিঃশেষ হইয়া আসিল।

একদিন অপরাহ্নে বিপিনচন্দ্র কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিলে, হৈমবতী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—"আমার বুলোর গা যেন আগুনের মতো তাতিয়াছে—সারাক্ষণ সে কাঁদিয়া খুন হইতেছে, মাথা চালাইতেছে,—বরফ আনিতে বলো, যাও শীঘ্র ছুটিয়া ডাক্তারকে লইয়া আইস।" শুনিয়া বিপিনের রক্ত জল হইয়া গেল। ডাক্তারের ভিজিটের টাকা কোথায় পাইবে,—কাহাকে কি বলিবে, কে তাহার কথা শুনিবে! হৈমবতী তাড়াতাড়ি অবশিষ্ট কানের ফুল দুইটি খুলিয়া স্বামীর হাতে দিল। ঘরের মধ্যে কালেজের বইগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চটি-জুতা পায়ে বিপিন পাগলের মতো ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কানের ফুল দুইটি এক জায়গায় পঞ্চমুদ্রায় বাঁধা দিয়া ডাক্তারের গৃহমুখে তীরবেগে চলিল।

দেখিতে-দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। রাস্তায় একে-একে গ্যাসের আলো জ্বালাইয়া দিল। আকাশে তারার আলো ফুটিয়া উঠিল। শহরের রাস্তা—কোথাও ব্যান্ড বাজাইয়া বরযাত্রী খুব সমারোহে বাহির হইয়াছে; কোথাও পাঁচ ইয়ারে মিলিয়া গলা ধরাধরি করিয়া হাস্যকলরবে চলিয়াছে; কোথাও গৃহপ্রকোষ্ঠ হইতে সঙ্গীতধ্বনি মুখরিত হইতেছে; কোথাও আটচালার মধ্যে কেহ ভোজবাজির তামাসা দেখাইতেছে; প্রতি পদক্ষেপে প্রতি মুহূর্তে নব-নব দৃশ্যপট। কিন্তু বিপিনের চক্ষের সম্মুখে সকলই ভাসিয়া গেল; সে দেখিয়াও কিছু দেখিতে পাইল না। তাহার মনে শুধু জাগিতেছে আপনার দারিদ্র্য ও প্রিয়তম পুত্র বুলোর অসুখের কথা। সে একমনে কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া চলিয়াছে।

দৌড়াইয়া-দৌড়াইয়া প্রায় একঘণ্টা পরে বিপিন ডাক্তারের বাড়ি আসিয়া পঁহুছিল! আসিয়া শুনিল, ডাক্তারবাবু বাড়ি নাই, রোগী দেখিতে বাহির হইয়াছেন, কখন ফিরিবেন, তাহার ঠিক নাই। হতশ্বাস হইয়া বিপিন ডাক্তারের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। এই ডাক্তারের উপর বিপিনের প্রগাঢ় বিশ্বাস; ইনিই তাহাদের বাড়ির সকলকে দেখিতেন। যত দেরি হইতে লাগিল,—কালো মেঘের ন্যায় একটার পর একটা ভাবনা আসিয়া বিপিনের হৃদয়-আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল,—একেলা হৈমবতী ছেলেটিকে লইয়া না জানি কি করিতেছে, বিনি চিকিৎসায় ছেলেটি বুঝি মারা গেল। বিপিন একবার ওঠে, একবার বসে; গাড়ির শব্দ শুনিলেই বাহির হইয়া আইসে। রাত্রি নয়টার পর ডাক্তার বাড়ি ফিরিলেন। বিপিন ডাক্তারকে

সবিশেষ জানাইল। তিনি কহিলেন, "আমি এইমাত্র আসিয়াছি, আহারাদি করিয়া খানিক পরে যাইব।" বিপিন কাঁদিতে-কাঁদিতে তাঁহার পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ডাক্তারমহাশয়, আপনার দুটি পায়ে পড়ি দয়া করে একবারটি চলুন—বুলো যায়-যায়।" ডাক্তার অগত্যা বিপিনের সঙ্গে চলিলেন।

ডাক্তারকে লইয়া বিপিন যখন বাড়ি ফিরিল, তখন সকলে আলো নিবাইয়া যে যার ঘরে গিয়া শয়ন করিয়াছে। কেবল হৈমবতী একলা পুত্রের শিয়রে বসিয়া আছে। বাড়িতে ঢুকিয়া বিপিনের গা ছমছম করিতে লাগিল।

রোগীকে দেখিয়া ডাক্তার বাহিরে আসিয়া বিপিনকে কহিলেন, "অবস্থা বড় ভালো দেখিলাম না, এই ঔষধ লিখিয়া দিতেছি—দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। আর সমস্তক্ষণ মাথায় বরফ ঘষিয়া দিবে।" এই বলিয়া প্রেসক্রিপশন্ করিয়া পকেটে চারিটি মুদ্রা পুরিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

প্রেস্‌ক্রিপসন্‌টি হাতে করিয়া বিপিন অন্ধকারে আস্তে-আস্তে সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিয়া আসিয়া সরকারকে উঠাইয়া কহিল, "সরকারমশায়, বুলো যায়-যায়, দুইটি টাকা দিয়া দয়া করে' এই ওষুধটি আনাইয়া দাও—আমি যেমন করে পারি, কাল তোমাকে টাকা ফিরাইয়া দিব। তোমায় জোড় হাত করি এইটে করো।" সরকারমশায় দুইটি চক্ষু মুছিতে-মুছিতে রুক্ষস্বরে উত্তর করিল, "আমি টাকা পাব কোথায়? ঘর থেকে কি এনে দেব! বাবু একপয়সাও দিতে বারণ করেছেন, আমি কিছুই দিতে পারব না। তোমার জন্য আমি কি শেষে চাকরি খোয়াব!" শুনিয়া সমস্ত রক্ত বিপিনের মাথায় উঠিয়া গেল। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া সে কাঁপিতে-কাঁপিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "পাষণ্ড, নির্মম, তুই কুকুরের অধম।" গোলমাল শুনিয়া হেমচন্দ্রের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি নিচে নামিয়া আসিলে সরকার তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া দিল। শুনিয়া হেমচন্দ্র বিপিনকে যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া গালি দিল। উত্তরে বিপিনও হেমচন্দ্রকে কড়া-কড়া কথা শুনাইয়া দিল। তখন হেমচন্দ্র বিপিনের ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিল, এবং দরোয়ানকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, বিপিনকে যেন কখনও বাড়িতে ঢুকিতে দেওয়া না হয়।

সেই রাত্রির শেষে দুই-একবার "বাবা-বাবা" বলিয়া ডাকিয়া বুলো মায়ের কোলে চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

অনাহারে, পুত্রশোকে, স্বামীর ভাবনায় মৃতপ্রায় হইয়া হৈমবতী দুই মাস কাটাইল।

ইহার মধ্যে একদিনও বিপিন বাড়িতে আসে নাই। তবে পাশের বাড়ির মতি হালদার একদিন দ্বিপ্রহর রাত্রে তাহাকে হরশঙ্করের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। প্রায় আধঘণ্টা হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে কি বকিতে-বকিতে চলিয়া গেল।

হৈমবতী মনে-মনে ঠিক করিল, আর একমাস দেখিয়া তবে পিতাকে সংবাদ দিবে।

একদিন সকাল বেলায় কাশীর বাড়ির রকের উপর বসিয়া বৃদ্ধ হরশঙ্কর তামাক খাইতে খাইতে বাড়ির কথা ভাবিতেছিলেন, এমনসময়ে পুলিশের সাবইন্সপেক্টর একটি লোককে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। কহিল, "মশায়, এই লোকটিকে কি চিনিতে পারেন? ইনি বিনা টিকিটে কেমন করিয়া কলিকাতা হইতে বেনারস আসিয়াছেন।

স্টেশনে ইহার নিকট টিকিট চাহিলে ইনি পকেট হইতে একটি দেশলায়ের বাক্স বাহির করিয়া দেন। পুলিশে ইঁহাকে ধরে। একজন ভদ্রলোক বলিলেন যে, 'ইনি হরশঙ্কর বাবুর জামাতা'—তাই ইনস্পেক্টরবাবু আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

শুনিয়া হরশঙ্কর কাঁপিতে-কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুলিশ কর্তৃক আনীত লোকটির মুখের কাছে মুখ আনিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষে অনেকক্ষণ তাকাইয়া-তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ, একি! বিপিন! এমন বেশ, এমন চেহারা কেন! কি হইয়াছে? বাড়ির সব ভালো তো? হৈমবতী, বুলো ভালো তো!" পাছে শোক না সহ্য করিতে পারেন, তাই বুলোর মৃত্যুর কথা তাঁহাকে কেহ শুনায় নাই। বিপিন বৃদ্ধের মুখের পানে প্রায় পনেরো মিনিট হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া উত্তর করিল, "বুলো, ওষুধ।"

হরশঙ্করের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, বিপিনের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

টিকিটের দাম দিয়া হরশঙ্কর পুলিশের লোককে বিদায় করিয়া দিলেন। তাহার পর বিপিনকে ভালো করিয়া তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া খাওয়াইলেন। বুড়ার আর সে দিন খাওয়া হইল না। সমস্তক্ষণ জামাতাকে কাছে লইয়া বসিয়া রহিলেন।

হরশঙ্কর বিপিনকে যাহা জিজ্ঞাসা করেন, তাহারই উত্তরে সে বলে, "বুলো, ওষুধ," বৃদ্ধ বিপিনের হঠাৎ এরূপ হইবার কারণ কিছু ঠিক করিযা উঠিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন, হয়তো মদ খাইয়া মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে; আবার ভাবিলেন, না, তাহা নহে। ঠিক খবর জানিবার জন্য তিনি মতি হালদারকে চিঠি লিখিলেন। উত্তরে মতি হালদার বুলোর মৃত্যুসংবাদ, হেমচন্দ্র কর্তৃক বিপিনের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হওয়া, সকলি খুলিয়া লিখিল।

চিঠি পাইয়া হরশঙ্কর শয্যাশায়ী হইলেন, আর উঠিবার ক্ষমতা রহিল না। দুই-একদিন পরে কোন-একটি নিকট আত্মীয়কে কলিকাতা হইতে ডাকাইয়া পাঠাইয়া তাঁহার উপর সংসারের সমস্ত ভার দিয়া, বিপিনকে তাঁহার সঙ্গে বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন। আত্মীয়টিকে মাসিক একশত টাকা বেতনে ম্যানেজার স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন। হেমচন্দ্রকে লিখিলেন, "তুমি আমার ত্যাজ্যপুত্র হইলে, তোমার আর মুখ দেখিতে চাহি না। বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত হইতে তুমি বঞ্চিত হইলে। উইলে সমস্তই হৈমবতীকে দিলাম।" সত্য-সত্যই এক উইল করিয়া সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হৈমবতীর নামে লিখিয়া দিলেন। একটা বাক্সে পুরিয়া উইলটা হৈমবতীর কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধের আর বেশি দিন সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না। একমাস যাইতে না-যাইতে তাঁহার কাশীলাভ হইল।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

বিপিন যখন বাড়ি আসিয়া পঁহুছিল, তাহাকে দেখিয়া হৈমবতী মূর্ছিত হইয়া পড়িল। পরে যখন সংজ্ঞালাভ হইল, ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিয়া-কাঁদিয়া মনের ভার যখন ঈষৎ লঘু হইল, উঠিয়া স্বামীর নিকট গিয়া বসিল। তাঁহার সেই মলিন রেখাঙ্কিত মুখ, অস্থিপঞ্জরসার দেহ, অর্থহীন চাহনি দেখিয়া হৈমবতীর প্রাণ ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। বিপিন অনেকক্ষণ একদৃষ্টে হৈমবতীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, যেন সে সকলই বুঝিতে পারিতেছে, কি বলিতে চাহে, কিন্তু বলিতে পারিতেছে না। অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, "বুলো, ওষুধ" বলিয়া

চিৎকার করিয়া উঠিল। হৈমবতী আর আপনাকে রাখিতে পারিল না। স্বামীর পদতলে লুটিয়া পড়িয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইল।

দিনের পর দিন যায়। মনের কষ্ট চাপিয়া হৈমবতী স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার পর আপনার ঘরে বসিয়া হৈমবতী অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছে, এমন সময়ে হেমচন্দ্র আস্তে-আস্তে তাহার কাছে আসিয়া বসিল। দেখিল, হৈমবতী কাঁদিতেছে। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া হেমচন্দ্র বলিল, "হৈম, না-বুঝিয়া অনেক দোষ করেছি, মাপ কর। বাবা তোকেই সর্বস্ব দিয়ে গেছেন—আমাদের দাঁড়াবার স্থান নেই, আমাদের জন্যে কি কিছু সংস্থান করবিনে?" হৈম চক্ষু মুছিয়া কহিল, "দাদা, আমার আর কে আছে! বাবা ছিলেন তিনি গেলেন, বুলো বিনি চিকিৎসায় চলে গেল, স্বামীর তো এই অবস্থা। সকলি তো জলাঞ্জলি দিয়াছি, বিষয় লইয়া আর কি করিব? ওর খোরাক-পোষাক-চিকিৎসার জন্য লেখাপড়া করে একটা ভালো বন্দোবস্ত করে দাও; আমি সকলি তোমাকে দিতেছি।" এই বলিয়া বাক্স হইতে উইল বাহির করিযা হেমচন্দ্রের হাতে দিয়া বলিল, "এই উইল ছিঁড়িয়া ফেল, তা হলেই তো বিষয়সম্পত্তি তোমার হইল।"

ভগ্নীর নিঃস্বার্থপরতা দেখিয়া হেমচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

হৈমবতী সকলে জলাঞ্জলি দিয়া শেষে কিছুদিন পরে রোগশয্যায় আপনাকেও জলাঞ্জলি দিল।

৯ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩০৫



তীর্থের পথে

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

মহামায়া বলিল, "তুমি মর।"

যোগমায়া বলিল, "আমি তো অনেকদিন মরিয়াছি। আজ তোর কথায় নূতন করিয়া মরিতে পারিব না।"

মহামায়া বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীর কন্যা। সে তাহার স্বামী রামদয়াল ঘোষালের সহিত রুগ্ন পিতাকে দেখিতে আসিয়াছিল।

যোগমায়া বিশ্বেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্রী। সে বিধবা। বিশ্বেশ্বরের পরিবারে থাকিয়াই সে ব্রহ্মচর্যপালন করিতেছিল।

মহামায়ার বয়স উনিশ, যোগমায়া তাহার অপেক্ষা তিন বৎসবের বড় হইবে। মহামায়া সুন্দরী, যৌবনের উচ্ছ্বলিত তরঙ্গে তাহার রূপরাশি তরঙ্গিত হইতেছিল। মহামায়ার রূপের গাঙে ভরা জোয়ার। আর বালবিধবা যোগমায়াকে রূপসী বলিলে হয়তো সঙ্গত হইবে না। কিন্তু তাহার চঞ্চল নয়নের দিকে চাহিলে দৃষ্টি সহজে ফিরিতে চাহিত না। মহামায়ার যৌবনে এখনও ভাটা পড়ে নাই। কিন্তু যোগমায়ার মতো তাহার ভরা জোয়ারও নয়; বরং তটপ্লাবিনী খর-বাহিণী বন্যার সহিত তাহার অধিকতর সাদৃশ্য ছিল।

আকৃতির ন্যায় উভয়ের প্রকৃতিও অত্যন্ত বিভিন্ন ছিল। মহামায়া গম্ভীর, স্থির, ধীর, আপনাতে আপনি নিমগ্ন। যোগমায়া চঞ্চল, অস্থির, অধীর, আপনার বিফলতায় আপনি অসন্তুষ্ট। বৈধব্যচিহ্নের সহিত, তাহার রূপের সহিত, এই চাঞ্চল্য শোভা পাইত না। পক্ষান্তরে মহামায়ার সৌন্দর্য যেন এই যৌবনসুলভ চাঞ্চল্যের অভাবে প্রাণহীন হইয়া থাকিত। মহামায়ার সৌন্দর্য মলিন; যোগমায়ার রূপেও বিশেষত্ব ছিল না। কিন্তু হৃদয়ের কোনও আবেগ, উচ্ছ্বাস যখন সহসা যোগমায়ার মুখে প্রতিবিম্বিত হইত, তখন তাহা মুহূর্তের মধ্যে সূর্যকরসমুজ্জ্বল শিশিরবিন্দুর মতো মনোহর শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

দুই ভগিনীতে কথা হইতেছিল। মহামায়া স্থির, অচঞ্চল। অপরা অস্থির, চঞ্চল—সমীরসংক্ষুব্ধ তটিনীর মতো আপনার চাঞ্চল্যে আপনি কম্পিত তরঙ্গিত হইতেছিল।

মহামায়া বলিল, "আমার জন্য বলিতেছি না; এখনও বুঝিয়া দেখ।"

যোগমায়া বলিল, "আমি তোমার নিধি কাড়িয়া লইব না!"

মহামায়ার মুখে তাহার হৃদয়ভাব অনুসন্ধান করিলে কেহ বুঝিতে পারিত না, সে ক্রুদ্ধ, বিষণ্ন, না বিরক্ত। কিন্তু যোগমায়ার হাস্যকিরণদীপ্ত মুখে-চোখে কৌতুক উচ্ছলিত হইতেছিল।

যোগমায়া বলিল, "তুই সাবধানে পাহারা দিস, নহিলে আমি চুরি করিব।"

মহামায়া বলিল, "চুরি করিয়া কোথায় বমাল রাখিবি? আমার জিনিস আমারই থাকিবে, তোর অদৃষ্টে কেবল তোর অপবাদ—"

যোগমায়া বলিল, "সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে।"

অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিয়া যোগমায়া চাহিয়া দেখিল, রামদয়াল সেই দিকে আসিতেছে। সে ছুটিয়া পলাইল।

রামদয়াল সন্নিহিত হইলে মহামায়া বলিল, "তুমি বাড়ি যাও। রামদয়াল দেখিল,

মেঘমেদুর অম্বরে সন্ধ্যার অন্ধকারের মতো মহামায়ার গম্ভীর মুখে কিসের ছায়া; —তাহা উদ্বেগের না আশঙ্কার, তাহা সে ভালো বুঝিতে পারিল না। কখনও সে তা পারিত না। রামদয়াল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

মহামায়া বলিল, "দুজনে ঘরসংসার ছাড়িয়া কত দিন এখানে থাকিব? বাবাকে ফেলিয়া আমি তো যাইতে পারিব না, তুমি যাও।"

রামদয়াল বলিল, "তা কি হয়? তোমাকে রাখিয়া, রুগ্ন শ্বশুরকে ফেলিয়া চলিয়া গেলে লোকে কি বলিবে?"

মহামায়ার মুখে-চোখে একটু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। সে হাসি শরতের শুভ্র মেঘের বিদ্যুতের মতো ক্ষণিক ও ক্ষীণ, কিন্তু বর্ষার বিদ্যুতের মতো তীব্র। রামদয়াল কিছু বুঝিতে পারিল না। সে গত কয়েক দিবস হইতে কেমন অন্যমনস্ক হইয়াছিল, আপনাকে আপনি বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার উপর, মহামায়ার এই প্রহেলিকা দেখিয়া একটু অবাক হইয়া আবার অন্যমনস্ক হইতেছিল। এমন সময়ে মহামায়ার কণ্ঠ শুনিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল।

মহামায়ার কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছিল, "লোকে কি বলিবে—তাই ভাবিয়া তো তোমার ঘুম হয় না; যোগমায়া কি বলিবে,—তাই—"

ঘনঘটনাচ্ছন্ন দুর্যোগে, ঘোর নিশীথের গাঢ় অন্ধকারে, মুক্ত প্রান্তরে দূরে সহসা বজ্রপাত হইলে পথিক যেমন বজ্রশব্দে চমকিয়া উঠে, আর চপলার চকিত আলোকে পলকের মধ্যে তাহার উদভ্রান্ত নয়নের সমক্ষে এক মুহূর্তের জন্য প্রলয়ঙ্করী প্রকৃতির মূর্তি উদ্ভাসিত হয় মহামায়ার এই কটি কথা শুনিয়া রামদয়াল তেমনই চকিত হইয়া উঠিল, মহামায়ার কণ্ঠোচ্চারিত যোগমায়ার নামে সহসা তাহার জীবনপথের সম্মুখে এক অদৃষ্টপূর্ব অস্পষ্ট ছবির আভাস দেখিতে পাইল!

রামদয়াল আত্মস্থ হইবার পূর্বেই মহামায়া সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। রামদয়াল চাহিয়া দেখিল, মহামায়া দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহার চর্মচক্ষুর উপর এই প্রকৃত দৃশ্য বিদ্যমান থাকিলেও ইন্দ্রজালমুগ্ধের ন্যায় সে এক নূতন ছবি দেখিতেছিল! তাহাকে আসিতে দেখিয়া যোগমায়া যখন ছুটিয়া পলায়, তখন রামদয়াল তাহা দেখিয়াও দেখে নাই; ইহাও সম্পূর্ণ সত্য, তাহা যে দেখিবার মতো, তাহাও রামদয়ালের মনে হয় নাই। কিন্তু এখন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, পলায়মানা অসম্বৃতকেশবাসা যোগমায়ার চিরপরিচিত মূর্তি নিতান্ত নবপরিচিতের মতো, নিত্যনূতনের মতো, তাহার নয়নপটে অনবরত প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিল। রামদয়াল, ইতিপূর্বে, মহামায়ার সহিত এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই, এখন তাহা নিতান্ত কঠোর সত্যে পরিণত হইল। মহামায়ার চিরপরিচিত কণ্ঠস্বরে জাগিয়া সে দেখিল, তাহার হৃদয়ের সিংহাসন শূন্য, সেখানে মহামায়া নাই। আর একজন বিনা আহ্বানে, অজ্ঞাতসারে, মহামায়ার শূন্য সিংহাসন কখন অধিকার করিয়াছে। সে বিস্মিত, বিরক্ত, বিচলিত হইল বটে, কিন্তু কি করিবে, স্থির করিতে পারিল না।

একবার মনে করিল, চলিয়া যাই। কিন্তু তাহা সঙ্গত মনে হইল না। পীড়িত শ্বশুরকে ত্যাগ করিয়া যাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বৃদ্ধের আর কেহ ছিল না; বিষয়াশয়ের কি বন্দোবস্ত হয়, তাহাও দ্রষ্টব্য বটে।

কিন্তু এ দিকে? রামদয়াল ভাবিল, এ হয়তো স্বপ্ন। এ হয়তো ক্ষণিক। এই মরীচিকায় আমি কি সত্যই মুগ্ধ হইব?

রামদয়াল আপনার মনে আপনার মনের মতো বিবিধ যুক্তির রচনা করিল। শেষে সিদ্ধান্ত করিল, একদিকে সম্ভাবনা, অন্য দিকে কর্তব্য। সম্ভাবনার ভয়ে কর্তব্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব কেন? মন কি এত লঘু? জীবন কি এত অসাব? সংযম কি এত কঠোর? মানসিক ব্যাধি কি তে দুঃসাধ্য? তাই যদি হয়, আজ না হয় পলাইয়া বাঁচিলাম; কাল? পৃথিবীতে কোথায় প্রলোভন নাই? কোথায় গিয়া নিশ্চিন্ত হইব?

এই সব তর্কজালের অন্তরালে যে যোগমায়া লুকাইয়াছিল; তাহার কামনা, তাহার দর্শনলালসাই যে রামদয়ালের কর্তব্যবুদ্ধিকে এতটা উৎসাহিত করিতে ছিল; যে আত্মসংযমের ভরসায় নির্ভর করিয়া সে আত্মজয়ের আশা করিতেছিল, তাহাই যে অসংযমের নামান্তর; তাহা রামদয়াল বুঝিতে পারিল না।

মহামায়া বুঝিল, কিন্তু উপায় ছিল না। যোগমায়া বুঝিল, কিন্তু ফিরিতে পারিল না। রামদয়াল বুঝিযাও বুঝিল না, আপনাকে আপনি বঞ্চনা করিল। ফলে কিন্তু মরিল মহামায়া।

মুমূর্ষুব অন্তিম-শয্যায়, মৃত্যুচ্ছায়ার আলো-আঁধারে, পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া-চাহিযা তিন জনের কেহ অবসন্ন হইত না। আশায়-নিরাশায, সংশয়ে-যাতনায়, শঙ্কায়-ভাবনায় তিন জনের হৃদয় মথিত হইতেছিল; তিন জনেই নীরবে স্রোতে ভাসিয়া চলিল, কেহ আর কিছু ভাবিল না। যোগমায়ার চঞ্চলতা কোথায় গেল? তাহার কামনা-পূর্ণ হৃদয় এখন নিস্তরঙ্গ। সেই চঞ্চল নয়ন এখন প্রশান্ত, তাহাতে আর কৌতুকের রশ্মি নাই। সে হাস্যদ্যুতি কোথায় অন্তর্হিত হইল? অতৃপ্তিব চাঞ্চল্য গেল, কিন্তু তৃপ্তির সে সান্ত্বনা, সে শান্তি কই? তবু এই পরিবর্তনে যোগমায়া যেন সম্পূর্ণতা লাভ করিল।

মহামায়াও স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য হারাইল। তাহার সৌন্দর্যের সহিত গাম্ভীর্যেব যে অসঙ্গতি ছিল, তাহা দূব হইল। মহামায়া এখন প্রায় হাসে, সময়ে-সময়ে হাসিয়া আকুল হয়, কেন? জীবনের পবিপূর্ণ তৃপ্তি হারাইয়া সে চঞ্চল হইতেছিল। জীবনের নিষ্ঠুবতায় দলিত, পিষ্ট, ব্যথিত হইয়াও সে প্রতিজ্ঞা করিল, সুখ যায় যাক, শান্তি ছাড়িব না।

আপনার ঘর পুড়িতে দেখিয়া যে নিকটে দাঁড়াইয়া হাসে, সে জানে, দু-দশ কলসী জলে এ আগুন নিভিবে না! তবু না-কাঁদিয়া সে হাসে কেন? হায় বিড়ম্বনা!

॥ ৪ ॥

একদিন মুমূর্ষু পিতার শিয়রে বসিয়া মহামায়া ঢুলিতেছিল।—আর জাগিয়া থাকিতে পারে না। মনে করিল, হয় রামদয়ালকে নয় যোগমায়াকে ডাকিয়া দিযা নিজে একটু ঘুমাইবে। মহামায়া ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় গেল। রামদয়ালের ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিল, গৃহমধ্যে অন্ধকার। কথোপকথনের মৃদু অস্পষ্ট শব্দ মহামায়ার কানে আসিতেছিল। নীরবে দ্বারে হাত দিল। বুঝিল, দ্বার মুক্ত। দরজা একটু মুক্ত করিয়া দেখিল, ঘোর অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ক্রমে সেই অন্ধকারে দেখিল, গৃহমধ্যে যোগমায়া ও রামদয়াল। মহামায়া না দেখিলেও তাহা বুঝিতে পারিত। তবু দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া দেখিল। সেই গাঢ় অন্ধকার তাহার চক্ষে গাঢ়তম হইয়া আসিতেছিল। অনেক কষ্টে সে আত্মসংবরণ কবিবার চেষ্টা করিল। তাহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া

উঠিল। মহামায়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিল। সহসা মহামায়ার অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "বেশ!"

গৃহমধ্যে কণ্ঠস্বর নীরব হইল। মহামায়া ধীরে-ধীরে ফিরিয়া পিতার শয্যাতলে আসিয়া বসিল। তাহার শিরায়-শিরায় আগুন জ্বলিতেছিল;—নয়নের সমস্ত অশ্রু ঢালিয়াও তাহার জ্বালা ভুলিতে পারিল না।

মহামায়া সুপ্ত না জাগরিত, তাহা আপনিই বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার একবার মনে হইল, সোপানে কাহার পদশব্দ। তাহার পর যেন শুনিতে পাইল, কে ধীরে-ধীরে সদর-দরজা উন্মুক্ত করিল! সে স্বপ্নোত্থিতের মতো উঠিয়া বসিল; ধীরে-ধীরে প্রদীপ হইতে একটি শলিতা জ্বালিয়া লইয়া পার্শ্বের গৃহের দ্বারে গিয়া দেখিল, দ্বার মুক্ত। কম্পিতহস্তে শলিতাটি ধরিয়া ভিতরে চাহিল, সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সোপানমূলে আসিয়া দাঁড়াইল, এই সময়ে তমোময়ী যামিনীর দীর্ঘনিশ্বাসের মতো সহসাগত পবনবেগে শলিতাটি নিভিয়া গেল। অন্ধকারে প্রাচীর ধরিয়া সে নিচে নামিল; —অন্ধকারে বাহির-দরজার দিকে যাইতে লাগিল। একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল, সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া উন্মুক্তদ্বারপথে একাদশীর চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়াছে, সম্মুখে অনন্তপ্রসারিত নক্ষত্রভূষিত গগনের কিয়দংশ, আর তাহার নিম্নে আলোক ও আঁধারে অস্পষ্ট গ্রামপথ।

মহামায়া আর দাঁড়াইতে পারিল না, ছিন্ন ব্রততীর ন্যায় ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

একবার মনে করিল এ যাতনা সহি কেন? মরিলে তো জুড়াইতে পারি। কিন্তু তাহা হইলে পীড়িত পিতার কি হইবে? আবার ভাবিল, আর-একবার না দেখিয়া মরিব? কিন্তু আর কি দেখা পাব?

তাহার পর ধীরে-ধীরে উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল,—কৃতাঞ্জলি হইয়া ঊর্ধ্বমুখে কহিল, "যাও,—মরিবার আগে আর একবার তোমায় দেখিতে ইচ্ছা করে!"

॥ ৫ ॥

এগারো বৎসর অতীত হইয়াছে। স্বামিপরিত্যক্তা, পিতৃহীনা মহামায়া এই কয় বৎসর শোকে দগ্ধ ও দুঃখে জীর্ণ হইয়াও বাঁচিয়া আছে। সংসারে তাহার কোনও অবলম্বন ছিল না, বন্ধন ছিল না। কেবল এক আশাবৃন্তে তাহার জীবনকুসুম সন্নদ্ধ হইয়াছিল; —মরিবার আগে অভাগীর অদৃষ্টে কি একবার তাঁহার চরণদর্শন ঘটিবে না?

এই সময়ে গ্রামে একজন পুরুষোত্তমের সেথো উপস্থিত হইল। গ্রামে-গ্রামে কোলাহল পড়িয়া গেল। সন্নিহিত সাত-আটখানি গ্রামের নরনারী মিলিয়া পুরুষোত্তমতীর্থে দারুব্রহ্ম-দর্শনে যাত্রা করিল।

মহামায়াও তাহাদের সঙ্গী হইল। মনে-মনে ভাবিল, তাঁহার দর্শন পাইলাম না, ঠাকুরের চরণ পাইব কি?

॥ ৬ ॥

দূর পথ। যাত্রীর দল পদব্রজে যাত্রা করিল। ক্রমে তাহারা মেদিনীপুর পার হইয়া উৎকলের সীমায় প্রবেশ করিল।

যাত্রার দশ দিন পরে যাত্রীর দল একটি চটীতে উপস্থিত হইল। রথের যাত্রী

চলিয়াছে। পথে জনতার সংখ্যা হয় না। মহামায়ার গ্রামস্থ যাত্রীর দল যখন রাসপুরের চটীতে পঁহুছিল, তখন সেখানে বিসূচিকা বড় প্রবল। তীর্থযাত্রীর মৃতদেহে ক্ষুদ্র গ্রাম পরিপূর্ণ। পথের ধারে, প্রান্তরে, বৃক্ষতলে, সরোবরতীরে, সর্বত্র-মৃতদেহ। কেহ বা অর্ধমৃত, সঙ্গীরা ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। এ পথে কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। দলের কেহ পীড়িত হইলে ফেলিয়া রাখিয়া যায়। পরিত্যক্ত হতভাগ্য অভীষ্ট তীর্থের পথেই পরম ও চরম তীর্থে চলিয়া যায়।

চটীতে স্থানাভাব। অনেক কষ্টে সন্ধ্যার পর একটি দোকানে মহামায়ার দলস্থ সকলে আশ্রয় লইলেন।

সেই দিন মধ্যরাত্রে সেই দোকানে পূর্বাগত যাত্রীর দলের একজন পুরুষ বিসূচিকায় আক্রান্ত হইল। মহামায়ার গ্রামের দল ভয়ে চটী পরিত্যাগ করিয়া সেই রাত্রেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল।

সকলে বাহিরে সমবেত হইলে দেখা গেল, মহামায়া দলে নাই।

বৃদ্ধ রামহরি চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "মহামায়া কই? মহামায়া!"

একজন বলিল,—"সে চটীতে পড়িয়া আছে, তাহার উঠিবার শক্তি নাই। তাহাকেও রোগে ধরিয়াছে।"

এ পথের এই দস্তুর। কোন্ পথেই বা নয়? আপনাকে বিপন্ন করিয়া কে পরের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিবে? যাত্রীর দল চলিয়া গেল। মহামায়া—একাকিনী, অসহায়া, মরণাহতা, সেই চটীতে পড়িয়া রহিল।

চটীর একপ্রান্তে মহামায়া ও অন্য প্রান্তে অপর দলের সেই রুগ্ন যাত্রী—উভয়েরই জীবনবন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছিল। মহামায়াকে দেখিবার কেহ ছিল না, কিন্তু এক বর্ষীয়সী রমণী রোগাক্রান্ত পুরুষের সুশ্রূষায় নিরত ছিল। অপরিচিতার কি প্রাণের ভয় নাই? অথবা যে মৃত্যুশয্যায়, সে ইহার প্রাণাধিক?

মহামায়া যাতনায় অস্থির হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার কাতর স্বরে আকৃষ্ট হইয়া অপরিচিতা প্রদীপহস্তে তাহার শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইল, মহামায়ার মুখের দিকে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। ধীরে-ধীরে পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "তোমার অদৃষ্টে জগন্নাথদর্শন নাই।"

মহামায়া বলিল, "তাহাতে দুঃখ নাই। মরণেও দুঃখ নাই। কিন্তু তাঁহাকে না দেখিয়া—"

অপরিচিতা বলিল,—"কাহাকে? মরণেও যদি দুঃখ নাই। তবে তোমার এ দুঃখ কিসের?"

"বড় অহঙ্কার করিয়া বড় আশায় বুক বাঁধিয়াছিলাম, মরিবার আগে তাঁহার পদধূলি লইয়া মরিব। মরি, তাতে দুঃখ নাই। তাঁহাকে দেখিয়া মরিলাম কই?"

অপরিচিতা প্রদীপ রাখিয়া মহামায়াকে তুলিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। তখন সে মহামায়ার শয্যা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

মহামায়া মনে করিল, এই শেষ;—বাহিরে ফেলিয়া দিতে যাইতেছে।

সেই সুদীর্ঘ গৃহের অপর প্রান্তে, আর-একজন মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে মহামায়ার শয্যা রাখিয়া, অপরিচিতা প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিল। তাহার পর মহামায়াকে বলিল, "দেখো!"

মহামায়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "কি?"

সে বলিল, "তোমার স্বামী!"

মহামায়া চমকিয়া উঠিয়া বসিতে গেল, পারিল না। আবার শয্যায় পড়িয়া সবিস্ময়ে সাগ্রহে বলিল, "সে কি?"

অপরিচিতা কহিল, "তুমি সতী-লক্ষ্মী। তোমার স্বামী রামদয়াল ওই মৃত্যুশয্যায়। দেখো।"

মহামায়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "আমি যে আর দেখিতে পাই না,—দেখাও, দেখাও,—তুমি কে?"

অপরিচিতা মহামায়াকে তুলিয়া ধরিয়া কহিল,—"দেখো! তোমার স্বামীকে দেখো—আমি যোগমায়া—"

মহামায়া চিৎকার করিয়া উঠিল;—যোগমায়া পাষাণপ্রতিমার ন্যায় অবিচল। সে মহামাযাকে শয্যায় শায়িত করিয়া মুখে-চোখে জল দিতে লাগিল।

মহামায়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "তাঁর পদধূলি দাও, মরিবার আগে দাও দিদি, আমি সুখে মরি।"

যোগমায়া মুমূর্ষু রামদয়ালের পদধূলি আনিয়া তাহার মাথায় দিল।

মুমূর্ষু জিজ্ঞাসা করিল, "কি?—কে?"

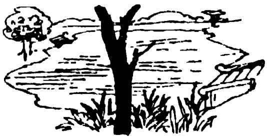
মহামায়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, নয়নদ্বয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতেছিল। ইঙ্গিতে বুঝাইল, রামদয়ালের শয্যার কাছে লইয়া যাও।

যোগমায়া তাহার শয্যা আরও নিকটে টানিয়া আনিল,—মুমূর্ষুকে বলিল,—"চিনিতে পার? মহামায়া—"

রোগী একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। রোগী হস্ত প্রসারিত করিল। যোগমায়া মহামায়ার শীতল হাতখানি লইয়া মুমূর্ষুর শীতল হস্তে সমর্পণ করিল। উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়া অনন্ত পথে যাত্রা করিল।

তাহার পর বহুকাল সেই চটীর পথের ধারে একটা পাগলী বেড়াইত। তাহার মুখে আর অন্য কথা ছিল না, যাত্রীর দল সবিস্ময়ে শুনিত,—পাগলী বিড়-বিড় করিযা বকিতেছে, "বড় সুখ! বড় সুখ!"

১০ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩০



সঙ্গিনী

সরলাবালা দাসী

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

প্রভাত অরুণালোক তখনও ঘাটে আসিয়া পড়ে নাই, কেবল জলের উপর ঊষার আলো পড়িয়া তরঙ্গে-তরঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল। চান্দেরী নদী নাচিয়া-নাচিয়া যেন কোন অনন্ত উদ্দেশে নিশিদিন অবিরামভাবে চলিতেছে। তীরে নাগকেশর গাছের উপর একটা কোকিল ডাকিতেছিল, নীরব বনের মাঝে তাহাব মধুর সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস দিকে-দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া মিশাইয়া যাইতেছিল। দূরে অর্বলী অটলভাবে যেন জগতের সুখ-দুঃখের, ভাঙা-গড়ার, কত অতীত কীর্তির সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সংসার তখনও নিদ্রাশ্রান্ত নয়ন ভালো করিয়া উন্মীলন করিতে পারে নাই। অর্ধজাগ্রত হইয়া অলসভাবে ধীরে-ধীরে নয়ন মেলিতেছে। এমন সময় দুইটি বালিকা ছোট-ছোট দুটি কলস লইয়া ঘাটে আসিল। ভাদ্র মাস, আকাশ নীল-নির্মল। নিকটের বনশ্রেণী ক্রমে-ক্রমে দূরে গিয়া যেন আকাশের সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে। চান্দেরী পূর্ণযৌবনা রমণীর ন্যায়, হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গমালা লইয়া, কূলে-কূলে কানে-কানে টল-টল করিতেছে। ধীরে-ধীরে আধখানা সূর্য পূর্বগগনে জাগিয়া উঠিতেছে। মধুরতার সহিত গাম্ভীর্যের মিলন হইয়াছে।

বালিকা দুটির বড়টির বয়স ১২/১৩ বৎসর হইবে, তাহাব নাম বমা। রমা সুন্দরী, তাহাব সৌন্দর্যের কথা পল্লীতে বিখ্যাত। দৃষ্টি আনন্দমোহপূর্ণ, নবযৌবনের বিকাশে চঞ্চল। মুখে প্রফুল্লতা উৎকণ্ঠায় মিশ্রিত। চোখে, মুখে, দৃষ্টিতে যেন আবেগ ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাল্যযৌবনের সন্ধিস্থলে অপূর্ব শ্রীতে রমার সুকুমার তনু পূর্ণ হইয়াছে।

ছোটটির নাম স্বরস্বতী। সে ১১/১২ বছরের। দলিত কুসুমেব যেমন একটু করুণ সৌন্দর্য থাকে, প্রভাত-শুকতারার যেমন পাণ্ডুশ্রী থাকে, তেমনি কেমন একটু মাধুর্য তাহাব মুখে-দৃষ্টিতে, লুক্কায়িত রহিয়াছে। সে সৌন্দর্যে তীব্রতা নাই, তাই সকলে তাহা বুঝিতে বা উপভোগ করিতে পাবে না। বালিকার চপলতা বিন্দুমাত্রও তাহার মুখে নাই, তাহার পরিবর্তে গম্ভীর-শান্ত ভাব। নয়নদুটির বিষণ্ন স্থিব দৃষ্টি।

রমা ঘাটে আসিয়া একবার আকাশের দিকে, একবার পরপারের তরুশ্রেণীর দিকে, মাঝে মাঝে চমকিতভাবে ঘাটের পথের দিকে, ফিরিয়া চাহিতেছিল। একটু পরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মোহন আজ আর আসিল না!"

স্বরস্বতী সোপানে বসিয়া নত দৃষ্টিতে জলকল্লোলের খেলা দেখিতেছিল। সম্প্রতি তাহার একটি ভাইয়ের মৃত্যু হইয়াছে, সেই কথা মনে পড়িয়া বিন্দু-বিন্দু চোখেব জল জলে মিশাইতেছিল। এমন সময় বমার কথা কানে গেল। সে মুখ তুলিয়া বলিল, "মোহন আজ আসিবে বলিয়াছিল?"

রমা হাসিয়া বলিল, "না, মোহন আসিবে বলে নাই, তাহা হইলে সে এতক্ষণ আসিত।"

স্বরস্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি?"

রমা কথার উত্তর দিল না, একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিল। দূরে তরুশ্রেণীর মধ্যে। মনুষ্যের মতো একজন দেখা যাইতেছিল, রমা একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়াছিল। যখন সে

ক্রমে নিকটে আসিল, তখন রমা, "মোহন!" এই কথাটি বলিয়া, একটু আগ্রহের ভাবে অগ্রসর হইয়া গেল। স্বরস্বতী ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিল।

মোহনলাল শ্রীমান ও বলিষ্ঠ। বয়স ১৮ বৎসর। মুখে ও পরিচ্ছদে কিছু বিলাসিতার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই মোহনই রমার ভাবী স্বামী। তাহার সহিত রমার বিবাহসম্বন্ধ ঠিক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তবু বাল্যকালের খেলার সঙ্গী বলিয়া, রমা মোহনকে লজ্জা করিত না।

মোহন আসিলে রমা বলিল, "আজ এত দেরি কেন মোহন? এতক্ষণ কি করিতেছিলে?"

মোহন বাম হস্তের সাজি দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া বলিল, "এই দেখো রমা, তোমার জন্য আজ কত ফুল তুলিয়া আনিয়াছি।"

রমা বলিল, "তাইতো, সকাল হইতে বুঝি ফুল তুলিতেছিলে? অনেক ফুল তো তুলিয়াছ মোহন? স্বরস্বতী, ভাই দেখে যা, মোহন কত ফুল আনিয়াছে।"

স্বরস্বতী রমার কথা শুনিয়া, রমার রাগ করিবার ভয়ে সেই দিকে পা বাড়াইতে গেল, কিন্তু পা অবাধ্য হইয়া তাহার বিপরীত দিকে অগ্রসর হইল। রমা স্বরস্বতীর বিপদ দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "তোর ভাই এত লজ্জা? মোহনের কাছেও তোর লজ্জা করে?"

স্বরস্বতীর মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে একপা-একপা করিয়া জলে পা বাড়াইতে লাগিল। মোহন তাহার সেই লজ্জারক্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। শেষে বলিল, "রমা, আমি যাই। স্বরস্বতী আমার জন্য লজ্জায় বড়ই কষ্ট পাইতেছে।" বলিয়া মোহন চলিয়া গেল।

মোহনকে যতক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল, রমা নিমেষবিহীন চক্ষে সেই বনপথের দিকে চাহিয়া রহিল। যখন মোহন একেবারে বনের ভিতর মিশাইয়া গেল, তখনও রমা সেইভাবে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বরস্বতী জল হইতে ডাকিল, "রমা!"

রমা চমকিতভাবে পিছনে ফিরিয়া চাহিল।

স্বরস্বতী একটু হাসিয়া বলিল, "মোহন আসিলে তোমার তো জ্ঞান থাকে না, দেখো দেখি কত বেলা হইয়া গিয়াছে। স্নান করিবে না?"

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

প্রথম প্রেমের বিকাশ কি মধুর! তখন জগৎ যেন শুধু মধুময় বলিয়া বোধ হয়। এই সুন্দর পৃথিবীতে অসৌন্দর্য যে কিছু আছে, তাহা মনে থাকে না। জীবন যেন কেবল সুখস্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। রমার কোমল-হৃদয় এই প্রণয়মোহে আচ্ছন্ন। মোহনের কথা তো ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু এখন যেমন মধুর বোধ হয়, এমন মধুর তো কখনও লাগিত না। মোহনের হাসি কি মধুর। মোহন যাহা করে, সকলই সুন্দর, সকলই মধুর! মোহনের যে কিছু দোষ থাকিতে পারে, এ কথা রমার হৃদয়ে এক মুহূর্তও স্থান পাইত না।

স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে যখন সংসার নিদ্রিতের মতো নীরব, শ্রান্তভাবে থাকিত, যখন পশুপক্ষীরা রৌদ্রতাপে তপ্ত হইয়া নিজ-নিজ আশ্রয়ে বিশ্রাম করিত, কেহ কোথাও থাকিত না, সেই সময় নদীর ধারে, নাগকেশর তরুর ছায়ায়, পাথরের উপর বসিয়া, মোহন আর

রমা কত গল্পই করিত। ছেলেবেলা হইতে দুজনে চিরদিন একত্র ছিল, তাই এ প্রণয়ে লজ্জার বাধা নাই। তখনও বালিকার প্রেম, ইহাতে যৌবনের সঙ্কোচ, অভিমানের ছলনা প্রভৃতি কিছুই নাই। সেই চাঁদেরী নদীর তীরে, সেই নির্জন নাগকেশর তরুতলে, শিলাসনে, চারিধারে প্রকৃতির মধুর স্নেহ, তাহার মধ্যে মগ্ন হইয়া বালিকা ভাবিত, "বুঝি মোহন আর আমি ছাড়া জগতে আর কেহ নাই। বুঝি মোহনের জন্যই আমি, আমার জন্যই মোহন।"

আর মোহন! সে নিজে নিজের হৃদয় বুঝিতে পারে নাই। রমাসুন্দরী, তাহার বাল্যসহচরী, তাই সে ভাবিত, সে রমাকে ভালোবাসে; কিন্তু সেই সঙ্গে কি জানি কেন স্বরস্বতীর লজ্জারক্ত মুখকান্তিও তাহার মনে জাগিত। মোহন আপনাকে আপনি বুঝিতে পারে নাই, তাহার নিজের হৃদয় তাহাকে প্রতারণা করিতেছিল।

সেই নির্জন দ্বিপ্রহরে তরুতলে বসিয়া দুজনে কত কথা হইত! রমা চরণের কবিতা শিখিয়াছিল, তাহাই মোহনের নিকট আবৃত্তি করিত। চান্দেরী নদীর কল-কল তরঙ্গপ্রবাহের সঙ্গে বালিকার মধুর কণ্ঠনিঃসৃত রাজপুতানার অতীত গৌরবকাহিনী মিশিয়া যাইত।

গাহিতে-গাহিতে যখন রমা থামিত, তখন তাহার সেই চিরহাস্যময় মুখ গম্ভীর হইত, সে মোহনকে আকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "মোহন, সে দিন কি আর ফিরিয়া আসিবে না?" মোহন রমার ভাব বুঝিতে পারিত না, সে বলিত, "কোন দিন?" রমার তখন আর সে বালিকার চপলভাব থাকিত না; নয়ন উজ্জ্বল হইত, মুখে দৃপ্তভঙ্গী বিকশিত হইত। সে গম্ভীরভাবে বলিত, "সেই দিন, যে দিন হামীর ছিলেন, যে দিন প্রতাপসিংহ ছিলেন, সঙ্গ ছিলেন, সেই দিন কি আর ফিরিবে না? এখন কি করিলে সে দিন ফিরিয়া আসে?"

মোহনের ও কথা বড় ভালো লাগিত না। সে কথার উত্তর না দিয়া মোহন অন্য কথা তুলিত।

"রমা, আমাদের মেন নূতন দোলনা হয়েছে, তা তুমি দেখেছ? কাল তুমি দুলিবে না?"

রমা বলিত, "না মোহন, আমার দুলিতে ইচ্ছা করে না, আমার কিছুই ভালো লাগে না, যখন এ সকল কথা মনে পড়ে। আহা, কেন যে দিন গেল?"

মোহন হাসিয়া বলিত, "তা, তুমি কি সে দিন ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না কি?"

রমা মোহনের কথা শুনিয়া খানিক নীরব হইয়া থাকিত, শেষে নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যথিত চিত্তে বলিত, "না মোহন, তুমি হাসিও না, আমার বড় কষ্ট হয়।" ধন্য সেই দেশ, যে দেশে বালিকারও এমন স্বদেশপ্রেম!

আবার কোনও দিন রমা পুষ্পের মালা গাঁথিত, চঞ্চল অলকদাম মুখের উপর বার-বার পড়িয়া তাহাকে বিরক্ত করিত। রমা একমনে পুষ্পহার গাঁথিত, মোহন রমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। রমা মালা গাঁথিতে-গাঁথিতে গুন-গুন স্বরে গান গাহিত।

যখন সে গাহিত, তখন মোহন রমার মধুর ও আবেগপূর্ণ স্বর শুনিতে-শুনিতে মুগ্ধচিত্তে অবাক হইয়া থাকিত। নদী কুলু-কুলু রবে অবিশ্রাম বহিয়া যাইত। সরস্বতী তখন কোথা?

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

সরস্বতী ও রমা দুজনে জ্ঞাতিভগিনী, ব্রাহ্মণকন্যা। রমা অল্প বয়সে মাতৃহীনা হইয়াছিল, তাহাদের বাড়ির ভিতর সে কেবল একটি সন্তান, তাই সে সকলের বড় আদরিনী।

সে যখন যাহা চাহিয়াছে, তখনই তাহা পাইয়াছে। কখনও কেহ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজ করে নাই; তাই সে স্বভাবত কিছু অভিমানিনী আর গর্বিতস্বভাবে হইয়াছিল।

আর সরস্বতী? সে ছেলেবেলা হইতে কখনও কাহারও সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিত না। সকলের নিকটই যেন সে কত অপরাধিনী! সর্বদাই তাহার সঙ্কোচ। মানুষের দৃষ্টিভারে লজ্জাবতী লতার মতো সে সঙ্কুচিত। এমন মধুর-শান্ত স্বভাব, যে একবার তাহাকে দেখিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে।

সরস্বতী কেবল রমাকে সঙ্কোচ করিত না। রমা তাহার প্রাণের প্রাণ! যদি কখনও রমা অন্যায় করিয়া তাহাকে কিছু তিরস্কার করিত, তখন সরস্বতী কাঁদিয়া ফেলিত বটে, কিন্তু তাহার জন্য রমার উপর তাহার কখনও রাগ হইত না। রমাও সরস্বতীর চোখে জল দেখিয়া আবার তখনই অনুতপ্ত হইত। এই দুই সঙ্গিনীতে কখনও বিবাদ কি মনোমালিন্য হয় নাই। একবার রমার অসুখ করিয়াছিল, তখন ১৫ দিন সরস্বতীর আহার-নিদ্রা ছিল না। ইহার মধ্যে সে একমুহূর্তও রমাকে ছাড়িয়া অন্য স্থানে যায় নাই, যখন রমা মোহনের সঙ্গে গল্প করিত, তখন সরস্বতীর কোনও কাজ না থাকিলে সে তাহার একটু দূরে আড়ালে বসিয়া থাকিত। মোহনের সম্মুখে তাহার যাইতে লজ্জা করে, অথচ রমাকে ছাড়িয়া একাও সে থাকিতে পারে না, কাজেই সে এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। যখন রমা জ্ঞানহারা হইয়া মোহনের সঙ্গে গল্প করিত, তখন সরস্বতী অনিমিষ নয়নে তাহাদের দেখিত। কে বলিবে, এমন লুকাইয়া দেখিয়া তাহার কি সুখ?

সন্ধ্যা প্রায় হইয়া আসিয়াছে, সরস্বতী ঘরে প্রদীপ দিয়া, ভাইটিকে কোলে করিয়া প্রাঙ্গণে আসিল। কাল রমার বিবাহ, সরস্বতীর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ। সে রমাদের বাড়ি যাইতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে, "সরস্বতী কোথায় যাইতেছিস্" বলিয়া, একমুখ হাসি লইয়া, রমা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

রমাকে দেখিয়া সরস্বতীর চোখে-মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে বলিল,—"আজ সমস্ত দিন তোমার দেখা পাই নাই কেন?"

রমা উত্তর দিল না।

সরস্বতী আবার তেমনি একটু হাসিয়া বলিল, "কাল তোমার বিবাহ বলিয়া আস নাই, না? তা, এখন আর কি আমাদের দেখা দিবে, এখন মোহনই তোমার সঙ্গী হইবে।" সরস্বতী আজ আনন্দ উচ্ছ্বাসে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়া, শেষে আপনিই লজ্জিত হইল।

রমা বলিল, "তুই মোহনকে কেন লজ্জা করিস সরস্বতী?"

সরস্বতী বলিল, "কি জানি ভাই, এই খোকা সব জানে। কেমন খোকা ভাই?" বলিয়া ভাইয়ের মুখে একটা চুম খাইল।

রমা বলিল, "তোর সকলই অনাসৃষ্টি! মোহনকে আবার কিসের লজ্জা? আর এরি মধ্যে তোর এত লজ্জা কোথা হতে এল?"

সরস্বতী একটু হাসিয়া বলিল, "রমা, রাগ কোরো না। আমি কি করিব? আমি মোহনের সম্মুখে যেতে পারি না, কেন তা বলিতে পারি না।"

রমা মৃদু তিরস্কারছলে বলিল, "যাঃ, তবে তুই মোহনকে ভালোবাসিস না।"

রমার এই কথায় অপরাধিনীর ন্যায় সরস্বতীর প্রফুল্ল মুখ মলিন হইয়া গেল। সে একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "রমা, আমি মোহনকে ভালোবাসি। তুমি মোহনকে ভালোবাস, আমি কেন বাসিব না? তুমি যখন মোহনের কাছে থাক, তখন আমার তাহা দেখিতে

ইচ্ছা করে। তাই দূর হইতে দেখি, কাছে গিয়া তোমাদের কথায় বাধা দিতে ইচ্ছা হয় না।"

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

মোহনলাল অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী, কিন্তু অভিভাবক কেহ নাই। কাজেই মোহন কুসঙ্গে পড়িয়াছিল। অল্পবয়স্ক বালক অতুল ঐশ্বর্য হাতে পাইলে তাহার মস্তিষ্কের স্থিরতা থাকে না, মোহনেরও তাহা হইয়াছিল। বিশেষত পারিষদগণের সদুপদেশে মোহন দিন-দিনই অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। তবে তাহার হৃদয় বড় কোমল ছিল, তাই সঙ্গীগণের সৎপরামর্শেও সহজে তাহার হৃদয়ের সে মধুর ভাবটুকু অন্তর্হিত হয় নাই।

তরল ও বিলাসী চিত্তে কখনও ভালোবাসা স্থান পাইত না, সে কেবল রমার রূপমোহে মুগ্ধ হইয়াছিল। যখন রমার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল, তখন কিছুদিনেই তাহার সেই মোহ ফুরাইয়া গেল, তখন রমা তাহার নিকট নিতান্ত বিরক্তির সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইল। সরস্বতীর আরক্ত সুন্দর মুখ, তাহার যৌবনস্বপ্নে জাগিতেছিল, এখন সরস্বতীই কেবল তাহার একমাত্র আরাধনার বস্তু হইল। কি করিলে সরস্বতীকে পাইবে, কেবল তাহাই মোহনের একমাত্র চিন্তা, রমা এখন আর ভালোলাগে না।

রমা মোহনের এ পরিবর্তন, প্রথম-প্রথম তেমন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না। তখন তাহার হৃদয় নবানুরাগের আনন্দে বিভোর, কিন্তু রমা ক্রমে-ক্রমে যেন স্বামীর কেমন-কেমন ভাব দেখিতে লাগিল। প্রথম ভালো করিয়া কিছু বুঝিতে পারিল না।

এখন কি আর মোহন রমাকে তেমন ভালোবাসে না? কই, এখন রমা কাছে গেলে তাঁহার মুখে তো আনন্দের চিহ্ন দেখা যায় না; বরং তাহার পরিবর্তে তাঁহার যেন বিরক্ত-বিরক্ত ভাবই বোধ হয়, এখন রমা প্রেমউচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তেমনি "মোহন!" বলিয়া ডাকিলে কই তিনি তো উত্তর দেন না? রমা মোহনের নিকট কি অপরাধ করিয়াছে?

রমা কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া একদিন মোহনকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি কিছু অসুখ করেছে?"

মোহন স্তব্ধভাবে বলিল, "না।"

রমা আর কিছু কথা খুঁজিয়া পাইল না। হায়, সেই অফুরান কথা এখন কোথায় গেল?

রমা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। দেখিল, তাহার কথায় মোহনের মন নাই, তিনি অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতেছেন।

রমা আবার বলিল, "তবে তোমায় এমন বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?"

মোহন সেইভাবে উত্তর দিল, "বিষণ্ণ আবার কোথা?"

রমা আর পারিল না, সে কাতরস্বরে বলিল, "আমার কথায় ভালো করিয়া উত্তর দাও না কেন? আমি কি কিছু দোষ করিয়াছি?"

মোহন অন্যমনস্ক ছিল, বুঝি রমার কথা শুনিতে পাইল না। সে কথার উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল।

রমা কি করিবে? রমার রোদন ছাড়া আর উপায় কি?

ছেলেবেলা হইতে দুঃখ যে কাহাকে বলে, অনাদর কাহাকে বলে, তাহা সে জানিত না। আজ মোহনের অনাদর তাহার সহ্য হইবে কেন? অভিমানিনী বালিকার কখনও দুঃখ, কখনও অভিমান আসিয়া হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল।

কিন্তু অভিমান কাহার উপর? মোহনকে কথা জিজ্ঞাসা না কবিলে আপনি কোনও কথা বলিবে না। কখনও কখনও কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর পাওযা যায় না। কাজেই রমা আর একদিন অনেক কষ্টে বুক বাঁধিয়া, মোহনকে অনুনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কেন কথা কও না, বলো। আমি কি অপরাধ কবিয়াছি, বলো।"

আজ রমার সৌভাগ্যক্রমে মোহন মিষ্টস্বরে উত্তর দিল, "তুমি কি অপরাধ করিবে, বমা?"

মোহনের আদরে রমার হৃদয়ের দুঃখতরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হইল। "তবে তুমি আমার কোনও কথার উত্তর দাও না কেন?" আমি তোমার কাছে কি করিয়াছি।" বলিয়া রমা কাঁদিয়া ফেলিল।

রমার চোখে জল দেখিয়া মোহনেব হৃদয় কোমল হইল, মনে অনুতাপ হইল। সে বলিল, "তোমরা সঙ্গে ভালো করিয়া কথা কহি নাই? সেটা তো আমার বড়ই অন্যায় হইয়াছে। তাহাতে কি তুমি বড় কষ্ট পাইয়াছ, রমা?"

রমা এক মুহূর্তে সব ভুলিয়া গেল, তাহার আর কোন-কথা মনে থাকিল না। আনন্দে পূর্ণ হইয়া সে মোহনের সহিত কত কথাই কহিতে লাগিল। মোহনও ক্ষণিক মোহে রমার সেই প্রেমপূর্ণ অনিন্দনীয় মুখ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। অবশেষে ক্রমে-ক্রমে ছেলেবেলার কত কথা উঠিল, কতদিনকার কত ছোট-ছোট কাহিনী মনে পড়িয়া সুখে-লজ্জায় হৃদয় পূর্ণ হইতে লাগিল; শেষে রমা বলিল, "আহা, সরস্বতীকে আমার একবার দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে কতদিন দেখি নাই।"

মোহন শুনিয়া আবাব অন্যমনস্ক হইল, সরস্বতীর লজ্জারক্ত সুকুমার মুখচ্ছবি আবার তাহার মনে পড়িল।

রমা বলিল, "সরস্বতী আমায় কত ভালোবাসিত, কি শান্ত, লাজুক মেয়ে। অমন সুন্দর মুখ আমি কোথাও দেখি নাই। সরস্বতীর বিবাহসম্বন্ধ কি কোথাও হইয়াছে, বলিতে পার?"

মোহন অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমা মোহনের সে ভাব লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "সরস্বতীর বিবাহের সময় কি আমোদই হবে। আমি সে সময় সেখানে যাইব। মোহন, এবার বোধহয় সরস্বতী আর তোমাকে লজ্জা করিবে না। ওকি, তুমি কোথায় যাইতেছ?"

মোহন উত্তর না দিয়া বাহির হইয়া যায় দেখিয়া, রমা মোহনের সঙ্গে-সঙ্গে গেল। গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইতেছে?"

মোহন অপ্রসন্নভাবে বলিল, "তুমি ঘরে যাও।"

রমা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হইয়াছে?" মোহন বলিল, "আমাকে বিরক্ত করিও না।" বলিয়া মোহন চলিয়া গেল।

হায়, রমার সে মাহেন্দ্রমুহূর্তের আনন্দস্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, সেই সঙ্গে বুঝি অভিমানিনীর হৃদয়ও ভাঙিয়া গেল।

৷৷ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৷৷

ফাল্গুন মাস, সায়াহ্নকাল। নববসন্তসমাগমে বৃক্ষের নবপত্রবিকাশ ও নবমুকুলোদগম হইতেছে, মানবের হৃদয়েও বুঝি নব আশা জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি যেন রূপডালি ফুলে-

ফলে সাজাইয়া বিশ্বপতির চরণে উপহার দিতেছেন। চারিদিক কাঞ্চন ফুলের বর্ণে আলো হইয়া উঠিয়াছে। পার্বতীর প্রদেশে বসন্তের শোভা কি সুন্দর, তাহা বঙ্গদেশে থাকিয়া বুঝা যায় না, সেই নবপত্রশোভিত শাল-অরণ্যময় পর্বতশৃঙ্গ, স্থানে-স্থানে শত-শত বনপুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। পৃথিবী হাস্যময়ী, পুষ্পভূষণা। এক-একটা গাছ সর্বাঙ্গ ফুটন্ত পরগাছায় ঢাকিয়া উচ্চশির তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উপরে সুনীল নির্মল আকাশ, নিম্নে পুষ্পভূষিতা আনন্দময়ী ধরণী।

কাল হোলি উৎসব হইয়া গিয়াছে। রাজপথে এখনও ধুলা দেখা যাইতেছে না, চারিদিকই ফাগে লালে-লাল হইয়াছে। রাজপথ দিয়া রমণীগণ হোলির গান গাহিতে-গাহিতে চলিয়াছে। রঙ্গিন লালবস্ত্র পরিয়া, ছোট-ছোট ছেলে কোলে করিয়া, যুবতীর দল কাতারে-কাতারে চলিয়াছে। আজ সকলেরই পরিধানে রক্তবস্ত্র, সকলেরই মুখে আনন্দচিহ্ন।

এমন সুখের দিনে একটি যুবতী একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতেছে? কপোল বহিয়া ঝর ঝর করিয়া জলবিন্দুগুলি ভূমিতল সিক্ত করিতেছে। সে উৎসবের বস্ত্র পরে নাই, উৎসবে তাহার আনন্দ নাই।

এই কি রমা? এই কি সে চঞ্চল হাস্যময় নয়নের দৃষ্টি? সেই অর্ধস্ফুট মুকুলের এই কি বিকশিত কুসুম? রমাকে আর চেনা যায় না, সে একেবারে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুন্দর বদন কালিমাময় হইয়াছে।

হায়, রমার সুখস্বপ্ন ভাঙিয়াছে। স্ফুটোনোন্মুখ বালিকাহৃদয়ে প্রণয়মোহকল্পনায় সে যে নন্দনকানন গড়িয়াছিল, কঠোর মতের আঘাতে তাহা ভাঙিয়া গিয়াছে। এখন সে মোহনকে চিনিয়াছে, এতদিন পরে মোহনের প্রকৃত ছবি তাহার চক্ষে পড়িয়াছে। হায়, পৃথিবীর গতিই এই!

এমনসময় মোহনলাল গৃহে প্রবেশ করিল। মোহনের আর সেই পূর্বের মতো বিশুষ্ক, চিন্তাপূর্ণ মুখচ্ছবি নাই, যেন কোনও কার্যের সফলতায় তাহা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

মোহন আসিয়া বলিল, "আজ যে উৎসবের বসন পর নাই? রমা, কাঁদিতেছিলে নাকি?"

রমার চোখের জল তখনই শুখাইয়া গেল। পরিষ্কার কণ্ঠে গম্ভীরস্বরে রমা জিজ্ঞাসা করিল, "বিবাহ কবে স্থির হইয়াছে?" এ কথা সকলেই জানিত। মোহনের গোপন করিবার দরকার ছিল না, তথাপি বিস্মিতের মতো বলিল, "কাহার বিবাহ, রমা?"

রমা সেইভাবে বলিল, "তোমার বিবাহ?"

মোহন হাসিয়া বলিল, "সে কি? আমার বিবাহ? কাহার সঙ্গে?" রমা বলিল, "সরস্বতীর সঙ্গে।"

মোহনলাল উত্তর না পাইয়া নীরব হইয়া রহিল।

মোহনলালের ধনের অভাব ছিল না, দেখিতেও তিনি সুরূপ, তিনি ইচ্ছা করিলেই শত-শত সুন্দরীকে বিবাহ করিতে পারেন। তিনি যখন বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন, তখন সরস্বতীর দরিদ্র পিতা-মাতা মহানন্দে তাহাতে সম্মতি দিলেন। মোহনলালের মতো এমন সুপাত্র সরস্বতীর কপালে যে হইবে, তাহা কে ভাবিয়াছিল? তবে যদি সতীনের কথা বলো, তা সতীন এখন কাহারই বা না থাকে? বিশেষত রমার মতো সতীন, তাহাতে আপত্তির কোনও কারণই নাই। রমার সহিত যে সরস্বতীর বিবাদ হইবে না, কেহ কাহারও সৌভাগ্যে হিংসা করিবে না, ইহা স্থির নিশ্চয়। অতএব, এমন বিবাহে সম্মতি দিতে সরস্বতীর

পিতামাতার তিলার্ধও বিলম্ব হয় নাই। বিবাহের দিনও স্থির হইয়াছিল, কিন্তু সরস্বতী এ পর্যন্ত এ কথা কিছু জানিত না।

মোহনলাল একটু চুপ করিয়া শেষে হাসিয়া বলিল, "সরস্বতীর সঙ্গে আমার বিবাহ, এ সংবাদ তোমাকে কে দিল?" রমা উত্তর দিল না, বুঝি উত্তর দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। তখন মোহনলাল আবার বলিল,"সরস্বতীকে তুমি না বড় ভালোবাস? সরস্বতী যদি তোমার সপত্নী হয়, তাহাতে আর তোমার দুঃখ কেন? ভালোই তো হইবে, দুজনে চিরকাল একত্রে থাকিবে।"

রমার উত্তর না পাইয়া বলিল, "রমা, তুমি যে আমার কথায় উত্তর দিচ্ছ না? আমার উপর কি রাগ করেছ?" বলিয়া রমার হাত ধরিল।

রমার সর্বশরীরে যেন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বাল্যের গর্বিতস্বভাব যেন তাহার ফিরিয়া আসিল। সে ধীরে-ধীরে হস্ত মুক্ত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "মোহন, তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না;—আমি আর তোমার স্ত্রী নহি।"

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

তেমনি মধুর উষা; সেই চান্দেরী নদীতীরের বনশ্রেণী! সেই রমা ও সরস্বতী! কিন্তু হায়, সে দিন কোথা? সে সুখের দিন চলিয়া গিয়াছে, তাহা আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না।

চারিধারেই সেই শৈশবের স্মৃতিচিহ্ন, নীরব ভাষায় যেন কতদিনের কত কাহিনী বলিতেছে। কিন্তু হায়, সে মধুময় শৈশবকাল কোথা? শৈশবের সে সরল মধুসিক্ত অন্তর কোথায়?

ধীরে-ধীরে প্রভাতের বায়ু রমা ও সরস্বতীর অলক কাঁপাইয়া বহিয়া যাইতেছে। রমার মুখ শুষ্ক, গম্ভীর ললাটে বিন্দু-বিন্দু ঘর্ম শোভা পাইতেছে। সরস্বতীর মুখ ম্লান, বহু রোদনহেতু চক্ষু রক্তবর্ণ।

তেমনি আধখানা সূর্য ধীরে-ধীরে পূর্ব গগনে দেখা দিতেছে। এই সোপানে একদিন মোহন বসিয়াছিল, রমা মালা গাঁথিতেছিল। সেও এমনি সময়। এমনসময় সরস্বতী না জানিয়া ঘাটে আসিয়া কি লজ্জাই পাইয়াছিল। রমা-সরস্বতী হাসিয়া কত উপহাস করিতেছিল, সে দিন আর সরস্বতীর লজ্জা রাখিবার স্থান ছিল না।

এই সব স্মৃতিতে আজ রমা ও সরস্বতীর হৃদয় মথিত হইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে রমা অতি মৃদুস্বরে ধীরে-ধীরে বলিল, "সরস্বতী, তুমি মোহনকে বিবাহ করিবে না কেন? মোহন কি অপাত্র? তিনি কি তোমার স্বামী হইবার যোগ্য নন? সরস্বতি, তাহা নয়। তাঁহার গুণ অনেক আছে, কিন্তু কেবল আমারই অদৃষ্টদোষ।" হায় রমা, এখন তোমার গর্ব, অভিমান কোথা?

সরস্বতী রুদ্ধস্বরে বলিল, "রমা, তুমিও কি আমাকে ওই কথা বলিবে? তোমার কি মনে নাই, একবছর আগে তুমি একদিন বলেছিলে, 'সরস্বতী, তুই মোহনকে ভালোবাসিস না;' আমি বলিয়াছিলাম, "তুমি মোহনকে ভালোবাস, তবে আমি কেন বাসিব না?'এ কথার অর্থ তুমি বুঝিতে পার নাই। আমার আবার বিবাহ কি? তোমার সুখ দেখিলে আমার সুখ হয়, তোমার কষ্টে আমার বুক ফাটিয়া যায়। লোকে স্বামীকে কেমন ভালোবাসে, জানি না; কিন্তু আমি সূর্যদেবকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি, আমি তোমাকে যত ভালোবাসি,

এত আর কাহাকেও নয়।" বলিতে-বলিতে সরস্বতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে আর কিছু বলিতে পারিল না। অজস্র অশ্রুধারে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তাহার পর দুজনে কেহ আর কোনও কথা কহিল না। দুজনে নীরব হইয়া রহিল। দুজনের নীরব হৃদয় দুজনে অনুভব করিতে লাগিল। আকাশ অবাক হইয়া দুজনের এই পবিত্র সখিপ্রেমের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

ক্রমে, সূর্য সম্পূর্ণরূপে আকাশে উদিত হইলেন। কনক-রৌদ্র অরণ্যে, বৃক্ষপত্রে, সলিলে, রমা ও সরস্বতীর মুখে আসিয়া পড়িতে লাগিল। মাঠ দিয়া কৃষকসন্তান গান গাহিতে-গাহিতে চলিয়াছে;—

এক নজর তোম্‌কো না দেখ্‌নেসে হাম মর যাওয়েঙ্গে
জানি-জানি মর্ যাওয়েঙ্গে।
সেবি জহর খাওয়েঙ্গে,
জানি-জানি মেবি জহর খাওয়েঙ্গে।

সঙ্গীতের মধুর স্বর আসিয়া রমার শ্রবণে প্রবেশ করিয়া কত তরঙ্গই তুলিতে লাগিল। সবস্বতী নীরব জ্ঞানহীনের মতো বসিয়া রহিয়াছে। সহসা রমা বলিল, "সরস্বতী, স্নান করি আয়, বেলা হইয়া গেল।"

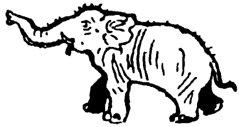
সরস্বতী তেমনি অন্যমনস্কভাবে যেন কি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া জলের ভিতর একটি একটি করিয়া সোপান অবতরণ করিতে লাগিল, শেষে শেষ সোপানে গিয়া দাঁড়াইল। তখন আকাশের দিকে চাহিয়া বিকৃত কণ্ঠে সরস্বতী বলিল, "ভগবন্ সূর্যদেব! আমার পাপ লইও না। তুমি অর্ন্তযামী, আমার হৃদয়ের ব্যথা দেখিতে পাইতেছ। ভগবতী চান্দেরী দেবী, তুমি আমাকে আশ্রয় দাও!" বলিয়া সরস্বতী শেষ সোপান হইতে পা বাড়াইল।

রমা দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "সরস্বতী করিস কি, করিস কি?"

"দিদি, বিবাহে অমত করা আমার সাধ নহে, আমি বিবাহবন্ধনও পরিতে পারিব না, আমাকে ক্ষমা করো!" বলিতে-বলিতে সরস্বতী ডুবিয়া গেল। রমাও সেই সঙ্গে চিৎকার করিয়া ডুবিল। অন্য ঘাটে যাহারা ছিল, তাহারা চিৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া বহুকষ্টে রমাকে তুলিল, কিন্তু সরস্বতীকে অনেক চেষ্টা করিয়াও কেহ খুঁজিয়া পাইল না।

এই ঘটনার পর প্রায় দুই দিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। মোহনলাল ইতিমধ্যে এক সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, রমা আর তাঁহার গৃহে যায় নাই। সে নীরবে জীবনভার বহন করিতেছে। কাহারও অসুখ হইলে শুশ্রূষা করিতে যায়, কাহারও বিপদে ছুটিয়া যায়, বৃদ্ধ পিতার সেবা করে, আর অবসর পাইলেই ঘাটে আসিয়া অন্যমনস্ক হইয়া চান্দেরী নদীব অগাধ কৃষ্ণ সলিলের দিকে স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। তাহার কি অমূল্য রত্নই এই নদীতলে হারাইয়া গিয়াছে! কখনও চিন্তামগ্ন হইয়া আপনা-আপনি অস্ফুটস্বরে বলে, "এই নদীতলে, এই শান্ত-শীতল শয্যায়! হায়, কবে তাহার কাছে যাইব? কবে এই শীতল সলিলে হৃদয়ের জ্বালা নিভিবে?"

৩য় বর্ষ ১২ সংখ্যা, চৈত্র ১২৯৯



আদরিনী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

পাড়ার নগেন ডাক্তার ও জুনিয়ার উকিল কুঞ্জবিহারীবাবু বিকালে পান চিবাইতে-চিবাইতে, হাতের ছড়ি দুলাইতে-দুলাইতে জয়রাম মোক্তারেব নিকট আসিয়া বলিলেন,—"মুখুয্যেমশায়, পীরগঞ্জের বাবুদের বাড়ি থেকে আমরা নিমন্ত্রণ পেয়েছি, এই সোমবার দিন মেজবাবুর মেয়ের বিয়ে। শুনছি নাকি ভারি ধূমধাম হবে। বেনারস থেকে বাই আসছে, কলকাতা থেকে খেমটা আসছে। আপনি নিমন্ত্রণ পেয়েছেন কি?"

মোক্তার মহাশয় তাঁহার বৈঠকখানার বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া হুঁকা হাতে করিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আগন্তুকগণের এই প্রশ্ন শুনিয়া, হুঁকাটি নামাইয়া ধরিয়া, একটু উত্তেজিতস্বরে বলিলেন—"কি রকম? আমি নিমন্ত্রণ পাব না কি রকম? জান, আমি আজ বিশ বচ্ছর ধরে তাদের এস্টেটের বাঁধা মোক্তার? —আমাকে বাদ দিয়ে তারা তোমাদের নিমন্ত্রণ করবে, এইটে কি সম্ভব মনে করো?"

জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে ইহারা বেশ চিনিতেন—সকলেই চিনে। অতি অল্প কারণে তাঁহার তীব্র অভিমান উপস্থিত হয়—অথচ হৃদয়খানি স্নেহে, বন্ধুবাৎসল্যে কুসুমের মতো কোমল, ইহা যে তাঁহার সঙ্গে কিছুদিনও ব্যবহার করিয়াছে, সেই জানিয়াছে। উকিলবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না—না—সে কথা নয়—সে কথা নয়। আপনি রাগ করলেন মুখুয্যেমশায়? আমরা কি সে ভাবে বলেছি? এ জেলার মধ্যে এমন কে বিষয়ী লোক আছে, যে আপনার কাছে উপকৃত নয়—আপনার খাতির না করে? আমাদের জিজ্ঞাসা করবার তাৎপর্য এই ছিল যে, আপনি সেদিন পীরগঞ্জে যাবেন কি?"

মুখোপাধ্যায় নরম হইলেন। বলিলেন,—"ভায়ারা, বস।" —বলিয়া সম্মুখস্থ আর-একখানি বেঞ্চি দেখাইয়া দিলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে বলিলেন,—"পীরগঞ্জে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার পক্ষে একটু কঠিন বটে। সোম-মঙ্গল দুটো দিন কাছারি কামাই হয়। অথচ না গেলে, তারা মনে ভারি দুঃখিত হবে। তোমরা যাচ্ছ?

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"যাবার তো খুবই ইচ্ছে—কিন্তু অত দূর যাওয়া তো সোজা নয়! ঘোড়ার গাড়ির পথ নেই। গোরুর গাড়ি করে যেতে হলে, যেতে দুদিন, আসতে দুদিন। পাল্কি করে যাওয়া, সেও যোগাড় হওয়া মুশকিল। আমরা দুজনে তাই পরামর্শ করলাম, যাই মুখুয্যেমশায়কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যদি যান, নিশ্চয়ই রাজবাড়ি থেকে একটা হাতি-টাতি আনিয়ে নেবেন এখন, আমরা দুজনেও তাঁর সঙ্গে সেই হাতিতে দিব্যি আরামে যেতে পারব।"

মোক্তারমহাশয় স্মিতমুখে বলিলেন,—"এই কথা? তার জন্য আর ভাবনা কি ভাই?—মহারাজ নরেশচন্দ্র তো আমার আজকের মক্কেল নয়—ওঁর বাপের আমল থেকে আমি ওঁদের মোক্তার। আমি কাল সকালই রাজবাড়িতে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি—সন্ধ্যা নাগাদ হাতি এসে যাবে এখন।"

কুঞ্জবাবু বলিলেন,—"দেখলে হে ডাক্তার, আমি তো বলেইছিলাম—অত ভাবছ

কেন,—মুখুয্যেমশায়ের কাছে গেলেই একটা উপায় হয়ে যাবে। তা মুখুয্যেমশায়, আপনাকেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। না গেলে ছাড়ছিনে।"

"যাব বই কি ভায়া—আমিও যাব। তবে আমার তো বাই-খেমটা শোনবার বয়স নেই—তোমরা শুনো। আমি মাথায় এক পগ্‌গ বেঁধে, একটি থেলো-হুঁকো হাতে করে, লোকজনের অভ্যর্থনা করব, কে খেলে, কে না খেলে দেখব—তদারক করে বেড়াব। আর তোমরা বসে শুনবে—'পেয়ালা মুঝে ভর দে'—কেমন?" —বলিয়া মুখোপাধ্যায়মহাশয় হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন রবিবার। এ দিন প্রভাতে আহ্নিক পূজাটা মুখুয্যেমহাশয় একটু ঘটা করিয়াই করিতেন। বেলা ৯টার সময় পূজা-সমাপন করিয়া, জলযোগান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। অনেকগুলি মক্কেল উপস্থিত ছিল, তাহাদের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। হঠাৎ সেই হাতীর কথা মনে পড়িয়া গেল। তখন কাগজ-কলম লইয়া, চশমাটি পরিয়া, "প্রবলপ্রতাপান্বিত শ্রীলশ্রীমন্মহারাজ শ্রীনরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর আশ্রিত জনপ্রতিপালকেষু" পাঠ লিখিয়া, দুই তিন দিনের জন্য একটি সুশীল ও সুবোধ হস্তী প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। পূর্বেও আবশ্যক হইলে কতবার এইরূপে মহারাজের হস্তী আনাইয়া লইয়াছেন। একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া পত্রখানি লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়া, মোক্তারমহাশয় আবার মক্কেলগণের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বয়স এখন পঞ্চাশত পার হইয়াছে। মানুষটি লম্বা ছাঁদের—রঙটি আর একটু পরিষ্কার হইলেই গৌরবর্ণ বলা যাইতে পারিত। গোঁফগুলি মোটা-মোটা—কাঁচায় পাকায় মিশ্রিত। মাথার সম্মুখভাগে টাক আছে। চক্ষু দুইটি বড়-বড়, ভাসা-ভাসা। তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা যেন হৃদয় ছাপাইয়া, এই চক্ষু দুইটি দিয়া উছলিয়া পড়িতেছে।

ইঁহার আদিবাস যশোর জেলায়। এখানে যখন প্রথম মোক্তারি করিতে আসেন, তখন এ দিকে রেল খোলে নাই। পদ্মা পার হইয়া কতক নৌকাপথে, কতক গরুর গাড়িতে, কতক পদব্রজে আসিতে হইয়াছিল। সঙ্গে কেবলমাত্র একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ এবং একটি পিতলের ঘটি ছিল। সহায় সম্পত্তি কিছুই ছিল না। মাসিক তেরো সিকায় একটি বাসা ভাড়া লইয়া, নিজ হাতে রাঁধিয়া খাইয়া, মোক্তারি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দেন। এখন সেই জয়রাম মুখোপাধ্যায় পাকা দালান কোঠা করিয়াছেন, বাগান করিয়াছেন পুকুর কিনিয়াছেন অনেকগুলি কোম্পানির কাগজও কিনিয়াছেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এ জেলায় ইংরাজিওয়ালা মোক্তারের আবির্ভাব হইয়াছে বটে—কিন্তু জয়রাম মুখুয্যেকে তাহারা কেহই হটাইতে পারে নাই। এখনও ইনি এ জেলার প্রথম মোক্তার বলিয়া গণ্য।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃদয়খানি অত্যন্ত কোমল ও স্নেহপ্রবণ হইলেও, মেজাজটা কিছু রুক্ষ। যৌবনকালে ইনি রীতিমত বদরাগী ছিলেন—এখন রক্ত অনেকটা ঠান্ডা হইয়া আসিয়াছে। সে কালে হাকিমেরা একটু অবিচার-অত্যাচার করিলেই মুখুয্যেমহাশয় রাগিয়া-চেঁচাইয়া অনর্থপাত করিয়া তুলিতেন। একদিন এজলাসে এক ডেপুটির সহিত ইহার বিলক্ষণ বচসা হইয়া যায়। বিকালে বাড়ি আসিয়া দেখিলেন তাঁহার মঙ্গলা গাই একটি এঁড়ে বাছুর প্রসব করিয়াছে। তখনই আদর করিয়া উক্ত ডেপুটিবাবুর নামে বাছুরটির নামকরণ করিলেন।

ডেপুটিবাবু লোকপরম্পরায় ক্রমে এ কথা শুনিয়াছিলেন এবং বলা বাহুল্য, নিতান্ত প্রীতিলাভ করেন নাই। আর একবার, এক ডেপুটির সম্মুখে মুখুয্যেমহাশয় আইনের তর্ক করিতেছিলেন। কিন্তু হাকিম কিছুতেই ইঁহার কথায় সায় দিতেছিলেন না। অবশেষে রাগের মাথায় জয়রাম বলিয়া বসিলেন,—"আমার স্ত্রীর যতটুকু আইন-জ্ঞান আছে, হুজুরের তাও নেই দেখছি।" সেদিন, আদালত-অবমাননার জন্য মোক্তার মহাশয়ের পাঁচ টাকা জরিমানা হইয়াছিল। এই আদেশের বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্ট অবধি লড়িয়াছিলেন। সর্বসুদ্ধ ১৭০০ ব্যয় করিয়া এই পাঁচটি টাকা জরিমানার হুকুম রহিত করাইয়াছিলেন।

মুখোপাধ্যায় যেমন অনেক টাকা উপার্জন করিতেন—তেমনই তাঁহার ব্যয়ও যথেষ্ট ছিল। তিনি অকাতরে অন্নদান করিতেন। অত্যাচরিত উৎপীড়িত গরীব লোকের মোকর্দমা তিনি কত সময় বিনা ফিসে। এমন কি নিজে অর্থব্যয় পর্যন্ত করিয়া চালাইয়া দিয়াছেন।

প্রতি রবিবার অপরাহ্নকালে পাড়ার যুবক-বৃদ্ধগণ মোক্তারমহাশযের বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া তাস-পাশা প্রভৃতি খেলিয়া থাকেন। অদ্যও সেইরূপ অনেকে আগমন করিয়াছে—পূর্বোক্ত ডাক্তারবাবু ও উকিলবাবুও আছেন। হাতিতে বাঁধিবার জন্য বাগানে খানিকটা স্থান পরিষ্কৃত করা হইতেছে; হাতি রাত্রে খাইবে বলিয়া বড়-বড় পাতাসুদ্ধ কয়েকটা কলার গাছ ও অন্যান্য বৃক্ষের ডাল কাটাইয়া রাখা হইতেছে—মোক্তারমহাশয় সেই সমস্ত তদারক করিতেছেন। মাঝে-মাঝে বৈঠকখানায় আসিয়া কোনও ব্রাহ্মণের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া দুই-চারি টান দিয়া আবার বাহির হইয়া যাইতেছেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে জয়রাম বৈঠকখানায় বসিয়া পাশা খেলা দেখিতেছিলেন। এমনসময় সেই পত্রবাহক ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"হাতি পাওয়া গেল না।"

কুঞ্জবাবু নিবাশ হইযা বলিয়া উঠিলেন,—"অ্যাঁ! —পাওয়া গেল না?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"তাই তো? সব মাটি?"

মোক্তারমহাশয় বলিলেন,—"কেন রে হাতি পাওয়া গেল না কেন? চিঠির জবাব এনেছিস?"

ভৃত্য বলিল,—"আজ্ঞে না। দেওয়ানজীকে গিয়ে চিঠি দিলাম। তিনি চিঠি নিয়ে মহারাজের কাছে গেলেন। খানিক বাদে ফিরে এসে বল্লেন, বিয়ের নেমন্তন্ন হয়েছে তার জন্য হাতি কেন? গোরুর বাড়িতে যেতে বোলো।"

এই কথা শুনিবামাত্র জয়রাম ক্ষোভে, লজ্জায়, রোষে যেন একবার ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত-পা ঠক্‌-ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুই চক্ষু দিয়া যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। মুখমণ্ডলের শিরা-উপশিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। কম্পিত স্বরে, ঘাড় বাঁকাইয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন,—"হাতি দিলে না! হাতি দিলে না!"

সমবেত ভদ্রলোকগণ ক্রীড়া বন্ধ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিলেন। কেহ-কেহ বলিলেন,—"তার আর কি করবেন মুখুয্যেমশায়! পরের জিনিস জোর তো নেই। একখানা ভালো দেখে গোরুর গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে, রাত্রি দশটা-এগারোটার সময় বেরিয়ে পড়ুন ঠিক সময় পৌঁছে যাবেন। ওই ইমামদ্দিন শেখ একজোড়া নূতন বলদ কিনে এনেছে—খুব দ্রুত যায়।"

জয়রাম বক্তার দিকে দৃষ্টিমাত্র না করিয়া বলিলেন,—"না। গোরুর গাড়িতে চড়ে আমি যাব না। যদি হাতি চড়ে যেতে পারি, তবেই যাব, নইলে এ বিবাহে আমার যাওয়াই হবে না।"

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

শহর হইতে দুই-তিন ক্রোশের মধ্যে দুই-তিনজন জমিদারে হস্তী ছিল। সেই রাত্রেই জয়রাম তত্তবং স্থানে লোক পাঠাইয়াছিলেন, যদি কেহ হস্তী বিক্রয় করে, তবে কিনিবেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় একজন ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর একটি মেনা-হাতি আছে—এখনও বাচ্ছা—বিক্রি করবে, কিন্তু বিস্তর দাম চায়।"

"কত?"

"দু'হাজার টাকা।"

"খুব বাচ্ছা?"

"না—সওয়ারি নিতে পারবে।"

"কুছ পরোয়া নেই। তাই কিনব। এখনি তুমি যাও। কাল সকালেই যেন হাতি আসে। লাহিড়ীমহাশয়কে আমার নমস্কার জানিয়ে বোলো, হাতির সঙ্গে যেন কোনও বিশ্বাসী কর্মচারি পাঠিয়ে দেন হাতি দিয়ে টাকা নিয়ে যাবে।"

পরদিন বেলা সাতটার সময় হস্তিনী আসিল। তাহার নাম—আদরিনী। লাহিড়ীমহাশয়ের, কর্মচারি রীতিমতো স্ট্যাম্প-কাগজে রসিদ লিখিয়া দিয়া দুই হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

বাড়িতে হাতি আসিবামাত্র পাড়ার তাবৎ বালক-বালিকা আসিয়া বৈঠকখানার উঠানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। দুই-একজন অশিষ্ট বালক সুর করিয়া বলিতে লাগিল,—"হাতি, তোর গোদা পায়ে নাতি।" বাড়ির বালকেরা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, এবং অপমান করিয়া তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

হস্তিনী গিয়া অন্তঃপুরদ্বারের নিকট দাঁড়াইল। মুখুয্যেমহাশয় বিপত্নীক—তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ একটি ঘটিতে জল লইয়া সভয়-পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিলেন। কম্পিত হস্তে তাহার পদচতুষ্টয়ে সেই জল একটু-একটু ঢালিয়া দিলেন। মাহুতের ইঙ্গিতানুসারে আদরিনী তখন জানু পাতিয়া বসিল। বড়বধূ তৈল ও সিন্দুরে তাহার ললাট রঞ্জিত করিয়া দিলেন। ঘন-ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। আবার দাঁড়াইয়া উঠিলে, একটা ধামায় ভরিয়া আলোচাল, কলা ও অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্য তাহার সম্মুখে রক্ষিত হইল—শুঁড় দিয়া তুলিয়া-তুলিয়া কতক সে খাইল, অধিকাংশই ছিটাইয়া দিল। এইরূপে বরণ সম্পন্ন হইলে, রাজহস্তীর জন্য পরিষ্কৃত সেই স্থানে লইয়া গিয়া তাহাকে বাঁধা হইল। রাজহস্তীর জন্য সংগৃহীত সেই কদলীকাণ্ড ও বৃক্ষশাখা আদরিনী ভোজন করিতে লাগিল।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া পীরগঞ্জ হইতে ফিরিবার পরদিন বিকালেই মহারাজ নরেশচন্দ্রের সহিত মুখোপাধ্যায়মহাশয় সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বলা বাহুল্য, হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গেলেন।

মহারাজের দ্বিতল বৈঠকখানার নিম্নে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের অপরপ্রান্তে প্রবেশের সিংহদ্বার। বৈঠকখানায় বসিয়া সমস্ত প্রাঙ্গণ ও সিংহদ্বারের বাহিরেও অনেক দূর অবধি মহারাজের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

রাজসমীপে উপনীত হইলে মুখোপাধ্যায়মহাশয় তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মোকদ্দমা ও বিষয়-সংক্রান্ত দুই-চারি কথার পর মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুখুয্যেমশায়, ও হাতিটি কার?"

মুখুয্যেমহাশয়, বিনীতভাবে বলিলেন,—"আজ্ঞে, হুজুর বাহাদুরেরই হাতি।"

মহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমার হাতি! কই, ও হাতি তো কোনও দিন আমি দেখিনি। কোথা থেকে এল?"

"'জ্ঞে, বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর কাছ থেকে কিনেছি।"

অধিকতর বিস্মিত হইয়া রাজা বলিলেন—"আপনি কিনেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবে বল্লেন আমাব হাতি?"

বিনয় কিংবা শ্লেষসূচক—ঠিক বোঝা গেল না—একটু মৃদু হাস্য করিয়া জয়রাম বলিলেন,—"যখন হুজুর বাহাদুরের দ্বারাই প্রতিপালন হচ্ছি—আমিই যখন আপনার—তখন ও হাতি আপনার বই আর কার?"

সন্ধ্যার পর গৃহে ফিবিয়া, বৈঠকখানায় বসিযা, সমবেত বন্ধুমণ্ডলীব নিকট মুখোপাধ্যায় এই কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষোভ ও লজ্জা আজ তাঁহার মুছিয়া গেল। কয়েক দিন পরে আজ তাঁহাব সুনিদ্রা হইল।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

উল্লিখিত ঘটনাব পর সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অতীত হইয়াছে—এই পাঁচ বৎসরে মোক্তার মহাশয়ের অবস্থার অনেক পবিবর্তন হইয়াছে।

নূতন নিয়মে পাশ করা শিক্ষিত মোক্তারে জেলাকোর্ট ভরিয়া গিয়াছে। শিথিল নিয়মের আইন-ব্যবসায়ীর আর কদর নাই। ক্রমে-ক্রমে মুখোপাধ্যায়মহাশয়ের আয় কমিতে লাগিল। পূর্বে যত উপার্জন করিতেন, এখন তাহাব অর্ধেক হয় কি না সন্দেহ। অথচ ব্যয় প্রতিবৎসর বর্ধিতই হইতেছে। তাঁহার তিনটি পুত্র। প্রথম দুইটি মূর্খ—বংশবৃদ্ধি ছাড়া আর কোনও কাজকর্ম করিবার যোগ্য নহে। কনিষ্ঠ পুত্রটি কলিকাতায় পড়িতেছে—সেটি যদি কালক্রমে মানুষ হয়, এইমাত্র ভরসা।

ব্যবসায়ের প্রতি মুখোপাধ্যায়ের আর সে অনুরাগ নাই—বড় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ছোকরা মোক্তারগণ, যাহাদিগকে একসময় উলঙ্গাবস্থায় পথে খেলা করিতে দেখিয়াছেন, তাহারা এখন শামলা মাথায় দিয়া (মুখোপাধ্যায় মাথায় পাগড়ি বাঁধিতেন, সেকালে মোক্তারগণ শামলা ব্যবহাব করিতেন না) তাঁহার প্রতিপক্ষে দাঁড়াইয়া চোখ-মুখ ঘুরাইয়া ফর্-ফর্ করিয়া ইংরাজিতে হাকিমকে কি বলিতে থাকে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। পার্শ্বস্থিত ইংরেজি জানা জুনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করেন, "উনি কি বলছেন?" জুনিয়ার তর্জমা করিয়া তাহাকে বুঝাইতে-বুঝাইতে অন্য প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, মুখের জবাব মুখেই রহিয়া যায়—নিষ্ফল রোষে তিনি ফুলিতে থাকেন। তাহা ছাড়া, পূর্বে হাকিমগণ মুখুয্যেমহাশয়কে যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, এখনকাব নব্য হাকিমগণ আর তাহা করেন না। ইহাদের যেন বিশ্বাস, যে ইংরাজি জানে না, সে মনুষ্যপদবাচ্যই নহে। এই সকল কারণে মুখোপাধ্যায় স্থির করিয়াছেন, কর্ম হইতে এখন অবসর গ্রহণ করাই শ্রেয়। তিনি যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার সুদ হইতে কোনও রকমে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবেন। প্রায় ষাট বৎসর বয়স হইল—চিরকালই কি খাটিবেন? বিশ্রামের সময় কি হয় নাই? বড় ছেলেটি যদি মানুষ হইত—দুই টাকা যদি রোজগার করিতে পারিত—তাহা হইলে এতদিন কোনকালে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবসর লইতেন, বাড়িতে বসিয়া

হরিনাম করিতেন। কিন্তু আর বেশি দিন চলে না। তথাপি আজি কালি করিয়া আরও এক বৎসর কাটিল।

এই সময় দায়রায় একটি খুনী মোকর্দমা উপস্থিত হইল। সেই মোকর্দমার আসামী জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে নিজ মোক্তার নিযুক্ত করিল। একজন নূতন ইংরাজ জজ আসিয়াছেন—তাঁহারই এজলাসে বিচার।

তিন দিন যাবৎ মোকর্দমা চলিল। অবশেষে মোক্তার মহাশয় উঠিয়া "জজসাহেব বাহাদুর ও এসেসার মহোদয়গণ" বলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতা শেষে, এসেসারগণ মুখোপাধ্যায়ের মক্কেলকে নির্দোষ সাব্যস্ত করিলেন—জজ সাহেবও তাঁহাদের অভিমত স্বীকার করিয়া আসামীকে অব্যাহতি দিলেন।

জজ সাহেবকে সেলাম করিয়া, মোক্তার মহাশয় নিজ কাগজপত্র বাঁধিতেছে, এমন সময় জজ সাহেব পেশকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ উকিলটির নাম কি?"

পেশকার বলিল,—"উহার নাম জয়রাম মুখার্জি। উনি উকিল নহেন, মোক্তার।"

প্রসন্নহাস্যের সহিত জজসাহেব জয়রামের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"আপনি মোক্তার?"

জয়রাম বলিলেন—"হাঁ হুজুর, আপনার তাবেদার।"

জজ সাহেব পূর্ববৎ বলিলেন,—"আপনি মোক্তার! আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনি উকিল। যেরূপ দক্ষতার সহিত আপনি মোকর্দমা চালাইয়াছেন, আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি এখানকার একজন ভালো উকিল।"

এই কথাগুলি শুনিয়া, মুখোপাধ্যায়ের সেই ডাগর চক্ষু দুইটি জলে পূর্ণ হইয়া গেল। হাতদুটি জোড় করিয়া কম্পিতকণ্ঠে,— বলিলেন, "না হুজুর, আমি উকিল নহি—আমি একজন মোক্তারমাত্র। তাও সেকালের শিথিল নিয়মের একজন মূর্খ মোক্তার। আমি ইংরাজি জানি না হুজুর। আপনি আজ আমার যে প্রশংসা করিলেন, আমি আমরণ তাহা ভুলিতে পারিব না। এই বুড়া ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করিতেছে, হুজুর হাইকোর্টের জজ হউন।"—বলিয়া, ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া মোক্তারমহাশয় এজলাস হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

ইহার পর আর তিনি কাছারি যান নাই।

৷৷ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৷৷

ব্যবসায় ছাড়িয়া কায়ক্লেশে মুখোপাধ্যায়ের সংসার চলিতে লাগিল। ব্যয় যে পরিমাণ সঙ্কোচ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা শত চেষ্টাতেও হইয়া উঠে না। সুদে সঙ্কুলান হয় না, মূলধনে হাত পড়িতে লাগিল। কোম্পানির কাগজের সংখ্যা কমিতে লাগিল।

একদিন প্রভাতে মোক্তার মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়া নিজের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় মাহুত, আদরিনীকে লইয়া নদীতে স্নান করাইতে গেল। অনেক দিন হইতেই লোকে ইঁহাকে বলিতেছিল, "হাতিটি আর কেন, ওকে বিক্রি করে ফেলুন। মাসে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা খরচ বেঁচে যাবে। কিন্তু মুখুয্যেমহাশয় উত্তর করিয়া থাকেন,—"তার চেয়ে বলো না, তোমার এই ছেলেপিলে-নাতিপুতিদের খাওয়াতে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে—ওদের একে-একে বিক্রি করে ফেল।"—এরূপ উক্তির পর আর কথা চলে না।

হাতিটিকে দেখিয়া মুখোপাধ্যায়ের মনে হইল, ইহাকে যদি মধ্যে-মধ্যে ভাড়া দেওয়া

যায়, তাহা হইলে তো কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইতে পারে। তখনই কাগজ-কলম লইয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুসাবিদা করিলেনঃ—

হস্তী ভাড়ার বিজ্ঞাপন।

বিবাহের শোভাযাত্রা, দূরদূরান্তে গমনাগমন প্রভৃতি কার্যের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকাবীর আদরিণী নাম্নী হস্তিনী ভাড়া দেওয়া যাইবে। ভাড়া প্রতিরোজ ২৲ মাত্র, হস্তিনীব খোরাকী ১৲ এবং মাহুতের খোরাকী ।।০ একুনে ৪।।০ ধার্য হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন ঠিকানায় তত্ত্ব লইবেন।

শ্রীজয়রাম মুখোপাধ্যায় (মোক্তার) চৌধুরীপাড়া।

এই বিজ্ঞাপনটি ছাপাইয়া, শহরের প্রত্যেক ল্যাম্পপোস্টে, পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষকাণ্ডে, এবং অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দেওয়া হইল।

বিজ্ঞাপনের ফলে, মাঝে-মাঝে লোকে হস্তী ভাড়া লইতে লাগিল বটে—কিন্তু তাহাতে মাসে ৮৲। ১০৲ টাকার বেশি আয় হইল না।

মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্রটি পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহার জন্য ডাক্তারখরচ, ঔষুধ-পথ্যদির খরচ, প্রতিদিন ৫৲। ৭৲ টাকার কমে নির্বাহ হয় না। মাসখানেক পরে বালকটি কথঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিল।

মেঝবধূ, ছোটবধূ, উভয়েই অন্তঃসত্ত্বা। কয়েক মাস পরেই আর দুইটি জীবের অন্নসংস্থান করিতে হইবে।

এদিকে জ্যেষ্ঠা পৌত্রী কল্যাণী দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। দেখিতে-দেখিতে যেরূপ ডাগর হইয়া উঠিতেছে, শীঘ্রই তাহার বিবাহ না দিলে নয়। নানা স্থান হইতে তাহার সম্বন্ধ আসিতেছে বটে—কিন্তু ঘর-বর মনের মতো হয় না। যদি ঘর-বর মনের মতো হইল, তবে তাহাদের খাঁই শুনিয়া চক্ষুঃস্থির হইয়া যায়। কন্যার পিতা এ সম্বন্ধে একেবারে নির্লিপ্ত। সে নেশাভাঙ করিয়া, তাস-পাশা খেলিয়া বেড়াইতেছে। যত দায়, এই ষাট বৎসরের বুড়ারই ঘাড়ে।

অবশেষে এক-স্থানে বিবাহ স্থির হইল। পাত্রটি রাজসাহী কলেজে এল্ এ. পড়িতেছে—খাইবার-পরিবার সংস্থানও আছে। তাহারা দুই হাজার টাকা চাহে—নিজেদের খবচ পাঁচ শত—আড়াই হাজার টাকা হইলেই বিবাহটি হয়।

কোম্পানির কাগজের বাণ্ডিল দিন-দিন যেরূপ ক্ষীণ হইতেছে—তাহা হইতে আবার আড়াই হাজার বাহির করা বড়ই কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। আর, শুধু তো এই একটি নহে—আরও নাতিনীরা রহিয়াছে। তাহাদের বেলায় কি উপায় হইবে?

এই সকল ভাবনা-চিন্তার মধ্যে পড়িয়া, মুখোপাধ্যায়মহাশয়ের শরীর ক্রমে ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। একদিন সংবাদ আসিল, কনিষ্ঠ পুত্রটি বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছিল, সেও ফেল হইয়াছে।

বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন,—"মুখুয্যেমশায়, হাতিটিকে বিক্রি করে ফেলুন করে নাতিনীর বিবাহ দিন। কি করবেন, বলুন। অবস্থা বুঝে তো কাজ করতে হয়। আপনি জ্ঞানী লোক, মায়া পরিত্যাগ করুন।"

মুখোপাধ্যায় আর কোনও উত্তর দেন না। মাটির পানে চাহিয়া ম্লানমুখে বসিয়া কেবল চিন্তা করেন, এবং মাঝে-মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

চৈত্র-সংক্রান্তিতে বামুনহাটে একটি বড় মেলা হয়। সেখানে বিস্তর গোরু-বাছুর-

ঘোড়া-হাতি উট বিক্রয়ার্থ আসে। বন্ধুগণ বলিলেন,—'হাতিটিকে মেলায় পাঠিয়ে দিন—বিক্রি হয়ে যাবে এখন। দুহাজারে কিনেছিলেন, এখন হাতি বড় হয়েছে—তিন হাজার টাকা অনায়াসে পেতে পারবেন।"

কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—"কি করে তোমরা এমন কথা বলছ?"

বন্ধুরা বুঝাইলেন,—"আপনি বলেন, ও আমার মেয়েব মতো। তা, মেয়েকেই কি চিরদিন ঘরে রাখা যায়? মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়, তার আর উপায় কি? তবে পোষা জানোয়ার, অনেক দিন ঘরে রয়েছে—মায়া হয়ে গেছে—একটু দেখেশুনে কোনও ভালো লোকের হাতে বিক্রি করলেই হল। যে বেশ আদর যত্নে রাখবে—কোনও কষ্ট দেবে না—এমন লোককে বিক্রি করবেন।"

ভাবিয়া-চিন্তিয়া জযরাম বলিলেন,—"তোমরা সবাই যখন বলছ—তখন তাই হোক। দাও, মেলায় পাঠিয়ে দাও। একজন ভালো খদ্দের ঠিক করো—তাতে দামে যদি দু-পাঁচশো টাকা কমও হয়, সেও স্বীকার।"

মেলাটি চৈত্র-সংক্রান্তির প্রায় পনেরো দিন পূর্বে আরম্ভ হয়। তবে শেষের চারি পাঁচ দিনই বেশি জমজমাট। সংক্রান্তির একসপ্তাহ পূর্বে যাত্রা স্থির হইয়াছে। মাহুত তো যাইবেই—মুখোপাধ্যায়মহাশযের মধ্যম পুত্রটিও সঙ্গে যাইবে।

যাত্রাব দিন অতি প্রত্যুষে মুখোপাধ্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। যাইবার পূর্বে হস্তি ভোজন করিতেছে। বাটীর মেয়েরা, বালকবালিকাগণ সজলনেত্রে বাগানে হস্তির কাছে দাঁড়াইয়া। খড়ম পায়ে দিয়া মুখোপাধ্যায়মহাশয়ও সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্বদিন দুই টাকার রসগোল্লা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন, ভৃত্য সেই হাঁড়ি হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ডালপালা প্রভৃতি মামুলি খাদ্য শেষ হইলে, মুখোপাধ্যায়মহাশয় স্বহস্তে মুঠা-মুঠা করিয়া সেই বসগোল্লা হস্তিনীকে খাওয়াইলেন। শেষে, তাহার গলার নিম্নে হাত বুলাইতে-বুলাইতে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন,—"আদর, যাও মা, বামুনহাটের মেলা দেখে এসো"। —প্রাণ ধরিয়া বিদায়বাণী উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। উদ্বেল দুঃখে—এই ছলনাটুকুর আশ্রয় লইলেন।

হাতি চলিয়া গেল। মুখোপাধ্যায় শূন্যমনে বৈঠকখানার ফরাস-বিছানার উপর গিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। অনেক বেলা হইলে, অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া বধূরা তাঁহাকে স্নান কবাইলেন। স্নানান্তে আহারে বসিলেন বটে, কিন্তু পাতের অন্ন-ব্যঞ্জন অধিকাংশই অভুক্ত পড়িয়া রহিল।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

কল্যাণীর বিবাহের সমস্ত কথাবার্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুভকার্যের দিন স্থির হইয়াছে। বৈশাখ পড়িলেই উভয় পক্ষের আশীর্বাদ হইবে। হস্তী-বিক্রযের টাকাটা আসিলেই গহনা গড়াইতে দেওয়া হয়।

কিন্তু ১লা বৈশাখ সন্ধ্যাবেলা মস-মস করিয়া আদরিনী ঘরে ফিরিয়া আসিল বিক্রয় হয় নাই বলিয়া কাহারও কোনও খেদের চিহ্ন সে সময় দেখা গেল না। যেন হারাধন ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে—সকলের আচরণে এইরূপ মনে হইতে লাগিল।

বাড়ির লোকে বলিতে লাগিল—"আহা, আদর রোগা হয়ে গেছে। বোধহয়, এ কদিন সেখানে ভালো করে'খেতে পায়নি। ওকে দিনকতক এখন বেশ করে খাওয়াতে হবে।"

আনন্দেব প্রথম উচ্ছ্বাস অপনীত হইলে, পবদিন সকলের মনে হইল—কল্যাণীব বিবাহের এখন কি উপায় হইবে?

প্রতিবেশী বন্ধুগণ আবার বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন। অত বড় মেলায় এমন ভালো হাতির খরিদ্দাব কেন জুটিল না. তাহা লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। একজন বলিলেন—"ওই যে যাবার সময় মুখুয্যেমশায় বল্লেন—'আদর, যাও মা, মেলা দেখে এসো"—তাই বিক্রি হল না। উনি তো আর আজকালকার মুর্গিখোর ব্রাহ্মণ নন—ওঁর মুখ দিয়ে যে ব্রহ্মবাক্য বেরিয়েছে, সে কথা কি নিস্ফল হবার যো আছে! কথায় বলে—ব্রহ্মবাক্য বেদ-বাক্য।"

বামুনহাটের মেলা ভাঙিয়া সেখান হইতে আরও দশ ক্রোশ উত্তরে রসুলগঞ্জে সপ্তাহব্যাপী আর-এক মেলা হয়। যে সকল গো-মহিষাদি বামুনহাটে বিক্রয় হয় না—সে সব রসুলগঞ্জে গিয়া জমে। সেইখানেই আদবিনীকে পাঠাইবার পরামর্শ হইল।

আজ আবার আদরিনী মেলায় যাইবে। আজ আব বৃদ্ধ তাহার কাছে গিয়া বিদায়সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। রীতিমত আহারাদির পর আদবিনী বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী আসিয়া বলিল. "দাদামশায়. আদব যাবাব সময় কাঁদছিল।"

মুখোপাধ্যায় শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন,—"কি বল্লি? কাঁদছিল?"

"হাঁ দাদামশায়। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে টপ-টপ কবে জল পড়ছিল।" বলিতে-বলিতে কল্যাণীর চক্ষু দিযাও ঝর-ঝব করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ আবার ভূমিতে পড়িয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসেব সহিত বলিতে লাগিলেন,—"জানতে পেবেছে। ওরা অন্তর্যামী কি না। এ বাড়িতে যে আব ফিবে আসবে না. তা জানতে পেরেছে।"

নাতিনী চলিয়া গেলে বৃদ্ধ সাশ্রুনয়নে আপনমনে বলিতে লাগিলেন—"যাবাব সময আমি যে তোর সঙ্গে দেখাও করলাম না—সে কি তোকে অনাদর করে? না মা, তা নয়। তুই তো অন্তর্যামী—তুই কি আমার মনের কথা বুঝতে পারিসনি?—খুকিব বিয়েটা হয়ে যাক। তারপর, তুই যার ঘরে যাবি, তাদেব বাড়ি গিয়ে আমি তোকে দেখে আসব। তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে যাব—রসগোল্লা নিয়ে যাব। যতদিন বেঁচে থাকব, তোকে কি ভুলতে পারব? মাঝে-মাঝে গিয়ে তোকে দেখে আসব। তুই মনে কোনও অভিমান করিসনে মা।"

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন বিকালে একটি চাষিলোক একখানি পত্র আনিয়া মুখোপাধ্যায মহাশয়ের হস্তে দিল।

পত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মধ্যমপুত্র লিখিয়াছে,—"বাটী হইতে সাত ক্রোশ দূরে আসিয়া কল্য বৈকালে আদরিনী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। সে আর পথ চলিতে পারে না। রাস্তার পার্শ্বে একটা আমবাগানে শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার পেটে বোধহয় কোনও বেদনা হইয়াছে। —শুঁড়টি উঠাইয়া মাঝে-মাঝে কাতরস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। মাহুত যথাবিদ্যা সমস্ত রাত্রি তাহার চিকিৎসা করিয়াছে—বোধহয় আদরিনী আর বাঁচিবে না। যদি মরিয়া যায়, তবে নিকটেই একটু জমি বন্দোবস্ত লইয়া তাহার শবদেহ প্রোথিত করিতে হইবে। সুতরাং কর্তামহাশয়ের অবিলম্বে আসা প্রয়োজন।"

বাড়ির মধ্যে গিয়া, উঠানে পাগলের মতো পায়চারি করিতে করিতে বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন,—"আমায় গাড়ির বন্দোবস্ত করে দাও। আমি এখনি বেরুব। আদরের অসুখ—যাতনায় সে ছটফট করছে। আমাকে না দেখতে পেলে সে সুস্থ হবে না। আমি আর দেরি করতে পারব না।"

তখনই ঘোড়ার গাড়ির বন্দোবস্ত করিতে লোক ছুটিল। বধূরা অনেক কষ্টে বৃদ্ধকে একটু দুগ্ধমাত্র পান করাইতে সমর্থ হইলেন। রাত্রি দশটার সময় গাড়ি ছাড়িল। জ্যেষ্ঠ পুত্রও সঙ্গে গেলেন। পত্রবাহক সেই চাষিলোকটি কোচবাক্সে বসিল।

পরদিন প্রভাতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া, বৃদ্ধ দেখিলেন—সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আদরিনীর সেই নবজলধরবর্ণ বিশাল দেহখানি আম্রবনের ভিতর পতিত রহিয়াছে—তাহা আজ নিশ্চল—নিঃস্পন্দ।

বৃদ্ধ তখন হস্তিনীর শবদেহের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া, তাহার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "অভিমান করে চলে গেলি মা? তোকে বিক্রি করতে পাঠিয়েছিলাম বলে তুই অভিমান করে চলে গেলি?"

ইহার পর দুইটি মাস মুখোপাধ্যায়মহাশয় জীবিত ছিলেন। স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে, আদরিনী যাঁর ঘরে গিয়াছিল, তিনিও তাঁহারই ঘরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুত সন্দেশ ও রসগোল্লা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই। আশা করি, সে রাজ্যে সন্দেশ ও রসগোল্লা অপেক্ষা লক্ষগুণে মিষ্টতর উৎকৃষ্টতর কোনও কিছুর অক্ষয় স্রোত প্রবাহিত আছে।

২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২০



কুলরক্ষা

সরোজনাথ ঘোষ

রীতিমতো একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ তখনও স্তম্ভিত হইয়া আছে। উদাস বাতাস এক-একবার হু-হু করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

পাঠশালার ছুটি দিয়া ষষ্ঠীচরণ একাকী গৃহে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার প্রাণটা আজ বাদলা হাওয়ার মতো থাকিয়া-থাকিয়া হা-হা করিয়া উঠিতেছিল। প্রকৃতির করুণা যখন ধরাতলে বৃষ্টিরূপে নামিয়া আসে, তখন বর্ষার বিচিত্র মোহে নিঃসঙ্গ মানবের মন উদাস হইয়া যায়।

ষষ্ঠীচরণের স্নেহ, প্রেম ও ভক্তির কোনও আধার ছিল না। শৈশব ও কৈশোরের মাঝখানে অদৃষ্ট কখন তাঁহার সকল স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল, সে কথা ষষ্ঠীচরণের ভালো স্মরণ হইত না। সাহিত্য ও কাব্যের আলোচনায় যৌবনের নিঃসঙ্গ অবসরটুকু অতিবাহিত হইত। অবশিষ্ট সময় পাঠশালায় ছেলে পড়াইয়া কাটিয়া যাইত।

সিক্ত বৃক্ষপত্রে মেঘের কৃষ্ণছায়া গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। নির্নিমেষনয়নে ষষ্ঠীচরণ চাহিয়া চাহিয়া কল্পনার সুদূর স্বপ্নলোকপ্রান্তে আপনাকে নির্বাসিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সহসা একজোড়া খড়মের খট-খট শব্দ হইল। ষষ্ঠীচরণ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, স্বয়ং বিদ্যালঙ্কারমহাশয়। সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ষষ্ঠীচরণ বৃদ্ধকে নমস্কার করিলেন। বিদ্যালঙ্কার স্মিতমুখে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "বস বাপু, তোমার সঙ্গে নির্জনে একটি কথা আছে।"

একটিপ নস্য লইয়া বৃদ্ধ মৃদুস্বরে বলিলেন, "সেই বিবাহের প্রস্তাবটা সম্বন্ধে কি স্থির করিলে?"

ষষ্ঠীচরণের প্রসন্ন মুখ সহসা অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি সঙ্কোচনম্রস্বরে বলিলেন, "আমার অবস্থা আপনার অবিদিত নাই। ভাবিয়া দেখিলাম, এরূপ স্থলে দারপরিগ্রহ মূর্খতামাত্র।"

ত্রস্তভাবে বিদ্যালঙ্কার বলিলেন, "তুমি যত দিন না তোমার অবস্থার উন্নতি করিতে পার, সে ভাবনা তোমার করিয়া কাজ নাই। মেয়ে আমার কাছেই থাকিবে। তাহার কোনও ভার তোমাকে লইতে হইবে না।"

ষষ্ঠীচরণ ম্লানমুখে বলিলেন, "কিন্তু শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিলেন আপনার কুলনাশ হইবে।"

বৃদ্ধ তাচ্ছিল্যভাবে হাসিয়া বলিলেন, "কুলনাশ! আমার আবার কুলনাশ কি? সমাজ তো আমরাই। আমরা যাহা করিব, সমাজ অবনতমুখে তাহাই মানিয়া চলিবে। তাহাতে প্রতিবাদ করিবে কে?"

মৃদুস্বরে ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "কিন্তু অকারণ একটা গণ্ডগোল বাধাই কেন? আপনার কন্যার বিবাহের ভাবনা কি? অনেক বড় কুলীনসন্তান আপনার মেয়েকে বিবাহ করিতে পাইলে কৃতার্থ হইয়া যাইবে। আমাকে দয়া করিয়া ক্ষমা করুন।"

বিদ্যালঙ্কার বিস্মিত হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত ষষ্ঠীচরণের শান্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কথাকয়টি কি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ? তাঁহার নির্বোধ কুৎসিত কন্যা যে ষষ্ঠীচরণেরও অযোগ্য, ষষ্ঠীচরণ প্রকারান্তরে কি তাহারই আভাস দিল?

ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ বিদ্যালঙ্কার বলিলেন, "তবে কি তোমার এ বিবাহে মত নাই?"

বাহিরে তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পুনরায় বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল। আকাশের দিকে চাহিয়া উদাসভাবে ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "এ বিবাহ বলিয়া নয়, বিবাহ কখনও করিব না, আমার এইরূপ সঙ্কল্প।"

এতখানি উপেক্ষা বিদ্যালঙ্কারের সহ্য হইল না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার মতো এত বড় কুলীন যাচিয়া শ্রোত্রিয়ে মেয়ে দিতে চাহিতেছেন, ইহাতে ষষ্ঠীচরণ একেবারে গলিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু এ কি! এই সহায়সম্পদহীন হতভাগা যুবকটা এমন নিশ্চিন্তভাবে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল! এই তীব্র অপমানে তাঁহার হৃদয় যন্ত্রণায় বিচলিত হইয়া উঠিল। বিদ্যালঙ্কার বলিলেন, "দেখো ষষ্ঠী, তোমাব বাপ থাকিলে আজ তিনি আমার কথা এমন করিয়া ঠেলিয়া ফেলিতে সাহস করিতেন না; কিন্তু কোন্ সাহসে আজ তুমি আমার এত অপমান করিলে?"

বিস্মিত ষষ্ঠীচরণ কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "আপনি রাগ করিতেছেন কেন? আমি আপনাকে কি অপমান করিলাম?"

"অপমানের বাকিটা কি রাখিলে! আমার মতো এত বড় একজন কুলীনকে তুমি অনায়াসে অবহেলা করিলে। কেন? আমাব মেয়ে কুৎসিত বলে? আরে মূর্খ, যদি কুরূপাই না হইবে, তবে তোর মতো হীন শ্রোত্রিয়ে কেন কন্যাদান করিতে যাইব?"

ষষ্ঠীচরণ ধীরে-ধীরে বলিলেন, "আমি যে কথা মনেও ভাবি নাই, আপনি কেন সে কথা বলিতেছেন? আপনার কন্যা সুন্দরী কি কুৎসিত, সে সম্বন্ধে আপনাকে কোনও কথাই বলি নাই। কেন মিথ্যা আমাকে এতটা নিচ ভাবিতেছেন?"

"কি পাষণ্ড, অর্বাচীন! আমি মিথ্যা বলিলাম? ম্লেচ্ছভাষা শিখিয়া তোর প্রকৃতি ম্লেচ্ছের মতো হইয়াছে; কাহাকে কি বলিতে হয়, এখনও শিখিস নাই!" বৃদ্ধব্রাহ্মণের পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে শিখাগ্রভাব পর্যন্ত বৈদ্যুতিক তারের মতো কাঁপিতেছিল। বৃদ্ধের হাতের লাঠি মাটিতে পড়িয়া গেল।

ষষ্ঠীচরণের শান্ত সুন্দর মুখমণ্ডল আবক্ত হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া যুবক ধীরে-ধীরে বলিলেন, "জ্ঞানতঃ আমি আপনাকে কোন-অপমানের কথা বলি নাই, আপনিই যথেচ্ছ কটু বলিতেছেন। আপনি বৃদ্ধ, পিতৃতুল্য, তাই নীরবে সহ্য করিলাম।"

বিকট বিদ্রূপ-হাস্যে কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া বিদ্যালঙ্কার বলিলেন, "বটে! কেন, তাহা না হইলে মারিতে বুঝি? বড় স্পর্দ্ধা তোর। আচ্ছা, যদি আমি সর্বেশ্বর ঠাকুরের সন্তান হই, তবে এর প্রতিফল একদিন নিশ্চয়ই পাইবি।"

কুপিত ব্রাহ্মণ খড়ম খট্-খট্ করিতে-করিতে চলিয়া গেলেন। বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি আবার নামিয়া আসিল। সেই বারিবিদ্যুৎব্যাকুল সন্ধ্যার অন্ধকারে ষষ্ঠীচরণ নীরবে বসিয়া রহিলেন।

॥ ২ ॥

সন্ধ্যার শান্ত ছায়ায় মাঠ ও গ্রাম আচ্ছন্ন হইয়াছিল। গ্রাম্য দেবালয়ে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। স্নানের ঘাট জনশূন্য। পল্লীবধূরা জল লইয়া কখন ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। খেয়াঘাটে শূন্য জেলে-ডিঙি বাঁধা। দূরে গঞ্জের নিচে হাটুরে নৌকার আলো জ্বলিতেছে।

ক্ষীণচন্দ্রালোকে শ্যামল তৃণাসনে বসিয়া ষষ্ঠীচরণ অগাধ ভাবনা-সমুদ্রে নিমগ্ন।

স্বজনশূন্য জীবনটা কি এমনই ভাবে একদিন অজ্ঞাত অন্ধকারে মিশিয়া যাইবে! স্নেহ, প্রেম ও ভালোবাসার দাবিস্বরূপ কেহ কি কখনও তাঁহার শূন্যহৃদয়ে মুহূর্তের জন্যও একটা চিহ্ন অঙ্কিত করিবে না?

পরপারের ছায়ালোকচিত্রিত বনানীকুঞ্জ হইতে একটা অলস গন্ধ বাতাসে বহিয়া আসিল। সহসা বিদ্যালঙ্কারের ক্রোধদীপ্ত মুখমণ্ডল, সঙ্গে-সঙ্গে শেষ কথাকয়টি ষষ্ঠীচরণের মনে পড়িল। অবিশ্বাস ও ঘৃণার হাস্যরেখা তাঁহার মুখে দীপ্ত হইয়া উঠিল। দাম্ভিকতা কি মানুষকে এতটা আত্মসম্ভ্রমচ্যুত করিতে পারে? বিদ্যালঙ্কার গ্রামের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারবাবুদের কুলপুরোহিত। ইচ্ছা করিলে তিনি ষষ্ঠীচরণের অনেক অনিষ্ট করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভয় কি? যাহার আপনার বলিবার কেহ নাই, তাহার পক্ষে সংসারের সুখ-দুঃখ অতি তুচ্ছ।

নদীর জলে কলসী ডুবাইবার শব্দ হইল। স্নানের ঘাটে কে জল তুলিতেছিল। ষষ্ঠীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পঞ্চমীর ক্ষীণচন্দ্র আকাশের কোলে ঢুলিয়া পড়িতেছিল। তিনি ধীরে-ধীরে পাড়ের দিকে উঠিতে লাগিলেন।

আর একজন কলসীকক্ষে ধীরে-ধীরে ঘাটের পথে আসিতেছিল। সহসা ষষ্ঠীচরণের বিষাদক্ষীণ মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কোমলকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কে ও? কমল?"

পরিচিত কণ্ঠের আহ্বান শুনিয়া বালিকা মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ।"

"তুমি এত রাত্রে একা ঘাটে আসিয়াছ?"

পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে কমল বলিল, "ঠাকুরমার অজ বড় জ্বর এসেছে। এতক্ষণ তাঁর কাছে বসেছিলুম। এখন তিনি একটু ঘুমিয়েছেন দেখে তাড়াতাড়ি জল নিতে এসেছি।"

ষষ্ঠীচরণ ব্যস্তভাবে বলিলেন, "ঠাকুরমার আবার জ্বর হল? চলো, তোমাকে বাড়ি রেখে আসি, অমনি ঠাকুরমাকে দেখে আসব।"

পথে উভয়ে আর কোনও কথা কহিলেন না। কমল আনতমুখে অগ্রে চলিল। পশ্চাতে ষষ্ঠীচরণ বুকভরা ভাবনা লইয়া তাহার অনুসরণ করিলেন।

॥ ৩ ॥

রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে গ্রামখানি নিস্তব্ধপ্রায়। প্রখর গ্রীষ্মের উত্তাপে পাখিরা পত্রাচ্ছন্ন নীড়ে লুকাইয়াছে। কেবল নিঃসঙ্গ ঘুঘুর করুণতান মৌনমুগ্ধ মধ্যাহ্নের নীরবতায় একটু সুর বাঁধিয়া দিতেছিল।

গ্রামের একপ্রান্তে একখানি কুটির। ঘরের দাওয়ার উপর মাদুর বিছাইয়া কমল মহাভারত পড়িতেছিল। ঠাকুরমা মালা করিতে-করিতে নিবিষ্টচিত্তে সেই পুণ্যকথা শুনিতেছিলেন। একমাসের দীর্ঘ পীড়ার যন্ত্রণা তাঁহার শীর্ণ কপোলে, জীর্ণ দেহে স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

মাঠের উপর দিয়া রৌদ্রতপ্ত বাতাস শুষ্কপত্রে মর্মরধ্বনি জাগাইয়া মাঝে-মাঝে ছুটিয়া আসিতেছিল। সেই সুনীরব আলোকমগ্ন মধ্যাহ্নে কমলের মৃদুকণ্ঠোচ্চারিত মহাভারতের কাহিনী সঙ্গীতের মতো চারি-দিকে একটা স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিতেছিল।

উঠানে পদশব্দ হইল। কমল চাহিয়া দেখিল, ষষ্ঠীচরণ। কমল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

ঠাকুরমা ব্যস্তভাবে বলিলেন, "এস দাদা, বস।"

ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "কয়দিন আসিতে পারি নাই। আজ কেমন আছেন ঠাকুরমা?"

"আর দাদা, এখন মরণ হলেই বাঁচি। মরিতে তো বসিয়াছিলাম, পোড়া যম মাঝপথে ছেড়ে দিলে। আর কষ্ট সইতে পারি না ভাই! সবাই আমার ঘাড়ে দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সরে গেছে। সব যন্ত্রণা কেবল আমাকেই ভোগ করতে হচ্ছে। তবু কমলের যদি একটা গতি হতো!"

ঠাকুরমা নিশ্বাস ফেলিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। ষষ্ঠীচরণ স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "ভয় কি ঠাকুরমা, ভগবান মুখ তুলে চাইবেন বইকি। কৃষ্ণদেবপুরের সে সম্বন্ধটার কি হল?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "সে ভরসা গেছে। গরীব কুলীনের মেয়ে কেউ নিতে চায় না। তাতে যে রকম জ্ঞাতিশত্রু, তারা ভাঙচি দিয়ে এ সম্বন্ধটাও ভাঙিয়া দিয়াছে।"

"এ সম্বন্ধ ভেঙে গেল কেন ঠাকুরমা?"

বৃদ্ধা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিলেন, "শত্রুরা রটাইয়াছে, মেয়েটি লেখাপড়া শিখেছে। আর তুমি আমাদের উপর দয়াধর্ম করে দেখ-শোন, সদাসর্বদা যাওয়া-আসা করো, তাইতে তোমাদের নামে একটা মিথ্যা নিন্দা রটিয়েছে। এই সব শুনে তাদের মন ভেঙে গেছে। সেই অবধি আর কোন সম্বন্ধ আসছে না।"

ষষ্ঠীচরণ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। মিথ্যা অপবাদ! এ কথা উচ্চারণ করিবার সময় তাহাদের পাপ-রসনা খসিয়া পড়ে নাই! মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়া তাহাদের কি স্বার্থ সিদ্ধ হইল? তিনি এই নিরাশ্রয় দরিদ্র দুইটিকে অভাবের সময় সাহায্য করেন, তাহাতে কাহার কি ক্ষতি? কমলকে তিনি যত্নে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, তাহার পরিণাম এই দুরপনেয় কলঙ্ক! রুদ্ধকণ্ঠে ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "ঠাকুরমা, আমার জন্য কমলের বিবাহ-সম্বন্ধ পর্যন্ত ভাঙিয়া গেল, তার উপর আবার এত বড় কলঙ্ক? কি করিলে এ কলঙ্ক মুছিয়া যায় ঠাকুরমা? যদি আমি আর আপনাদের সংস্রবে না আসিলে মঙ্গল হয়, তবে আজ হইতে আর এখানে আসিব না।"

বৃদ্ধা সকাতরে বলিলেন, "যাহা হইবার, তাতো হয়ে গেছে। কলঙ্ক যা রটেছে, তা আর মুছিবার নয়। তাই বলে দাদা, তুমিও আমাদের প্রতি বিমুখ হইও না। এ গ্রামে তুমি ছাড়া আর কেউ আমাদের মুখের পানে চায় না। অদৃষ্টে যা লেখা আছে, তা কে খণ্ডাবে বল? মা মঙ্গলচণ্ডী সব দেখছেন, তাঁর বিচারে যা হয়, তাই ভালো। তুমি দাদা আমাদের উপর রাগ করো না।"

দরজার আড়ালে থাকিয়া উদ্বেলিতহৃদয়ে কমল সকল শুনিতেছিল। তাহার আয়ত চক্ষু দুইটি মর্মান্তিক দুঃখে, ব্যর্থ অভিমানে ও ক্ষোভে ছল-ছল করিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "এমন কোনও উপায় নাই কি, যাহাতে সকল দিক রক্ষা পায়?"

ঠাকুরমা উদাসভাবে বলিলেন, "কি আর আছে দাদা?"

ষষ্ঠীচরণ অবনতমুখে ধীরে-ধীরে বলিলেন, "আমি একটা উপায় ঠিক করিয়াছি। আপনারা কুলীন, আমি শ্রোত্রিয়। যদি অন্য কোনও বাধা না থাকে, তাহা হইলে কমলকে আমার হাতে সমর্পণ করুন। আমার নিন্দা, আমার কলঙ্কভার আমিই বহন করিব।"

বৃদ্ধা প্রথমে কথাটা ভালো করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। মানুষ যে সম্বন্ধে আশার একটা কাল্পনিক দুর্গ গঠন করিয়া লয়, সেটা সহসা যদি সত্যই বাস্তবে পরিণত হইয়া যায়, তখন সেই সম্ভবটাও অসম্ভবের মতো বোধহয়। অনেক দিনের দুরাশা সত্যে পরিণত হইল দেখিয়া বৃদ্ধার আনন্দের অবধি রহিল না।

আনন্দ-উচ্ছ্বাসে বৃদ্ধার মুখমণ্ডলে যখন একটু সংযত ভাব ধারণ করিল, তখন তিনি বলিলেন, "ছাই কুলমান। কাহার জন্য কুল? কমল তোমারই হইবে দাদা। কিন্তু কাজটা একটু গোপনে ও সাবধানে করিতে হইবে। জ্ঞাতিশত্রুদের মনে কি আছে, জানি না; সুতরাং কাজ শেষ না হওয়া অবধি তাদের বিশ্বাস নাই।"

ষষ্ঠীচরণ চিন্তিতভাবে বলিলেন, "কি করিতে হইবে?"

বৃদ্ধা অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলেন, "কমলকে কিছুদিনের মতো দেবীপুরে পাঠাইয়া দিব। সেখানে আমার দূর সম্পর্কের এক ভাই আছেন। কয়েকদিন পরে তুমিও গোপনে সেখানে যাবে। খরচপত্র দিলে তাঁরা সব যোগাড় করে বিয়ে দিয়ে দেবেন। তা হলে আর আগে কিছু গোল হবে না। আমি যাব না, এখানেই থাকব। সুতরাং জ্ঞাতিরা কোনও রকম সন্দেহও করতে পারবে না। বাধাও দিতে পারবে না।"

এই পরামর্শই ঠিক হইয়া গেল।

॥ ৪ ॥

বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক ষষ্ঠীচরণ যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন সংবাদটা গ্রামের মধ্যে পুরাতন হইয়া গিয়াছিল। বধূ বরণ করিবার জন্য ষষ্ঠীচরণের শূন্য গৃহে কাহারও নূপুরগুঞ্জন বা বলয়নিক্কণ শোনা গেল না। গৃহলক্ষ্মী নিজের ঘরে নিজেই প্রবেশ করিল।

একপক্ষের আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া নূতন সংসার পাতাইবার আয়োজন করিতে বেলা গড়াইয়া পড়িল। ঠাকুরমাকে যে আনিতে গিয়াছিল, সে আসিয়া বলিল, "বিদ্যালঙ্কার ঠাকুর তাঁহাকে এখন ছাড়িয়া দিলেন না, কাল সকালে তিনি আসিবেন।"

ধীরে-ধীরে জ্যোৎস্নালোক পর্ণকুটীরের উপর তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলিয়া কখন নিভিয়া গিয়াছে।

আহারাদির পর ষষ্ঠীচরণ শয্যায় আসিয়া বসিলেন। কমল সলজ্জ-কোমল-পদক্ষেপে পানের ডিবা হাতে করিয়া স্বামীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পত্নীর ব্রীড়ানম্র মুখখানি বুকের উপর স্থাপিত করিয়া ষষ্ঠীচরণ কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "কমল! তুমি যে আমার সহধর্মিণী, এ কথা এখনও আমার স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। এত সুখ আমার অদৃষ্টে সহিবে কি?"

সুখাবেশে কমলের কমলনয়নপল্লব নিমীলিত হইয়া আসিয়াছিল। চন্দ্রকরপ্লাবিত অরণ্যকুঞ্জ হইতে পাপিয়ার দূরশ্রুত হৃদয়োচ্ছ্বাস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ঝিল্লীমুখরিত যামিনীর স্বপ্নালুসংস্পর্শে নিখিল বিশ্ব সুপ্তিমগ্ন হইয়া পড়িতেছিল।

"যাও কমল, বড় পরিশ্রম করিয়াছ, আহার করিয়া আইস।" স্বামীর স্নেহপাশ হইতে আপনাকে ধীরে-ধীরে মুক্ত করিয়া কমল গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

আরাম করিয়া ষষ্ঠীচরণ শয্যায় শয়ন করিতে যাইতেছেন, এমনসময় বাহিরে কেহ ডাকিল, "ঠাকুরমহাশয়! বাড়ি আছেন?"

বিরক্তস্বরে ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "কে হে বাপু, এত রাত্রে ডাকাডাকি কেন?"

যে ডাকিয়াছিল, সে বলিল, "একবার বাহিরে আসুন, বিশেষ দরকার আছে।"

চারি-পাঁচ ব্যক্তি আলোকহস্তে বাহিরের উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল। ষষ্ঠীচরণ নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কে ও? সনাতন না কি?"

সনাতন প্রণাম করিয়া ষষ্ঠীচরণের হাতে একখানি পত্র দিল। ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "কিসের চিঠি?" সনাতন উত্তর করিল, "পড়িয়া দেখুন।"

একজন একটা আলো তুলিয়া ধরিল। ষষ্ঠীচরণ নিঃশব্দে পাঠ করিলেন। সহসা তাঁহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। এ কি রহস্য, এ কি বিদ্রূপ!

সনাতন বলিল, "দাদাঠাকুর, বাবু আপনাকে চিঠিখানা দিতে বললেন, আর অমনি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছেন।"

ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "দাঁড়াও, আমি আসিতেছি।" দরজা আগুলিয়া সনাতন বাধা দিয়া বলিল, "মাপ করবেন, দাদাঠাকুর; আমরা হুকুমের চাকর, হুকুম তামিল করব। বাড়ির মধ্যে এখন যেতে পাবেন না, আমাদের উপর এমন হুকুম নাই।"

ক্রোধে, ক্ষোভে ষষ্ঠীচরণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, চলো।"

॥ ৫ ॥

জমিদারবাবুদের বহির্বাটীর প্রাঙ্গণতল ও কক্ষগুলি মুণ্ডিতশীর্ষ ব্রাহ্মণে পরিপূর্ণ। হুঁকার শব্দ, তাম্রকূটের ধূম ও বচনজালে সভাতল কুজ্ঝটিকামগ্ন শব্দপূর্ণ সাগরের মতো বোধ হইতেছিল। চারিদিকে কেবল শিখাকণ্টকিত মস্তক সারি-সারি বিচিত্র ভঙ্গিতে দুলিতেছে, হেলিতেছে।

সেই জনতা ভেদ করিয়া ষষ্ঠীচরণ যখন জমিদারবাবুর কাছে নীত হইলেন, তখন সংক্ষুব্ধ জনমণ্ডলী যেন মন্ত্রবলে সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল। চারিদিকে কেবল একটু অস্ফুট কানাকানি ও ঠারাঠারি চলিতে লাগিল।

ক্ষোভে, দুঃখে, রাগে ষষ্ঠীচরণের সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। তিনি জমিদারবাবুকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিলেন, "আমি আপনাদের আশ্রিত প্রজা। এই দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তানের উপর রাত্রি দ্বিপ্রহরে এ কি অত্যাচার হুজুর? আবার এই দেখুন, মহাশয়ে নাম দিয়া দুষ্ট লোকে কিরূপ একটা মিথ্যা পত্র লিখিয়াছে।"

পত্রখানি দেখিয়া জমিদার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মিথ্যা নহে! এ পত্র আমারই অনুমতিক্রমে লিখিত হইয়াছে।"

বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "সে কি! কি বলিতেছেন? স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা কমলকে তো আমিই বিবাহ করিয়াছি। দেবীপুরের সর্বানন্দ ঠাকুর যথাশাস্ত্র আমাদের বিবাহ দিয়াছেন।"

জমিদার কৃষ্ণশঙ্কর উচ্চহাস্যে বলিলেন, "আশ্চর্য করিলে! তুমি আবার তাহাকে বিবাহ করিলে কবে? কি বলেন বিদ্যালঙ্কারমহাশয়?"

বিদ্যালঙ্কার বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "অদ্ভুত গল্প বটে! লোকটা খুব ধড়িবাজ তো!"

ষষ্ঠীচরণ বিদ্যালঙ্কারের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। বৃদ্ধের নয়নে প্রতিহিংসার জ্বালাময় অগ্নি জ্বলিতেছিল! শিহরিয়া ষষ্ঠীচরণ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "হুজুরের বিশ্বাস না হয়, কমলের ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি সব জানেন।"

বিদ্যালঙ্কারের পার্শ্বে স্বপ্নমুগ্ধার মতো বৃদ্ধা বসিয়া বসিয়া কাঁপিতেছিলেন। জমিদার গম্ভীরস্বর উন্নত করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরুণ, ষষ্ঠী বলিতেছে, সে কমলকে বিবাহ করিয়াছে, আপনি স্বচক্ষে সে বিবাহ দেখিয়াছেন?"

ভয়ে বৃদ্ধার হাত-পা ঠক-ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বিদ্যালঙ্কারের দিকে চাহিয়া

বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হইয়া আসিল। অস্ফুটস্বরে তিনি বলিলেন, "না, আমি চোখে দেখিনি, তবে—"

বিদ্যালঙ্কার চিৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সংক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "সকলে শুনিলেন, উনি কি বলিলেন? এ বিবাহ তিনি স্বচক্ষে দেখেন নাই। বিবাহ হইলে তবে তো দেখিবেন? আরে, আমরা হলেম জ্ঞাতি, আত্মীয়, আমরা কিছুই জানলেম না, শুনলেম না, মেয়ের ঠাকুরমা পর্যন্ত জানলে না, আর এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপার হয়ে গেল! এও কখনও সম্ভব?"

জমিদারবাবু আবার বৃদ্ধাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি সে সময় উপস্থিতও ছিলেন না?"

বৃদ্ধার পদতল হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া সরিয়া যাইতেছিল। এ কি হল? তিনি কি বলিলেন? কি সর্বনাশ করিলেন? তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন?

বিদ্যালঙ্কার ধমক দিয়া বলিলেন, "চুপ করে রইলে কেন খুড়ি? বলে ফেল, তুমি সেদিন কোথায় ছিলে? আমার কাছে ছিলে কি না?"

যে কথাগুলি বৃদ্ধা বলিবেন বলিয়া গুছাইয়া আনিয়াছিলেন, বিদ্যালঙ্কারের তীব্র ভর্ৎসনায় সব গোলমাল হইয়া গেল। তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "হাঁ বাবা, তোমার ওখানেই ছিলাম।"

তখন বিদ্যালঙ্কার স্বর আরও উচ্চ করিয়া বলিলেন, "এখন সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, কি রকম ভয়ানক চক্রান্ত করিয়া আমাদের নির্মল কুলে কালি দিবার জন্য ধূর্ত ষষ্ঠীচরণ চেষ্টা করেছে। আত্মীয়, স্বজন, জ্ঞাতি, বন্ধু, কেহ জানিল না, কেহ শুনিল না,— এমন বিবাহ কখনও হইতে পারে? আর আমি সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের সন্তান, আমি না-জানিয়া না-শুনিয়াই কি আবার বিবাহের বিধি দিতে পারি? দেখ হে কৃষ্ণশঙ্কর, তোমার রাজত্বে বাস করে ব্রাহ্মণের কুল-মান-ইজ্জত পর্যন্ত রক্ষা করা দায় হয়ে উঠল।"

তখন সেই অসংখ্য ব্রাহ্মণ চিৎকার করিয়া বলিল, "দোহাই রাজাবাবুর, আমাদের মান ইজ্জত ধর্ম রক্ষা করো। বিদ্যালঙ্কার সত্যই বলিয়াছেন। এমন ব্যবস্থা তিনি দিতে পারেন না।"

বৃদ্ধা কি বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু কোলাহলে সে ক্ষীণ কণ্ঠ কোথায় মিলিয়া গেল। ষষ্ঠীচরণ ক্ষোভে-ক্রোধে অধরদংশন করিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা নিষ্ঠুর রাক্ষসের মূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল।

একখানি বস্ত্রাবৃত ডুলি আসিয়া থামিল। শঙ্কামলিন কমলের বেপমান দেহ দুই জন দাসী প্রায় টানিয়া বাহির করিল।

ষষ্ঠীচরণের সমুদায় ধমনীতে একটা তীব্র জ্বালাময় আগুনের স্রোত বহিয়া গেল। একলম্ফে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মুহূর্তে আট দশ জন বলিষ্ঠ লোক তাঁহাকে সজোরে চাপিয়া ধরিল। উন্মার্তত্তের মতো চিৎকার করিয়া ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, "দোহাই হুজুরের, আপনি দেশের রাজা, গরীবের মা বাপ। এমন নিদারুণ অবিচার, অধর্ম করিবেন না। কমলকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, আমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া উহাকে বিবাহ করিয়াছি কি না।"

দাসীদের বাহুবেষ্টনের মধ্যে শরীরের পূর্বাবর্ধ উদ্যত করিয়া উন্মুখ-তরঙ্গের ন্যায় কমল স্বামীর নিকট যাইতে চাহিল।

' "খবরদার!" বিদ্যালঙ্কার বাঘের মতো গর্জিয়া উঠিলেন। তারপর জ্বলন্ত আগুনের মত ষষ্ঠীচরণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চুপ কর লম্পট! তোর সঙ্গে উহার বিবাহই হইতে পারে না। কেহ জানিল না, কেহ সম্প্রদান করিল না, বিবাহ!"

চারিদিক হইতে অসংখ্য কণ্ঠে শব্দ হইল, "কখনও হইতে পারে না, কখনও হয় নাই।"

জমিদার কৃষ্ণশঙ্কর বলিলেন, "পাত্র হাজির আছে?" বিদ্যালঙ্কার এক ষষ্ঠিবর্ষীয় বৃদ্ধকে দেখাইয়া দিলেন।

কৃষ্ণশঙ্কর বলিলেন, "আপনি এ বিবাহে সম্মত আছেন?"

বৃদ্ধ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ। কুলীনের কুলরক্ষা করাই আমাদের ব্যবসায়।"

কাঁপিতে-কাঁপিতে কমল মূর্ছিত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

বিদ্যালঙ্কার বলিলেন, "ওরে! বাজনা বাজা।"

চিৎকার, ক্রুদ্ধ-গর্জন ডুবাইয়া দিয়া বাজনা বাজিয়া উঠিল। বিদ্যালঙ্কার সম্প্রদানকর্তার আসন গ্রহণ করিলেন।

ষষ্ঠীচরণের দৃষ্টি হইতে সমুদায় আলোক যেন সহসা অন্তর্হিত হইল। আকুঞ্চিত মাংসপেশী নিষ্ফল আক্রোশে স্ফীত হইয়া উঠিল। তাঁহার বুকের উপর কে যেন পর্বত চাপিয়া ধরিল। তিনি যন্ত্রণারুদ্ধকণ্ঠে একবার চিৎকার করিয়া বলিলেন, "বিদ্যালঙ্কার, ব্রাহ্মণের সর্বনাশ করিও না; রক্ষা করো, ক্ষমা করো।"

প্রত্যুত্তরে দ্বিগুণরবে বাদ্য বাজিয়া উঠিল। হোমের আগুন আরও উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। একখানি শীর্ণ কঙ্কালসার হস্তের উপর আর একখানি স্পন্দনহীন শিথিল হস্ত রাখিয়া বিদ্যালঙ্কার ফুলের মালা ও বস্ত্রের বন্ধন দৃঢ় করিয়া দিলেন।

১৩শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩০৯

অনুপমার প্রেম

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

বিরহ

একাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে অনুপমা নবেল পড়িয়া-পড়িয়া মাথাটা একেবারে বিগড়াইয়া ফেলিয়াছে। সে মনে করিল, মনুষ্য-হৃদয়ে যত প্রেম, যত মাধুরী, যত শোভা, যত সৌন্দর্য, যত তৃষ্ণা আছে, সব খুঁটিয়া বাছিয়া একত্রিত করিয়া নিজেব মস্তিষ্কের ভিতর জমা করিয়া ফেলিয়াছে; মনুষ্য-স্বভাব, মনুষ্য-চরিত্র, তাহার নখদর্পণ হইয়াছে। জগতে শিখিবার পদার্থ আর তাহার কিছুই নাই; সব জানিয়া ফেলিয়াছে, সব শিখিয়া ফেলিয়াছে। সতীত্বের জ্যোতি সে যেমন দেখিতে পায়, প্রণয়ের মহিমা সে যেমন বুঝিতে পারে, জগতে আর যে কেহ তেমন সমঝদার আছে, অনুমপা তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না।

অনু ভাবিল, সে একটি মাধবীলতা; সম্প্রতি মঞ্জরিয়া উঠিতেছে, এ অস্থায় আশু সহকার-শাখা-বেষ্টিতা না হইলে, ছোট ছোট কুঁড়িগুলি কিছুতেই পূর্ণ বিকশিত হইতে পারিবে না। তাই খুঁজিয়া পাতিয়া একটি নবীনকান্তি-সহকার মনোনীত করিয়া লইল এবং দুই-চারি দিবসেই তাহাকে মন-প্রাণ জীবন-যৌবন সহ দিয়া ফেলিল। মনে-মনে মন দিবার বা নিবার সকলেরই সমান অধিকার, কিন্তু জড়াইয়া ধরিবার পূর্বে সহকারটার মতামতের ঈষৎ প্রয়োজন হয়। এইখানেই মাধবীলতা কিছু বিপদে পড়িয়া গেল। নবীন নীরোদকান্তকে সে কেমন করিয়া জানাইবে যে, সে তাহার মাধবীলতা—স্ফুটনোন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাকে আশ্রয় না দিলে এখনই কুঁড়ির ফুল লইয়া মাটিতে লুটাইতে-লুটাইতে প্রাণত্যাগ করিবে।

কিন্তু সহকার এতো জানিতে পারিল না। না জানুক, অনুপমার প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অমৃতে গরল, সুখে দুঃখ, প্রণয়ে বিচ্ছেদ চিরপ্রসিদ্ধ। দুই-চারি দিবসে অনুপমা বিরহ-ব্যথায় জর্জরিত-তনু হইয়া মনে-মনে বলিল, স্বামিন্ তুমি আমাকে লও বা না লও, ফিরিয়া চাহ বা না চাহ, আমি তোমার চিরদাসী। প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, কিন্তু তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না। এ জন্মে না পাই, আর-জন্মে নিশ্চয়ই পাইব; তখন দেখিবে, সতী-সাধ্বীর ক্ষুদ্র বাহুতে কত বল!

অনুপমা বড়লোকের মেয়ে, বাটী সংলগ্ন উদ্যানও আছে। মনোরম সরোবরও আছে; সেথা চাঁদও উঠে, পদ্মও ফুটে, কোকিলও গান গায়, মধুপও ঝঙ্কার করে; এইখানে সে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বিরহ-ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল। এলোচুল করিয়া অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া, গাত্রে ধূলি মাখিয়া, প্রেমের যোগিনী সাজিয়া, সরসীর জলে কখনও মুখ দেখিতে লাগিল; কখনও নয়ন-জলে ভাসাইয়া গোলাপ-পুষ্প চুম্বন করিতে লাগিল; কখনও অঞ্চল পাতিয়া তরুতলে শয়ন করিয়া হা-হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল; আহারে রুচি নাই, শয়নে ইচ্ছা নাই, সাজসজ্জায় বিষম বিরাগ, গল্প-গুজবে রীতিমত বিরক্তি—অনুপমা দিন-দিন শুকাইতে লাগিল।

দেখিয়া-শুনিয়া অনুর জননী মনে-মনে প্রমাদ গণিলেন—এক বই মেয়ে নয়, তার আবার এ কি হইল? জিজ্ঞাসা করিলে সে কি-যে বলে, কেহ বুঝিতে পারে না; ঠোঁটের কথা ঠোঁটেই মিলাইয়া যায়, অনুর জননী একদিবস জগবন্ধুবাবুকে বলিলেন, ওগো, একবার কি চেয়ে দেখবে না? তোমার একটি বই মেয়ে নয়, সে যে বিনি চিকিৎসায় মরে যায়।

জগবন্ধুবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কি হল ওর?

তা জানিনে। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া-শুনিয়া বলিলেন, অসুখ-বিসুখ কিছু নাই।

তবে এমন হয়ে যায় কেন?

জগবন্ধুবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তা কেমন করে জানব?

তবে মেয়ে আমার মরে যাক?

এ তো বড় মুশকিলের কথা, জ্বর নেই, বালাই নেই, শুধু-শুধু যদি মরে যায় তো আমি কি ধরে রাখব?

গৃহিণী শুষ্কমুখে বড়বধূমাতাব নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, বউমা, অনু আমার এমন করে বেড়ায় কেন?

কেমন করে জানব মা?

তোমাদের কাছে কি কিছু বলে না?

কিছু না।

গৃহিণী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন,—তবে কি হবে? না-খেয়ে না-শুয়ে এমন করে সমস্তদিন বাগানে ঘুরে বেড়ালে কদিন আর বাঁচবে? তোরা বাছা যা হোক একটি বিহিত করে দে—না হলে বাগানের পুকুরে একদিন ডুবে মবব।

বড়বউ কিছুক্ষণ ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিল, দেখে-শুনে একটা বিয়ে দাও; সংসারের ভার পড়লে আপনি সব সেরে যাবে।

বেশ কথা, তবে আজই এ কথা আমি কর্তাকে জানাব।

কর্তা এ কথা শুনিয়া অল্প হাসিয়া বলিলেন, কলিকাল! দাও—বিয়ে দিয়েই দেখো, যদি ভালো হয়।

পরদিন ঘটক আসিল। অনুপমা বড়লোকের মেয়ে, তাহাতে রূপবতী, পাত্রের জন্য ভাবিতে হইল না। একসপ্তাহের মধ্যেই ঘটকঠাকুর পাত্র স্থির করিয়া জগবন্ধুবাবুকে সংবাদ দিলেন। কর্তা এ কথা গৃহিণীকে জানাইলেন; গৃহিণী বড়বউকে জানাইলেন; ক্রমে অনুপমাও শুনিল।

দুই-একদিন পরে, একদিন দ্বিপ্রহরের সময়ে সকলে মিলিয়া অনুপমার বিবাহের গল্প করিতেছিল, এমন সময়ে সে এলোচুলে, আলুথালু-বসনে একটা শুষ্ক গোলাপফুল হাতে করিয়া ছবিটির মতো আসিয়া দাঁড়াইল। অনুর জননী কন্যাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, মা যেন আমার যোগিনী সেজেছেন!

বড়বউঠাকরুণও একটু হাসিয়া বলিল, বিয়ে হলে কোথায় সব চলে যাবে। দুটো-একটা ছেলে-মেয়ে হলে তো কথাই নেই।

অনুমপা চিত্রার্পিতার ন্যায় সকল কথা শুনিতে লাগিল। বউ আবার বলিল, মা ঠাকুরঝির বিয়ের কবে দিন ঠিক হল?

দিন এখনও কিছু ঠিক করা হয়নি।

ঠাকুরজামাই কি পড়েন?

এইবার বি. এ. দেবেন।

তবে তো বেশ ভালো বর। তাহার পর একটু হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিল, দেখতে কিন্তু খুব ভালো না হলে ঠাকুরঝির আমার পছন্দ হবে না।

কেন পছন্দ হবে না? জামাই আমার বেশ দেখতে।

এইবার অনুপমা একটু গ্রীবা বক্র করিল; ঈষৎ হেলিয়া পদনখ দিয়া মৃত্তিকা খনন করিবার মত করিয়া নখ খুঁড়িতে-খুঁড়িতে বলিল, বিবাহ আমি করব না।

জননী ভালো শুনিতে না-পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মা?

বড়বউ অনুপমার কথা শুনিতে পাইয়াছিল। খুব জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, ঠাকুরঝি বলছে, ও কখনও বিয়ে করবে না।

বিয়ে করবে না?

না।

না করুক গে! অনুর জননী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

গৃহিণী চলিয়া যাইলে বড়বধূ বলিল, তুই বিয়ে করবি নে?

অনুপমা পূর্বমত গম্ভীরমুখে বলিল, কিছুতেই না।

কেন?

যাকে-তাকে গছিয়ে দেওয়ার নামই বিবাহ নয়! মনের মিল না হলে বিবাহ করাই ভুল।

বড়বউ বিস্মিত হইয়া অনুর মুখপানে চাহিয়া বলিল, গছিয়ে দেওয়া আবাব কি লো? গছিয়ে দেবো না তো কি মেয়েমানুষে দেখে-শুনে পছন্দ করে বিয়ে করবে?

নিশ্চয়!

তবে তোর মতে আমার বিয়েটাও ভুল হয়ে গেছে? বিয়ের আগে তো তোর দাদার নাম পর্যন্ত আমি শুনিনি।

সবাই কি তোমার মতো?

বউ আর একবার হাসিয়া বলিল, তোর কি তবে মনের মানুষ জুটেছে নাকি?

অনুপমা বধূঠাকুরাণীর সহাস্য বিদ্রূপে মুখখানি পূর্বাপেক্ষা চতুর্গুণ গম্ভীর করিয়া বলিল, বউ, ঠাট্টা করছ নাকি? এখন কি বিদ্রূপের সময়?

কেন লো—হয়েচে কি?

হয়েচে কি? তবে শোন—অনুপমার মনে হইল, তাহার সম্মুখে তাহার স্বামীকে বধ করা হইতেছে—সহসা কতলু খাঁর দুর্গে বধমঞ্চ-সম্মুখে বিমলা ও বীরেন্দ্র সিংহের দৃশ্য তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল। অনুপমা ভাবিল, তাহারা যাহা পারে, সে কি তাহা পারে না? সতী স্ত্রী জগতে কাহাকে ভয় করে? দেখিতে-দেখিতে তাহার চক্ষু অনৈসর্গিক প্রভায় ধকধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে অঞ্চলখানা কোমরে জড়াইয়া গাছকোমর বাঁধিয়া ফেলিল। ব্যাপার দেখিয়া বড়বধূ তিন হাত পিছাইয়া গেল। নিমেষে অনুপমা পার্শ্ববতী খাটের খুরো বেশ জড়াইয়া ধরিয়া ঊর্ধ্বনেত্রে চিৎকার করিয়া কহিতে লাগিল, প্রভু স্বামী, প্রাণনাথ, জগৎসমীপে আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব, তুমিই আমার প্রাণনাথ; প্রভু, তুমি আমার, আমি তোমার। এ খাটের খুরো নয়, এ তোমার পদযুগল—আমি ধর্ম সাক্ষী করে তোমাকে পতিত্বে বরণ করেছি, এখনও তোমার চরণ স্পর্শ করে বলছি—এ জগতে

তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমাকে স্পর্শও করতে পারবে না; কার সাধ্য প্রাণ থাকতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে! মা গো, জগৎজননী—

বড়বধূ চিৎকার করিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল,—ও গো দেখো গে, ঠাকুরঝি কেমন ধারা কচ্ছে!

দেখিতে-দেখিতে গৃহিণী ছুটিয়া আসিলেন। বউঠাকরুনের চিৎকার বাহির পর্যন্ত পঁহুছিয়াছিল—কি হয়েচে—হল কি? কর্তা ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রবাবু ছুটিয়া আসিলেন। কর্তা-গিন্নীতে, পুত্র-পুত্রবধূতে, দাস-দাসীতে মুহূর্তে ঘরে ভিড় হইয়া গেল। অনুপমা মূর্ছিত হইয়া খাটের কাছে পড়িয়া আছে। গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন, অনুর আমার কি হল? ডাক্তার ডাক্‌! জল আন্‌! বাতাস কর্‌!—ইত্যাদি চিৎকারে পাড়ার অর্ধেক প্রতিবেশী বাড়িতে জমিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া অনুপমা ধীরে-ধীরে বলিল, আমি কোথায়?

তাহার জননী মুখের নিকট মুখ আনিয়া সস্নেহে বলিলেন, কেন মা, তুমি যে আমার কোলে শুয়ে আছ।

অনুপমা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মৃদু-মৃদু কহিল, ওঃ, তোমার কোলে! ভাবছিলাম আমি আর কোথাও কোন স্বপ্নরাজ্যে তাঁর সঙ্গে ভেসে যাচ্ছি। দরবিগলিত অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। জননী তাহা মুছাইয়া কাতর হইয়া বলিলেন, কেন কাঁদচ মা? কার কথা বলচ?

অনুপমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৌন হইয়া রহিল।

বড়বধূ চন্দ্রবাবুকে একপাশে ডাকিয়া বলিল, সবাইকে যেতে বলো, আর কোনও ভয় নেই; ঠাকুরঝি ভালো হয়েছে।

ক্রমশ সকলে প্রস্থান করিলে রাত্রে বড়বউ অনুপমার কাছে বসিয়া বলিল, ঠাকুরঝি, কার সঙ্গে বিয়ে হলে তুই সুখী হস?

অনুপমা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিল, সুখ-দুঃখ আমার কিছুই নেই; সেই আমার স্বামী—

তা তো বুঝি—কিন্তু কে সে?

সুরেশ! সুরেশই আমার—

সুরেশ? রাখাল মজুমদারের ছেলে?

হ্যাঁ, সে-ই।

রাত্রে গৃহিণী এ কথা শুনিলেন। পরদিন অমনি মজুমদারের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথার পর সুরেশের জননীকে বলিলেন, তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দাও।

সুরেশের জননী হাসিয়া বলিলেন, মন্দ কি!

ভালো-মন্দর কথা নয়, দিতেই হবে।

তবে সুরেশকে একবার জিজ্ঞাসা করে আসি। সে বাড়িতেই আছে; তার মত হলে কর্তার অমত হবে না।

সুরেশ বাড়ি থাকিয়া তখন বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল—একমুহূর্ত তাহার এক বৎসর। তাহার মা বিবাহের কথা বলিলে, সে কানেই তুলিল না। গৃহিণী আবার বলিলেন, সুরো, তোকে বিয়ে করতে হবে।

সুরেশ মুখ তুলিয়া বলিল, তা তো হবেই, কিন্তু এখন কেন? পড়ার সময় ও-সব কথা ভালো লাগে না।

গৃহিণী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, না-না—পড়ার সময় কেন? এগজামিন হয়ে গেলে বিয়ে হবে।

কোথায়?

এই গাঁয়ে জগবন্ধুবাবুর মেয়ের সঙ্গে।

কি? চন্দ্রর বোনের সঙ্গে? যেটাকে খুকী বলে ডাকত?

খুকী বলে ডাকবে কেন—তার নাম অনুপমা।

সুরেশ অল্প হাসিয়া বলিল, হাঁ অনুপমা! দূর তা—দূর সেটা ভারি কুৎসিত।

কুচ্ছিত হবে কেন? সে বেশ দেখতে।

তা হোক বেশ দেখতে; এক জায়গায় শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ি আমার ভাল লাগে না।

কেন, তাতে আর দোষ কি?

দোষের কথায় কাজ নেই, তুমি এখন যাও মা, আমি একটু পড়ি; কিছুই এখনও হয়নি।

সুরেশের জননী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, সুরো তো এক গাঁয়ে কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না।

কেন?

তা তো জানিনে।

অনুর জননী মজুমদার-গৃহিণীব হাত ধরিয়া কাতরভাবে বলিলেন, তা হবে না ভাই! এ বিয়ে তোমাকে দিতে হবে।

ছেলের অমত, আমি কি করব বলো?

না হলে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

তবে আজ থাক। কাল আর-একবার বুঝিয়ে দেখব—যদি মত করতে পারি।

অনুর জননী বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া জগবন্ধুকে বলিলেন, ওদের সুরেশের সঙ্গে যাতে অনুর আমার বিয়ে হয়, তা করো।

কেন বলো দেখি? রায়গ্রামে তো একরকম সব ঠিক হয়েছে। সে সম্বন্ধ আবার ভেঙে কি হবে?

কারণ আছে।

কি কারণ?

কারণ কিছু নয়; কিন্তু সুরেশের মতো অমন রূপে-গুণে ছেলে কি পাওয়া যাবে? আর ও, আমার একটিমাত্র মেয়ে, তার দূরে বিয়ে দেব না। সুরেশের সঙ্গে হলে যখন খুশি দেখতে পাব।

আচ্ছা, চেষ্টা করব।

চেষ্টা নয়—নিশ্চিত দিতে হবে।

কর্তা নথ-নাড়ার ভঙ্গি দেখিযা হাসিয়া ফেলিলেন,—তাই হবে গো।

সন্ধ্যার পর কর্তা মজুমদার-বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, বিয়ে হবে না।

সে কি কথা?

কি করব বলো? ওরা না দিলে তো আমি জোর করে ওদের বাড়িতে মেয়ে ফেলে দিয়ে আসতে পারিনে।

দেবে না কেন?

এক গাঁয়ে বিয়ে হয়—ওদের মত নয়।

গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, আমার কপালের দোষ! পরদিন তিনি পুনরায় সুরেশের জননীর নিকট আসিয়া বলিলেন, দিদি, বিয়ে দে!

আমার তো ইচ্ছা আছে, কিন্তু ছেলের মতো হয় কই?

আমি লুকিয়ে সুরেশকে আরও পাঁচ হাজার টাকা দেব।

টাকার লোভ বড় লোভ। সুরেশের জননী এ কথা সুরেশের পিতাকে জানাইলেন। কর্তা সুরেশকে ডাকিয়া বলিলেন, সুরেশ, তোমাকে এ বিবাহ করতেই হবে।

কেন?

কেমন আবার কি? এ বিবাহ তোমার গর্ভধারিণীর মত, আমারও মত; সঙ্গে-সঙ্গে একটা কারণও হয়ে পড়েছে।

সুরেশ নতমুখ বলিল, এখন পড়াশুনার সময়—পরীক্ষার ক্ষতি হবে।

তা আমি জানি বাপু, পড়াশুনার ক্ষতি করে তোমাকে বলছি না। পরীক্ষা শেষ হলে বিবাহ করো।

যে আজ্ঞে।

অনুর জননীর আনন্দের সীমা নাই। এ কথা তিনি কর্তাকে বলিলেন, দাসদাসী সকলকেই মনের আনন্দে এ কথা জানাইয়া দিলেন।

বড়বউ অনুপমাকে ডাকিয়া বলিল, ওলো! বর যে ধরা দিয়েছে।

অনু সলজ্জে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তা আমি জানতাম।

কেমন করে জানলি? চিঠিপত্র চলত নাকি?

প্রেম অন্তর্যামী! আমাদের চিঠিপত্র অন্তরে চলত।

ধন্যি মেয়ে তুই!

অনুপমা চলিয়া যাইলে বড়বধূঠাকুরানী মৃদু বলিল, পাকামি শুনলে গা জ্বালা করে! আমি তিন ছেলের মা—উনি আজ আমাকে প্রেম শেখাতে এলেন!

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ভালোবাসার ফল

দুর্লভ বসু বিস্তর অর্থ রাখিয়া পরলোকগমন করিলে তাঁহার বিংশতিবর্ষীয় একমাত্র পুত্র ললিতমোহন শ্রাদ্ধশান্তি সমাপ্তি করিয়া একদিন স্কুলে যাইয়া মাস্টারকে বলিল, মাস্টারমশায় আমার নামটা কেটে দিন।

কেন বাপু?

মিথ্যে পড়ে-শুনে কি হবে? যেজন্য পড়াশুনা, তা আমার বিস্তর আছে। বাবা আমার জন্যে অনেক পড়ে-রেখে গিয়েচেন।

মাস্টার চক্ষু টিপিয়া অল্প হাসিয়া বলিলেন, তবে আর ভাবনা কি? এইবার চরে খাও গে। এইখানেই ললিতমোহনের বিদ্যাভ্যাস ইতি হইল।

ললিতমোহনের কাঁচা বয়স, তাহাতে বিস্তর অর্থ, কাজেই স্কুল ছাড়িবামাত্র বিস্তর বন্ধুও জুটিয়া গেল। ক্রমে তামাক, সিদ্ধি, গাঁজা, মদ, গায়ক, গায়িকা ইত্যাদি একটিব পর একটি করিয়া ললিতমোহনের বৈঠকখানা পূর্ণ করিল। এদিকে পিতৃসঞ্চিত অর্থরাশিও জলবৎ ঢেউ খেলিয়া তরতর করিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। তাহার জননী কাঁদিয়া-কাটিয়া অনেক বুঝাইলেন, অনেক বলিলেন, কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। একদিন ঘূর্ণিত-লোচনে মাতৃসন্নিধানে আসিয়া বলিল মা, এখনি আমাকে পঞ্চাশ টাকা দাও।

মা বলিলেন, একটি পয়সাও আমার নেই।

ললিতমোহন দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া একটা কুড়ুল লইয়া জননীর হাতবাক্স চিরিয়া ফেলিয়া পঞ্চাশ টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। তিনি দাঁড়াইযা সমস্ত দেখিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না।

পরদিন পুত্রের হস্তে লোহার সিন্দুকের চাবি দিয়া বলিলেন, বাবা, এই লোহার সিন্দুকের চাবি নাও; তোমার বাপের টাকা যেমন ইচ্ছা খরচ করো, আর আমি বাধা দিতে আসব না। কিন্তু ঈশ্ববের কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমি গেলে তোমাব চোখ ফোটে।

ললিত বিস্মিত হইয়া বলিল, কোথায় যাবে?

তা জানিনে। আত্মঘাতী হলে কোথায় যেতে হয় তা কেউ জানে না, তবে শুনেছি সদগতি হয় না। তা কি করব বলো, আমার যেমন কপাল!

আত্মঘাতী হবে?

না-হলে আর উপায় কি? তোমাকে পেটে ধরে আমার সব সুখই হল। এখন নিত্যি-নিত্যি তোমাব লাথি-ঝাঁটা খাওয়াব চেয়ে যমদূতের আগুনকুণ্ড ভালো।

ললিতমোহন জননীকে চিনিত। সে বিলক্ষণ জানিত যে, তাহার জননী মিথ্যা ভয় দেখাইবার লোক নহেন; তখন কাঁদিয়া ভূমে লুটাইয়া পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, মা, তুমি আমাকে মাপ করো, এমন কাজ আর কখন-করব না। তুমি থাক, তুমি যেও না।

জননী রুক্ষভাবে বলিলেন, তাও কি হয়? তোমার বন্ধুবান্ধব—তারা সব যাবে কোথায়?

আমি কাউকে চাইনে। আমি টাকাকড়ি, বন্ধুবান্ধব কিছুই চাইনে, শুধু তুমি থাক।

তোমার কথায় বিশ্বাস কি?

কেন মা, আমি তোমার মন্দ সন্তান, তা বলে অবিশ্বাসের কাজ কি কখনও করেচি? তুমি এখন থেকে ইচ্ছা-সুখে যা দেবে, তার অধিক একপয়সাও চাব না।

ইচ্ছা-সুখে তোমাকে একপয়সাও দিতে ইচ্ছা হয় না—কেননা, এই এক বৎসর দেড় বৎসরের মধ্যে তুমি যত টাকা উড়িয়েছ, তার অর্ধেকও কখনও তোমার জীবনে উপার্জন করতে পারবে না।

তুমি আমাকে কিছুই দিও না।

জননী কোমল হইলেন,—না, অতটা তোমার সবে না, আমিও তা ইচ্ছে করিনে। মাসে এক শ'টাকা পেলে তোমার চলবে কি?

স্বচ্ছন্দে।

তবে তাই হোক।

দুই-একদিনের মধ্যেই তার বন্ধুবান্ধবেরা একে-একে সরিয়া পড়িতে লাগিল।

ললিতমোহন দুই-একজনের বাটীতে ডাকিতে গেল; কেহ বলিল, কাল যাব; কেহ বলিল, আজ কাজ আছে। ফলত কেহই আর আসিল না। এখন সে সম্পূর্ণ একা। একা মদ খায়, একা ঘুরিয়া বেড়ায়। একবার মনে করিল, আর মদ খাইবে না; কিন্তু সময় কিরূপে কাটিবে? কাজেই মদ ছাড়া হইল না। একটা পথে সে প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়াইত; এ পথটা জগবন্ধুবাবুর বাগানের পার্শ্ব দিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জন বলিয়া মদ খাইয়া এখানেই বেড়াইবার অধিক সুবিধা হইত। মাতাল বলিয়া তাহার গ্রামময় অখ্যাতি; কাহারও বাটীতে যাওয়া ভালো দেখায় না—কাজেই মদ খাইয়া নিজের সঙ্গে নিজে বেড়াইয়া বেড়াইত।

আজকাল তাহার আর-একজন সঙ্গী জুটিয়াছে—সে অনুপমা। আসিতে-যাইতে সে প্রায়ই দেখে, তাহারই মতো অনুপমাও বাগানের ভিতর ঘুরিয়া বেড়ায়। অনুপমাকে সে বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজকাল তাহাতে যেন একটু নতুনত্ব দেখিতে পায়। জগবন্ধুবাবুর বাগানের প্রাচীরের এক অংশ ভগ্ন ছিল, সেইখানে একটা গাছের পাশে দাঁড়াইয়া দেখে, অনুপমা উদ্যানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনও বা তরুতলে বসিয়া মালা গাঁথিতেছে, কখনও বা ফুল তুলিতেছে, এক-এক সময় বা সরসীর জলে পদদ্বয় ডুবাইয়া বালিকা-সুলভ ক্রীড়া করিতেছে। দেখিতে তাহার বেশ লাগে; ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চুলগুলি, অযত্নবক্ষিত দেহলতা, আলুথালু বসন-ভূষণ ও সকলের উপর মুখখানি তাহার মদের চোখে একটি পদ্মফুলের মতো বোধ হইত। মাঝে-মাঝে তাহার মনে হয়, জগতে সে অনুপমাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসে। রাত্রি হইলে বাড়িতে গিয়া শয়ন করে, যতক্ষণ নিদ্রা না হয়, ততক্ষণ অনুপমার মুখই মনে পড়ে। স্বপ্নেও কখনও-কখনও তাহার অনিন্দ্যসুন্দর বদনমণ্ডল হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

এমনই করিয়া কতদিন যায়। জগবন্ধুবাবুর উদ্যানের সেই ভগ্ন অংশটিতে বৈকাল হইতে বসিয়া থাকা আজকাল তাহার নিত্যকর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বালক নহে, অল্প দিনেই বুঝিতে পারিল যে, অনুপমাকে বাস্তবিকই অতিশয় অধিক রকম ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু এরূপ ভালোবাসায় লাভ নাই—সে জানিত, সে মাতাল; সে অপদার্থ মূর্খ; সে সকলের ঘৃণিত জীব—অনুপমার কিছুতেই যোগ্য পাত্র নহে। শত চেষ্টাতেও তাহাকে পাওয়া সম্ভব নয়, তবে আর এমন করিয়া মন খারাপ কবিয়া লাভ কি? কাল হইতে আর আসিবে না। কিন্তু থাকিতে পারিত না—সূর্য অস্তগত হইলে সে মদটুকু খাইয়া সেই ভাঙা পাঁচিলটির উপর আসিয়া বসিত। তবে ভিতরে একটা কথা আছে—কাহাকেও ভালোবাসিলে মনে হয়, সেও বুঝি আমাকে ভালোবাসে; আমাকে কেন বাসিবে না? অবশ্য এ কথা প্রতিপন্ন করা যায় না।

একদিন ললিতমোহন প্রাচীরে উঠিয়াছে। এমনসময় চন্দ্রবাবুর চোখে পড়িল।

চন্দ্রবাবু দ্বারবানকে হাঁকিয়া বলিলেন,—উসকো পাকড়ো।

দ্বারবান প্রথমে বুঝিতে পারিল না কাহাকে ধরিতে হইবে, পরে যখন বুঝিল, ললিতবাবুকে তখন সেলাম করিয়া তিন হাত পিছাইয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রবাবু পুনরায় চিৎকার করিয়া বলিলেন,—উসকো পাকড়কে থানামে দেও।

দ্বারবান আধা-বাঙলা আধা-হিন্দিতে বলিল, হামি নেহি পারবে বাবু।

ললিতমোহন ততক্ষণে ধীরে-ধীরে প্রাচীর টপকাইয়া প্রস্থান করিল। সে চলিয়া যাইলে চন্দ্রবাবু বলিলেন, কাহে নেহি পাক্‌ড়া?

দ্বারবান চুপ করিয়া রহিল। একজন মালী ললিতকে বিলক্ষণ চিনিত, সে বলিল,

ও বেটা ভোজপুরীর সাধ্য কি ললিতবাবুকে ধরে? ওর মতো চারটে দরোয়ানের মাথা ওর এক ঘুসিতে ভেঙে যায়।

দ্বারবানও তাহা অস্বীকার করিল না, বলিল, বাবু, নোক্‌রি কবনে আয়া, না জান দেনে আয়া?

চন্দ্রবাবু কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি ললিতের উপর পূর্ব হইতেই বিলক্ষণ চটা ছিলেন, এখন সময় পাইয়া, সাক্ষী জুটাইয়া অনধিকার-প্রবেশ এবং আরও কত কি অপরাধে আদালতে নালিশ করিলেন। জগবন্ধুবাবু ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই এই মকদ্দমা করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু চন্দ্রনাথ কিছুতেই শুনিলেন না। বিশেষ মর্মপীড়িতা অনুপমা জিদ করিয়া বলিল যে, পাপীকে শাস্তি না দিলে তাহার মন কিছুতেই সুস্থির হইবে না।

ইন্‌স্পেক্টর বাটীতে আসিয়া অনুপমার এজাহার লইল। অনুপমা সমস্তই ঠিকঠাক বলিল। শেষে এমন দাঁড়াইল যে ললিতের জননী বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াও পুত্রকে কিছুতেই বাঁচাইতে পারিলেন না। তিন বৎসর ললিতমোহনের সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়া গেল।

বি. এ. পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। সুরেশচন্দ্র মজুমদার একেবারে প্রথম হইয়াছে। গ্রামময় সুখ্যাতির একটা রই রই শব্দ পড়িয়া গিয়াছে। অনুপমার জননীর আনন্দেব সীমা নাই। আনন্দে সুরেশের জননীকে গিয়া বলিলেন, নিজের কথা নিজে বলতে নেই, কিন্তু দেখ দেখি আমার মেয়ের পয়!

সুরেশের মা সহাস্যে বলিলেন, তাতো দেখছি।

একবার বিয়ে হোক, তারপর দেখিস—তোর ছেলে রাজা হবে! অনু যখন জন্মায় তখন একজন গণৎকার এসে গুণে বলেছিল যে, এ মেয়ে রানি হবে। অত সুখে কেউ কখনও থাকেনি, থাকবে না; যত সুখ তোমার মেয়ের হবে।

কে বলেছিল?

একজন সন্ন্যাসী।

কিন্তু তুমি তোমার জামাইকে একখানা বাড়ি কিনে দিও।

তা দেব না? চন্দ্রকে আমি পেটের ছেলে বলেই জানি, কিন্তু অনুরও ত কর্তার অর্ধেক বিষয় পাওয়া উচিত, আমি বেঁচে থাকলে তা পাবেও।

তাই হোক, ওরা রাজা-রানি হয়ে সুখে থাক—আমরা যেন দেখে মরি।

দুইদিন পরে রাখাল মজুমদার পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, এই বৈশাখে তোমার বিবাহের দিন স্থির করলাম।

এখন বিবাহ হয়, আমাব একেবারে ইচ্ছে নয়।

কেন?

আমি Gilchrist Scholarship পেয়েচি, তাতে আমি ইচ্ছা করলে বিলাতে গিয়ে পড়তে পারি।

তুমি বিলাত যাবে?

ইচ্ছা আছে।

পড়ে-পড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। অমন কথা আর মুখে এনো না।

বিনা পয়সায় যখন এ সুবিধা পেয়েছি, তখন দোষ কি?

রাখালবাবু এ কথায় একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন,—নাস্তিক বেটা! দোষ কি? পরের পয়সায় যদি বিষ পাওয়া যায় তো কি খেতে হবে?

সে-কথায় এ-কথায় অনেক প্রভেদ।

প্রভেদ আর কোথায়? একদিকে জাত খোয়ানো, ম্লেচ্ছ হওয়া, আর অপরদিকে বিষভোজন, ঠিক এক নয় কি? চুল-চুল মিলে গেল না কি?

সুরেশ আর কোনও প্রতিবাদ না করিয়া নিরুত্তরে প্রস্থান করিল। সে চলিয়া যাইলে রাখালবাবু আপনা-আপনি হাসিয়া বলিলেন, বেটা পাতা-দুই ইংরেজি পড়ে আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে আসে। কেমন কথাটা বললাম—পরের পয়সায় বিষ পেলে কি খেতে হবে? বাছাধন আর দ্বিতীয় কথাটি বলতে পারলে না। এ অকাট্য যুক্তি কি ও কাটতে পারে!

বিবাহের সমস্ত পাকা-রকম স্থির হইয়া যাইলে বড়বধূ একদিন অনুপমাকে বলিলেন, কি লো! বরের সুখ্যাতি যে গ্রামে ধরে না।

অনুপমা মৃদু হাসিয়া বলিল, যার সতীসাধ্বী স্ত্রী, জগতে তার সকল সুখের পথই উন্মুক্ত থাকে।

তবু তো এখনো বিয়ে হয়নি লো!

বিবাহ আমাদের অনেকদিন হয়েছে, জগৎ জানে না বটে, কিন্তু অন্তরে-অন্তরে বহুদিন আমাদের পূর্ণমিলন হয়ে গিয়েছে।

বড়বধূ অল্প হাসিল, ওষ্ঠ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া একটু থামিয়া বলিলেন, এ কথা আর কোথাও বলিস নে, আমরা বুড়ো মাগী, আমাদের তো বলা দূরে থাক—এমনধারা শুনলেও লজ্জা করে; সব কথায় তুই যেন থিয়েটারে অ্যাক্ট করতে থাকিস। এমন করলে লোকে পাগল বলবে যে।

আমি প্রেমে পাগল!

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

বিবাহ

আজ ৫ই বৈশাখ। অনুপমার বিবাহ-উৎসবে আজ গ্রামটা তোলপাড় হইতেছে। জগবন্ধুবাবুর বাটীতে আজ ভিড় ধরে না। কত লোক যাইতেছে, কত লোক হাঁকাহাঁকি করিতেছে। কত খাওয়ান-দাওয়ানর ঘটা, কত বাজনা-বাদ্যের ধূম। যত সন্ধ্যা হইয়া আসিতে লাগিল, ধূমধাম তত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; সন্ধ্যা-লগ্নেই বিবাহ, এখনই বর আসিবে—সকলেই উৎসাহে-আগ্রহে উন্মুখ হইয়া আছে।

কিন্তু বর কোথায়? রাখালবাবু বাটীতে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই কলরব বাধিয়া উঠিয়াছে, সুরেশ গেল কোথায়? এখানে খোঁজ, ওখানে খোঁজ, এদিকে দেখ, ওদিকে দেখ। কিন্তু কেহই সুরেশকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছে না। কুসংবাদ পঁহুছিতে বিলম্ব হয় না, বজ্রাগ্নির মতো এ কথা জগবন্ধুবাবুর বাটীতে উড়িয়া আসিয়া পড়িল। বাড়িসুদ্ধ লোক সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল; সে কি কথা!

আটটার সময় বিবাহের লগ্ন, কিন্তু নয়টা বাজিতে চলিল, কোথাও বরের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। জগবন্ধুবাবুর মাথা চাপড়াইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গৃহিণী কাঁদিয়া আসিয়া তাঁহার নিকটে পড়িলেন, কি হবে গো?

কর্তার তখন অর্ধক্ষিপ্তাবস্থা। তিনি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, হবে আমার শ্রাদ্ধ—আর কি হবে? এই হতভাগা মেয়ের জন্য বৃদ্ধবয়সে আমার মান গেল, যশ গেল, জাতি গেল, এখন একঘরে হয়ে থাকতে হবে। কেন মরতে বুড়ো বয়সে তোমাকে আবার

বিয়ে করেছিলাম, তোমারই জন্য আজ এই অপমান। শাস্ত্রেই আছে, স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী। তোমার কথা শুনে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি। যাও, তোমার মেয়ে নিয়ে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।

আহা! গৃহিণীর দুঃখের কথা বলিয়া কাজ নাই। এদিকে এই, আর ওদিকে আর-এক বিপদ। অনুপমা ঘন-ঘন মূর্ছা যাইতেছে।

এদিকে রাত্রি বাড়িয়া চলিতেছে—দশটা, এগারোটা, বারোটা করিয়া ক্রমশ একটা-দুইটা বাজিয়া গেল; কিন্তু কোথাও সুরেশের সন্ধান হইল না।

সুরেশকে পাওয়া যাক আর না যাক, অনুপমার বিবাহ কিন্তু দিতেই হইবে। কেননা আজ রাত্রে বিবাহ না হইলে জগবন্ধুবাবুর জাতি যাইবে।

রাত্রি আন্দাজ তিনটার সময় পঞ্চাশদ্বর্ষীয় কাসরোগী রামদুলাল দত্তকে পাড়ার পাঁচজন—জগবন্ধুবাবুর হিতৈষী বন্ধু, বরবেশে খাড়া করিয়া লইয়া আসিল।

অনুপমা যখন শুনিল, এমনি করিয়া তাহার মাথা খাইবার উদ্যোগ হইতেছে, তখন মূর্ছা ছাড়িয়া দিয়া জননীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল,—ওমা! আমায় রক্ষা করো, এমন করে গলায় ছুরি দিও না। এ বিয়ে দিলে আমি নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হব।

মা কাঁদিয়া বলিলেন, আমি কি করব মা!

মুখে যাহাই বলুন না, কন্যার দুঃখে ও আত্মগ্লানিতে তাঁহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছিল, তাই কাঁদিয়া-কাটিয়া আবার স্বামীর কাছে আসিলেন—ওগো, একবার শেষটা ভেবে দেখ, এ বিয়ে দিলে মেয়ে আমার বিষ খাবে।

কর্তা কোন-কথা না কহিয়া একেবারে অনুপমার নিকটে আসিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, ওঠো, ভোর হয়ে যায়।

কোথায় যাব বাবা?

এখনই সম্প্রদান করব।

অনুপমা কাঁদিয়া ফেলিল,—বাবা, আমাকে মেরে ফল, আমি বিষ খাব।

যা ইচ্ছে হয় কাল খেয়ো মা, আজ বিয়ে দিয়ে আমার জাত বাঁচাই, তারপর যেমন খুশি করো, বিষ খেও, জলে ডুবে মরো, আমি একবারও বারণ করব না।

কি নিদারুণ কথা! এইবার যথার্থ-ই অনুপমার ভিতর পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল—বাবা! আমায় রক্ষা করো।

কত কাতরোক্তি, কত ক্রন্দন, কিন্তু কোনও কথাই খাটিল না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জগবন্ধুবাবু সেই রাত্রেই বৃদ্ধ রামদুলাল বহুকাল বিপত্নীক বৃদ্ধ রামদুলালের আপনার বলিতে সংসারে আর কেহ নাই। দুইখানি পুরাতন ইষ্টকনির্মিত ঘর, একটু শাক-সবজির বাগান—ইহাই দত্তজীর সাংসারিক সম্পত্তি। বহুক্লেশে তাঁহার দিন গুজরান হয়। বিবাহ করিয়া পরদিন অনুপমাকে বাড়ি আনিলেন; সঙ্গে-সঙ্গে অনেক খাদ্যদ্রব্য আসিল। অনেক দাসদাসী আসিল—কোনও ক্লেশ নাই, ছয়-সাতদিন তাঁহার পরম সুখে অতিবাহিত হইল। বড়লোক শ্বশুর—আর তাঁহার কোনও ভাবনা নাই; বিবাহ করিয়া কপাল ফিরিয়াছে। কিন্তু অনুপমার স্বতন্ত্র কথা; আর দিন-দুই থাকিয়া সে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া দাসদাসীরাও গোপনে চক্ষু মুছিল।

বাড়ি গিয়া প্রাণত্যাগ করিব, এ পরামর্শ অনুপমা স্বামীভবন হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। এইবার যথার্থ মরিবার বাসনা হইয়াছে। অনেক রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে

সে নিঃশব্দে খিড়কির দ্বার খুলিয়া, বাগানের পুষ্করিণীর সোপানে আসিয়া বসিল। আজ তাহাকে মরিতে হইবে, মুখের মবা নয়, কাজের মরা মরিতে হইবে। অনুপমার মনে পড়িল, আর-একদিন সে এইখানে মরিতে গিয়াছিল, সেও অধিকদিন নয়, কিন্তু তখন মরিতে পারে নাই; কেননা একজন ধরিয়া ফেলিয়াছিল। আজ সে কোথায়? জেলখানায় কয়েদ খাটিতেছে। কোন অপরাধে? শুধু বলিতে আসিয়াছিল যে, সে তাহাকে ভালোবাসে। কে জেলে দিল? চন্দ্রবাবু। কেন? তাহাকে দেখিতে পারিত না বলিয়া, সে মাতাল বলিয়া সে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া। কিন্তু অনুপমা কি বাঁচাইতে পারিত না? পারিত, কিন্তু তাহা করে নাই, বরং জেলে দিতে সহায়তাই করিয়াছে। আজ তাহার হইল, ললিত কি যথার্থই ভালোবাসিত? হয়তো বাসিত, হয়তো বাসিত না। না বাসুক, কিন্তু তাহাকে দণ্ডিত করিয়া তাহার কি ইষ্ট-সিদ্ধি হইয়াছে? জেলে পাথর ভাঙিতেছে, ঘানি টানিতেছে, আরও কত নীচ কর্ম করিতে হইতেছে; ইহাতে হয়তো চন্দ্রবাবুর লাভ হইয়াছে, কিন্তু তাহার কি? সে দণ্ডিত না হইলে কি তাহাকে পাইতে পারিত? —যিনি এখন মনের আনন্দে নিজের উন্নতির জন্য জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাইতেছেন? অনুপমা সেইখানে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল, তাহার পর জলে নামিল। একহাঁটু, একবুক, গলা করিয়া, ক্রমশ ডুবন-জলে আসিয়া পড়িল। আধমিনিট কাল জলতলে থাকিয়া অনেক জল খাইয়া সে আবার উপরে ভাসিয়া উঠিল; আবার ডুব দিল, আবার ভাসিয়া উঠিল। সে সাঁতার দিতে জানিত, তাই সমস্ত পুষ্করিণীটা তন্ন-তন্ন করিয়াও কোথাও ডুবন-জল মিলিল না। অনেকবার ডুব দিল, অনেক জলও খাইল, কিন্তু একেবারে ডুবিয়া যাইতে কিছুতেই পারিল না। সে দেখিল, মরিতে স্থির সঙ্কল্প হইয়াও ডুব দিয়া, নিশ্বাস আটকাইয়া আসিবার উপক্রম হইলেই নিশ্বাস লইতে উপরে ভাসিয়া উঠিতে হয়। এইরূপে পুষ্করিণীটা সাঁতার কাটিয়া প্রায় নিশাশেষে যখন সে তাহার ক্লান্ত অবসন্ন নির্জীব দেহখানা কোনওরূপে টানিয়া আনিয়া সোপানের উপর ফেলিল, দেখিল, যে কোনও অবস্থায় যে-কোনও কারণেই হোক এমন করিয়া একটু-একটু করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করা বড় সহজ কথা নহে।

পূর্বে সে বিরহ-ব্যথায় জর্জরিততনু হইয়া দিনে শতবার করিয়া মরিতে যাইত, তখন ভাবিত, প্রাণটা রাখা না-রাখা নায়ক-নায়িকার একেবারে মুঠার ভিতরে, কিন্তু আজ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া প্রাণটার সহিত ধস্তাধস্তি করিয়াও সেটাকে বাহির করিয়া ফেলিতে পারিল না। আজ সে বিলক্ষণ বুঝিল তাহাকে জন্মের মতো বিদায় দেওয়া—তাহার একাদশবর্ষীয় বিরহব্যথায় কুলাইয়া উঠে না।

ভোরবেলায় যখন সে বাটী আসিল, তখন তাহার সমস্ত শরীর শীতে কাঁপিতেছে। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, অনু এত ভোরেই নেয়ে এলি মা? অনু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

এদিকে দত্তমহাশয় একরূপ চিরস্থায়ীরূপে শ্বশুর-ভবনে আশ্রয় লইয়াছেন। প্রথম-প্রথম জামাই-আদর তাহার কতকটা মিলিত, কিন্তু ক্রমশ তাহাও কম পড়িয়া আসিল। বাড়িসুদ্ধ কেহই প্রায় তাঁহাকে দেখিতে পারে না; চন্দ্রনাথবাবু প্রতি কথায় তাঁহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অপদস্থ, লাঞ্ছিত করেন। তাহার একটু কারণও হইয়াছিল; একে তো চন্দ্রবাবুর হিংসাপরবশ অন্তঃকরণ, তাহাতে আবার অকর্মণ্য জামাতা বলিয়া জগবন্ধুবাবু কিছু বিষয় আশ্রয় দিয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন। অনুপমা কখনও আসে না; শাশুড়িঠাকুরানীও কখনও সে বিষয়ে তত্ত্ব লন না; তথাপি রামদুলালের মনের আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। যত্ন-

আত্মীয়তার তিনি বড় একটা ধার ধারিতেন না, যাহা পাইতেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন। তাহার উপর দুবেলা পরিতোষজনক আহার ঘটিতেছে। বৃদ্ধাবস্থায় দত্তমহাশয় ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লইতেন। কিন্তু তাঁহার সুখ ভোগ করিবার অধিকদিনও আর বাকি ছিল না। একে জীর্ণ-শীর্ণ শরীর, তাহার উপর পুরাতন সখা কাসরোগ অনেকদিন হইতে তাঁহার শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছে। প্রতি বৎসরই শীতকালে তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিত; এবারও শীতকালে বিষম টানাটানি করিতে লাগিল। জগবন্ধুবাবু দেখিলেন, যক্ষ্মা রামদুলালের অস্থিমজ্জায় প্রতি গ্রন্থিতে-গ্রন্থিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পাড়াগাঁয়ে সুচিকিৎসা হইবে না জানিয়া কলকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে কিছুদিন সুচিকিৎসার পর সতীসাধ্বী অনুপমার কল্যাণে দুটি বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে সদানন্দ রামদুলাল সংসার-ত্যাগ করিলেন।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

বৈধব্য

তথাপি অনুপমা একটু কাঁদিল। স্বামী মরিলে বাঙালির মেয়েকে কাঁদিতে হয়, তাই কাঁদিল। তাহার পর স্ব-ইচ্ছায় সাদা থান পরিয়া সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল। জননী কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন, অনু, তোর এ বেশ তো আমি চোখে দেখতে পারি না, অন্তত হাতে একজোড়া বালাও রাখ।

তা হয় না, বিধবার অলঙ্কার পরতে নেই।

কিন্তু তুই কচি মেয়ে।

তাহা হোক, বাঙালির মেয়ে বিধবা হইলে কচি-বুড়ো সমস্ত এক হইয়া যায়।

জননী আর কি বলিবেন? শুধু কাঁদিতে লাগিলেন। অনুপমার বৈধব্যে লোকে নূতন করিয়া শোক করিল না। দুই-এক বৎসরেই সে যে বিধবা হইবে তাহা সকলেই জানিত। কেহ বলিল, মড়ার সঙ্গে বিয়ে দিলে কি আর সধবা থাকে? কর্তাও এ কথা জানিতেন, গৃহিণীও বুঝিতেন, তাই শোকটা নূতন করিয়া হইল না। যাহা হইবার তাহা বিবাহরাত্রেই হইয়া গিয়াছে—স্বামীকে ভালোবাসিল না, জানিল না, শুনিল না, তথাপি অনুপমা কঠোর বৈধব্য-ব্রত পালন করিতে লাগিল। রাত্রে জলস্পর্শ করে না, দিনে একমুষ্টি স্বহস্তে সিদ্ধ করিয়া লয়, একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করে। আজ পূর্ণিমা, কাল অমাবস্যা, পরশু শিবরাত্রি, এমনি করিয়া মাসের পনেরো দিন সে কিছু খায় না। কেহ কোনও কথা বলিলে বলে, আমার ইহকাল গিয়াছে, এখন পরকালের কাজ করিতে দাও। এত কিন্তু সহিবে কেন? উপবাসে-অনিয়মে অনুপমা শুকাইয়া অর্ধেক হইয়া গেল। দেখিয়া-দেখিয়া গৃহিণী ভাবিলেন, এইবার সে মরিয়া যাইবে। কর্তাও ভাবিলেন, তাহা বড় বিচিত্র নহে। তাই একদিন স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, অনুর আবার বিয়ে দিই।

গৃহিণী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তা কি হয়? ধর্ম যাবে যে!

অনেক ভেবে দেখলুম, দুবার বিবাহ দিলেই ধর্ম যায় না। বিবাহের সঙ্গে ধর্মের এ বিষয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই, বরং নিজের কন্যাকে এমন করে খুন করলেই ধর্মহানির সম্ভাবনা।

তবে দাও।

অনুপমা কিন্তু এ কথা শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, তা হয় না।

কর্তা তখন নিজে অনুকে ডাকিয়া বলিলেন, খুব হয় মা।

তা হলে আমার ইহকাল-পরকাল-দুই কালই গেল।

কিছুই যায় নাই, যাবে না—বরং না-হলেই যাবার সম্ভাবনা। মনে করো, তুমি যদি গুণবান পতিলাভ কর, তা হলে দুই কালেরই কাজ করতে পারবে।

একা কি হয় না?

না মা, হয় না। অন্তত বাঙালির ঘরের মেয়ের দ্বারা হয় না। ধর্মকর্মের কথা ছেড়ে দিয়ে সামান্য কোন একটা কর্ম করতে হলেই তাদের অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়; স্বামী ভিন্ন তেমন সাহায্য আর কে করতে পারে বলো? আর, কি দোষে তোমার এত শাস্তি?

অনুপমা আনতমুখে বলিল, আমার পূর্বজন্মের ফল।

গোঁড়া হিন্দু জগবন্ধুবাবুর কর্ণে এ কথাটা খট্ করিয়া লাগিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, তাই যদি হয়, তবুও তোমার একজন অভিভাবকের প্রয়োজন; আমাদের অবর্তমানে কে তোমাকে দেখবে?

দাদা দেখবেন।

ঈশ্বর না করুন, কিন্তু সে যদি না দেখে? সে তোমার মার পেটের ভাই নয়; বিশেষ, আমি যতদূর জানি, তার মনও ভালো নয়।

অনুপমা মনে-মনে বলিল, তখন বিষ খাব।

আরও একটা কথা আছে অনু, পিতা হলেও সে কথা আমার বলা উচিত—মানুষের মন সব সময়ে যে ঠিক একরকমই থাকবে, তা কেউ বলতে পারে না; বিশেষ, যৌবনকালের প্রবৃত্তিগুলি সর্বদা বশ রাখতে মুনি-ঋষিরাও সমর্থ হন না।

কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া অনুপমা কহিল, জাত যাবে যে!

না মা, জাত যাবে না—এখন আমার সময় হয়ে আসছে—চোখও ফুটছে।

অনপমা ঘাড় নাড়িল। মনে-মনে বলিল, তখন জাত গেল, আর এখন যাবে না। যখন চক্ষুকর্ণ বন্ধ করে তোমরা আমাকে বলিদান দিলে, তখন এ কথা ভাবলে না কেন? আজ আমারও চক্ষু ফুটেছে—আমিও ভালোরূপ প্রতিশোধ দেব।

কোনওরূপে তাহাকে টলাইতে না পরিয়া জগবন্ধুবাবু বলিলেন, তবে মা, তাই ভালো; তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি বিবাহ দিতে চাই না। তোমার খাবার-পরবার ক্লেশ না হয়, তা আমি করে যাব। তার পর ধর্মে মন রেখে যাতে সুখী হতে পার, করো।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

চন্দ্রবাবুর সংসার

তিন বৎসর পরে খালাস হইয়াও ললিতমোহন বাড়ি ফিরিল না; কেহ বলিল, লজ্জায় আসিতেছে না। কেহ বলিল, সে গ্রামে কি আর মুখ দেখাতে পারে? ললিতমোহন নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দুই বৎসর পরে সহসা একদিন বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার জননী আনন্দে পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন,—বাবা, এবার বিবাহ করে সংসারী হও, যা কপালে ছিল তাতো ঘটে গিয়েছে, এখন সেজন্য আর মনে দুঃখ করো না। ললিতও যাহা হয় একটা করিবে স্থির করিল।

পাঁচ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া ললিত গ্রামে অনেক পরিবর্তন দেখিল, বিশেষ দেখিল, জগবন্ধুবাবুর বাটীতে। কর্তা-গিন্নি কেহ জীবিত নাই। চন্দ্রনাথবাবু এখন সংসারের কর্তা, অনুপমা বিধবা হইয়া এইখানেই আছে, কারণ তাহার অন্যত্র স্থান নাই। পূর্বেই জননীর মৃত্যু হইয়াছিল, পরে পিতার মৃত্যুর পর অনুপমা ভাবিয়াছিল, পিতা যাহা দিয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া কোনও তীর্থস্থানে থাকিবে এবং সেই টাকায় পুণ্যধর্ম, নিয়মব্রত করিয়া অবশিষ্ট জীবনটা কাটাইয়া দিবে। কিন্তু শ্রাদ্ধশান্তি হইলে উইল দেখিয়া সে মর্মাহত হইল, পিতা কেবল তাহার নামে পাঁচ শত টাকা দিয়া গিয়াছেন। তাহারা বড়লোক, এ সামান্য টাকা তাহাদিগের নিকট টাকাই নহে; বাস্তবিক, এই অর্থে কাহারও চিরজীবন গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহিত হইতে পারে না। গ্রামে অনেকেই কানাঘুষা করিল, এ উইল জগবন্ধুবাবুর নহে, ভিতরে কিছু কারসাজি আছে। কিন্তু সে কথায় ফল কি, নিরুপায় হইয়া অনুপমা চন্দ্রবাবুর বাটীতেই রহিল।

লোকে বলে, পিতার মৃত্যু না হইয়া পর্যন্ত সৎমাকে চিনিতে পারা যায় না; সৎভাইকেও সেইরূপ পিতার জীবিতকাল পর্যন্ত চিনিতে পারা কঠিন। এতদিন পরে অনুপমা জানিতে পারিল, তাহার দাদা চন্দ্রনাথবাবুর কি চরিত্রের মানুষ। যত প্রকার অধমশ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়, চন্দ্রনাথবাবু তাহাদের সর্বনিকৃষ্ট। হৃদয়ে একতিল দয়ামায়া নাই, চক্ষে একবিন্দু চামড়া পর্যন্ত নাই। অনুপমার এই নিরাশ্রয় অবস্থায় তিনি তাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রতি কথায়, এমন কি উঠিতে-বসিতে তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত, অপমানিত করিতেন। অনেক দিন হইতে তিনি অনুপমাকে দেখিতে পারেন না, কিন্তু আজকাল তো অধিক না-দেখিতে পারিবার কারণ তিনিই ভালো জানেন। বড়বধূ পূর্বে তাহাকে ভালোবাসিতেন, কিন্তু এখন তিনিও দেখিতে পারেন না। যখন অনু বড়লোকের মেয়ে ছিল, যখন তাহার বাপ-মা বাঁচিয়াছিল, যখন তাহার একটা কথায় পাঁচজন ছুটিয়া আসিত, তখন তিনিও ভালোবাসিতেন। এখন সে দুঃখিনী, আপনার বলিতে কেহ নাই, টাকাকড়ি নাই, পরের অন্ন না-খাইলে দিন কাটে না, তাহাকে কে এখন ভালোবাসিবে? কে এখন যত্ন করিবে? বড়বধূর তিন-চারিটি ছেলেমেয়ের ভার অনুর উপর; তাহাদিগকে খাওয়াইতে হয়, স্নান করাইতে হয়, পরাইতে হয়, কাছে করিয়া শুইতে হয়, তথাপি কোনও বিষয়ে একটু ত্রুটি হইলেই অমনি বড়বধূঠাকুরানী রাগ করিয়া রীতিমত পাঁচটা কথা শুনাইয়া দেন। ইহা ভিন্ন অনুপমাকে নিত্য দুবেলা চন্দ্রবাবুর জন্য দুই-চারিটা ভালো তরকারি রাঁধিতে হয়; পাচক ব্রাহ্মণ তেমন প্রস্তুত করিতে পারে না। আর-না হইলে চন্দ্রবাবুরও কিছু খাওয়া হয় না। একাদশীই হোক, আর দ্বাদশীই হোক, আর উপবাসই হোক, সে রান্না তাহাকে রাঁধিতেই হইবে। বিধবা হইয়া অনুপমা প্রাতঃকালে স্নান করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিত; এখন তাহাকে সে সময়টুকুও দেওয়া হয় না। একটু বিলম্ব হইলেই বড়বধূঠাকুরাণী বলিয়া উঠেন, ঠাকুরঝি, একটু হাত চালিয়ে নাও, ছেলেরা কাঁদছে—এখনও পর্যন্ত কিছু খেতে পায়নি। অনুপমা যা-তা করিয়া উঠিয়া আসে, একটি কথাও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। একাদশীর দীর্ঘ উপবাস করিয়াও তাহাকে রাত্রে রন্ধন করিতে যাইতে হয়; তৃষ্ণায় বুক ফাটিতে থাকে, অগ্নির উত্তাপে মাথা টিপটিপ করিতে থাকে, গা ঝিমঝিম করে, তবু কথা কহে না। অবস্থার পরিবর্তনে সহ্য করিবার ক্ষমতাও হয়। কেননা, জগদীশ্বর তাহা শিখাইয়া দেন—না হইলে অনুপমা এতদিন মরিয়া যাইত।

এ সংসারে তাহার অপেক্ষা দাসদাসীরা শ্রেষ্ঠ; জোর করিয়া তাহাদের দুটো বলিলে তাহারাও দুটো জোরের কথা বলিতে পারে, অন্তত আমার মাহিনাপত্র চুকাইয়া দিন, বাড়ি যাই—এ কথাও বলিতে পারে কিন্তু অনু তাহাও বলিতে পারে না। সে বিনামূল্যে ক্রীতদাসী, মারো, কাটো, তাহাকে এখানে থাকিতেই হইবে। আর কোথাও যাইবার জো নাই, সে বিধবা, সে বড়লোকের কন্যা। অনুপমার অবস্থা বুঝাইতে পারা যায় না, বুঝিতে হয়; বাঙালির ঘরে পরান্নপ্রত্যাশিনী বিধবাই কেবল তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিবেন, অন্যে না বুঝিতেই পারে।

আজ দ্বাদশী। সকাল-সকাল স্নান করিয়া অনুপমা পূজা করিতে বসিল। তখনও পনরো মিনিট হয় নাই; বড়বধূ ঘরের বাহির হইতেই একটু বড় গলায় বলিলেন, ঠাকুরঝি, তোমার কি আজ সমস্তদিনে হবে না? এমন করে চলবে না বাপু। অনুপমা শিবের মাথায় জল দিতেছিল, কথা কহিল না; বড়বধূ দশমিনিট পরে পুনর্বার ঘুরিয়া আসিয়া সেইখান হইতেই চিৎকার করিলেন—অত পুণ্যি ছালায় আঁটবে না গো, অত পুণ্যি করো না—আর অত পুণ্যি-ধর্মের শখ থাকে তো বনে-জঙ্গলে গিয়ে কর গে, সংসারে থেকে অত বাড়াবাড়ি সইতে পারা যায় না।

তথাপি অনুপমা কথা কহিল না।

বড়বউ দ্বিগুণ চেঁচাইয়া উঠিলেন,—বলি, কেউ খাবে-দাবে না—না?

অনুপমা হস্তস্থিত বিল্বপত্র নামাইয়া রাখিয়া বলিল, আমার অসুখ হয়েছে, আজ আমি কিছুই পারব না।

পারবে না? তবে সবাই উপোস করুক?

কেন, আমি ছাড়া কি লোক নেই? ঠাকুরের কি হল?

তার জ্বর হয়েচে—আর উনি ঠাকুরের রান্না খেতে পারেন?

না পারেন—তুমি রেঁধে দাও গে।

আমি রাঁধব? মাথার যন্ত্রণায় প্রাণ যায়, একটা কবিরাজ চব্বিশ ঘণ্টা আমার পিছনে লেগে আছে—আর আমি আগুনের তাতে যাব?

অনুপমা জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, তবে সবাইকে উপোস করতে বল গেলো।

তাই যাই—তোমার দাদাকে এ কথা জানাই গে। আর তোমার অসুখ হবে কেন? এই নেয়ে—ধুয়ে এলে, এখনি গিলবে-কুটবে, আর বড়ভাইকে একটু রেঁধে খাওয়াতে পার না?

না, পারিনে। বড়বউ, আমি তোমাদের কেনা বাঁদী নয় যে, যা মুখে আসবে তাই বলবে। আমি এ-সব কথা দাদাকে জানাব।

বড়বউ মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, তাই জানাও গে—তোমার দাদা এসে আমার মাথাটা কেটে নিয়ে যাক!

অনুপমা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; তাহার পর বলিল, তা জানি, দাদা ভালো হলে আর তোমার এত সাহস!

কেন, তিনি করেছেন কি? খেতে দিচ্ছেন, পরতে দিচ্ছেন—আবার কি করবেন। সত্যি-সত্যি তো আর আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমায় মাথায় করে রাখতে পারেন না—এজন্য আর মিছে রাগ করলে চলবে কেন?

সমস্ত বস্তুরই সীমা আছে। অনুপমার সহিষ্ণুতারও সীমা আছে।

সে এতদিন যাহা বলে নাই, আজ তাহা বলিয়া ফেলিল; বলিল, দাদা আমাকে খাওয়াবেন পরাবেন কি—যে বাপের টাকায় তিনি খান—আমি সেই বাপেব টাকায় খাই।

বড়বউ ক্রুদ্ধ হইল,—তাই যদি হতো, তা হলে বাপ আব পথের কাঙাল করে রেখে যেত না।

পথের কাঙাল তিনি করে যাননি, তোমবাই করেছ। গ্রামসুদ্ধ সবাই জানে, তিনি আমাকে নিঃসম্বল রেখে যাননি। সে টাকা দাদা চুরি না করলে আজ আমাকে তোমার মুখনাড়া খেতে হতো না।

বড়বধূর মুখ প্রথমে শুকাইয়া গেল। কিন্তু পবক্ষণেই দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল,—গ্রামসুদ্ধ সবাই জানে—উনি চোর? তবে এ কথা ওঁকে জানাব?

জানিও—আরও বলো যে, পাপের ফল তাঁকে পেতেই হবে।

সেদিন এমনই গেল। অবশ্য এ কথা চন্দ্রবাবু শুনিতে পাইলেন; কিন্তু কোনওরূপ উচ্চবাক্য করিলেন না।

চন্দ্রনাথবাবুর সংসারে ভোলা বলিয়া একজন ছোঁড়া মতো ভৃত্য ছিল। পাঁচ-ছয় দিন পরে চন্দ্রবাবু একদিন তাহাকে বাটীর ভিতর ডাকিযা আনিযা বেদম প্রহার কবিতে লাগিলেন। চিৎকার শব্দে অন্যান্য দাসদাসীরা ছুটিযা আসিল—তখনও অসম্ভব মার চলিতেছে। অনুপমা ঘরের ভিতর পূজা করিতেছিল, পূজা ফেলিযা সে-ও ছুটিয়া আসিল; ভোলার নাক-মুখ দিয়া তখনও রক্ত ছুটিতেছিল। অনুপমা চিৎকার কবিযা উঠিল, দাদা কর কি—মরে গেল যে!

চন্দ্রবাবু খিঁচাইয়া উঠিলেন,—আজ বেটাকে একেবারে মেরে ফেলব। তোকেও সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলতাম, কিন্তু শুধু মেয়েমানুষ বলে তুই বেঁচে গেলি। আমার সংসারে এত পাপ আমি বরদাস্ত করব না। বাবা তোকে পাঁচশ' টাকা দিয়ে গেছেন—তাই নিয়ে তুই আজই আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা।

অনুপমা কিছুই বুঝিতে পারিল না, শুধু বলিল, সে কি?

কিছুই নয়। আজ টাকা নাও, নিয়ে ভোলার সঙ্গে দূব হয়ে যাও। বাইরে গিয়ে যা খুশি কর গে।

অনুপমা সেইখানেই মূর্ছিত হইয়া গেল। দাসদাসীরা সকলেই এ কথা শুনিল। কেউ মুখে কাপড় দিয়া হাসিল, কেহ হাসি চাপিয়া ভালো মানুষের মত সরিয়া গেল, কেহ বা ছুটিয়া অনুপমাকে তুলিতে আসিল। চন্দ্রবাবু মৃতপ্রায় ভোলার মুখে আর-একটা পদাঘাত করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

শেষ দিন

আজ অনুপমার শেষ দিন। এ সংসারে সে আর থাকিবে না! জ্ঞান হইয়া অবধি সে সুখ পায় নাই। ছেলেবেলায় ভালোবাসিয়াছিল বলিয়া নিজের শান্তি নিজে ঘুচাইয়াছিল; অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিয়াছিল বলিয়া বিধাতা তাহাকে একতিলও সুখ দেন নাই। যাহাকে ভালোবাসিত মনে করিত, তাহাকে পাইল না; যে ভালোবাসিতে আসিয়াছিল, তাহাকে তাড়াইয়া দিল। পিতা নাই, মাতা নাই, দাঁড়াইবার স্থান নাই, স্ত্রীলোকের একমাত্র অবলম্বন

সতীত্বের সুযশ, তাহাও ঈশ্বর কাড়িয়া লইতে বসিয়াছেন। তাই আর সে সংসারে থাকিবে না। বড় অভিমানে তাহার হৃদয় ফাটিয়া উঠিতেছে। নিস্তব্ধ নিদ্রিত কৌমুদী রজনীতে খিড়কির দ্বার খুলিয়া, আবার—বার-বার তিনবার—পুষ্করিণীর সেই পুরাতন সোপানে আসিয়া উপবেশন করিল। এবার অনুপমা চালাক হইয়াছে। আর বার সন্তরণ-শিক্ষাটা তাহাকে মরিতে দেয় নাই, এবার তাহা বিফল করিবার জন্য কাঁকে কলসী লইয়া আসিয়াছে। এবার পুষ্করিণীর কোথায় ডুবন-জল আছে, তাহা বাহির করিয়া লইবে—এবার নিশ্চয় ডুবিয়া মরিবে।

মরিবার পূর্বে পৃথিবীকে বড় সুন্দর দেখায়। ঘরবাড়ি, আকাশ, মেঘ, চন্দ্র, তারা, জল, ফুল, লতা,বৃক্ষ—সব সুন্দর হইয়া উঠে; যেদিকে চাও সেইদিকেই মনোরম বোধ হয়। সব যেন অঙ্গুলি তুলিয়া বলিতে থাকে, মরিও না, দেখো আমরা কত সুখে আছি—তুমিও সহ্য করিয়া থাক, একদিন সুখী হইবে। না হয় আমাদের কাছে এস, আমরা তোমাকে সুখী করিব; অনর্থক বিধাতৃদত্ত আত্মাকে নরকে নিক্ষেপ করিও না। মরিতে আসিয়াও মানুষ তাই অনেক সময় ফিরিয়া যায়। আবার যখন ফিরিয়া দেখে, জগতে তাহার একতিলও সুখ নাই, অসীম সংসারে দাঁড়াইবার একবিন্দু স্থান নাই, আপনার বলিতে একজনও নাই, তখন আবার মরিতে চাহে, কিন্তু পরক্ষণেই কে যেন ভিতর হইতে বলিতে থাকে, ছি ছি! ফিরিয়া যাও—এমন কাজ করিও না। মরিলেই কি সকল দুঃখের অবসান হইল? কেমন করিয়া জানিলে ইহা অপেক্ষা আরও দুঃখে পতিত হইবে না? মানুষ অমনি সঙ্কুচিত হইয়া পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়ায়। অনুপমার কি এ-সব কথা মনে হইতেছিল না? কিন্তু অনুপমা তবুও মরিবে, কিছুতেই আর বাঁচিবে না।

পিতার কথা মনে হইল, মাতার কথা মনে হইল, সঙ্গে-সঙ্গে আর একজনের কথা মনে হইল। যাহার কথা মনে হইল, সে ললিত। যাহারা তাকে ভালোবাসিত, তাহারা সকলেই একে-একে চলিয়া গিয়াছে। শুধু একজন এখনও জীবিত আছে। সে ভালোবাসিয়াছিল, ভালোবাসা পাইতে আসিয়াছিল, হৃদয়ের দেবী বলিয়া পূজা দিতে আসিয়াছিল, অনুপমা সে পূজা গ্রহণ করে নাই এবং অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। শুধু কি তাই? জেলে পর্যন্ত দিয়াছিল। ললিত সেখানে কত ক্লেশ পাইয়াছিল, হয়তো অনুপমাকে কত অভিসম্পাত করিয়াছিল, তাহার মনে হইল, নিশ্চিত সেই পাপেই এত ক্লেশ, এত যন্ত্রণা। সে ফিরিয়া আসিয়াছে। ভালো হইয়াছে, মদ ছাড়িয়াছে, দেশের উপকার করিয়া আবার যশ কিনিতেছে। সে কি আজও তাহাকে মনে করে? হয়তো করে না, হয়তো বা করে—কিন্তু তাহাতে কি? তাহার যে কলঙ্ক রটিয়াছে তিনি কি তাহা শুনিয়াছেন? যখন গ্রামময় রটিবে যে, আমি কলঙ্কিনী হইয়া ডুবিয়াছি, কাল যখন আমার দেহ জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে, ছি-ছি! কত ঘৃণায় তাঁর ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিবে।

অনুপমা অঞ্চল দিয়া গলদেশে কলসী বাঁধিল। এমন সময়ে কে একজন পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, অনুপমা!

অনুপমা চমকাইয়া ফিরিয়া দেখিল, একজন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আগন্তুক আবার ডাকিল। অনুপমার মনে হইল, এ স্বর আর কোথাও শুনিয়াছে, কিন্তু স্মরণ করিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

অনুপমা আত্মহত্যা করো না।

অনুপমা কোনও কালেই ব্রীড়ানত লজ্জাবতী লতা নহে; সে সাহস করিয়া বলিল,

আমি আত্মহত্যা করব, আপনি কি করে জানলেন?

তবে গলায় কলসী বেঁধেচ কেন?

অনুপমা মৌন হইয়া রহিল। আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আত্মঘাতী হলে কি হয় জান?

কি?

অনন্ত নরক।

অনুপমা শিহরিয়া উঠিল। ধীরে-ধীরে কলসী খুলিয়া রাখিয়া বলিল, এ সংসারে স্থান নাই।

ভুলে গিয়েচ! আমি মনে করে দিচ্ছি। প্রায় ছ'বছর পূর্বে ঠিক এইস্থানে একজন তোমাকে চিরজীবনের জন্য স্থান দিতে চেয়েছিল—স্মরণ হয়?

অনুপমা লজ্জায় রক্তমুখী হইয়া বলিল, হয়।

এ সঙ্কল্প ত্যাগ করো।

আমার কলঙ্ক রটেছে—আমার বাঁচা হয় না।

মরলেই কি কলঙ্ক যায়?

যাক না যাক, আমি তা শুনতে যাব না।

ভুল বুঝেছ অনুপমা! মরলে এ কলঙ্ক চিরকাল ছায়ার মতো তোমার নামের পাশে ঘুরে বেড়াবে। বেঁচে দেখো, এ মিথ্যা কলঙ্ক কখনও চিরস্থায়ী হবে না।

কিন্তু কোথায় গিয়ে বেঁচে থাকব?

আমার সঙ্গে চলো!

অনুপমার একবার মনে হইল তাহাই করিবে। চরণে লুটাইয়া পড়িবে, বলিবে, আমাকে ক্ষমা করো। বলিবে, তোমার অনেক অর্থ, আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও—আমি গিয়া কোথাও লুকাইয়া থাকি। পরে অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিল, আমি যাব না।

কথা শেষ হইতে না-হইতে অনুপমা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

অনুপমা জ্ঞান হইলে দেখিল সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর সে শয়ন করিয়া আছে, পার্শ্বে ললিতমোহন। অনুপমা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কাতরস্বরে বলিল, কেন আমাকে বাঁচালে?

বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, চৈত্র ১৩২০



ঋণ-পরিশোধ

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

এমন আপদেও মানুষে পড়ে! ধর্মতলার মোড়ে ট্রামের অপেক্ষায় প্রায় অর্ধঘণ্টাকাল উমেদারি কবিতেছি; গাড়ির দেখা নাই। ফাল্গুন মাসের শেষ; রৌদ্র কোনওরূপেই উপভোগ-সুখদ নহে। এ দিকে দুইটা বাজিল; শনিবার—আফিসের ছুটি হইল; সুতরাং দলে-দলে কর্মচারিরা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন,—দেহে অকাল-জরার লক্ষণ—নয়নে হিবাসপরীক্ষার উপযোগী তীক্ষ্নতা ও ক্ষুধা। সংবাদ পাওয়া গেল,—কোথায় বিদ্যুতের তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ট্রামের ভরসা ত্যাগ করিয়া গাড়ি ভাড়া করিতে যাইব—এমনসময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল,—'ননি, না?"

আমার নাম নরেন্দ্রনাথ। ননি তাহার অপভ্রংশ। এ নামে আজ দ্বাদশ বৎসর কেহ আমাকে ডাকে নাই। তাহায় পূর্বেও অবশ্য সকলের এ নাম প্রয়োগের অধিকার ছিল না। বিশেষ কলিকাতায় আমি আপনাকে পরিচিতজনশূন্য বলিয়াই জানি। এখানে আমাকে এ নামে কে ডাকিল? এত দিন পরে—পরিবর্তিতবেশে কে আমাকে চিনিল? ফিরিয়া দেখিলাম;—এলাহাবাদে আমার বাল্যকালের সতীর্থ ব্রজেশ বলিয়া বোধ হইল। ভালো করিয়া দেখিলাম;—আর সন্দেহ রহিল না। মনে যে আনন্দ হইল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

ব্রজেশ জিজ্ঞাসা কবিল, "কোথা হইতে?"

আমি বলিলাম, "ব্রহ্ম হইতে। তুমি?"

সে সম্মুখে একটা বড় দোকান দেখাইয়া বলিল, "ওই দোকানে হিসাব বিভাগে কাজ করি।"

"কত দিন পরে দেখা হইল! বাল্যবন্ধুরা সব কে কোথায়! তুমি থাক কোথায়?"

ব্রজেশ ঠিকানা বলিল। আমি পকেট হইতে খাতা বাহির করিয়া তাহা লিখিয়া লইলাম; বলিলাম, "এখানে কয়টা বড় আড়তের সঙ্গে ব্যবসার কথার জন্য আসিয়াছিলাম। আজ এখনই যাইয়া আফিসে সংবাদ দিতে হইবে। আগামী কল্য রবিবারে মধ্যাহ্নে বাড়িতে থাকিবে তো?"

"থাকিব। তুমি সকাল করিয়া যাইও। আমার ওখানে খাইবে। মা কত আনন্দিত হইবেন।"

এ আহ্বান অবহেলা করিতে পারিলাম না। বাল্যকালে কতবার ব্রজেশদের গৃহে গিয়াছি; মা কতবার আমাদিগকে আহার্য দিয়াছেন। তিনি আজও বাঁচিয়া আছেন! ব্রজেশবে ভাগ্যবান মনে হইল।

আমি বলিলাম, "ভালো। তোমার ছেলে-মেয়েরা সব কাছে আছে তো?"

ব্রজেশ বলিল, "হাঁ।"

"তবে আমি কল্য বেলা এগারোটার মধ্যেই যাইয়া উপস্থিত হইব।"

ইহার পর একখানা গাড়ি ভাড়া করিয়া পান্থশালায় উপনীত হইলাম। কলিকাতায় আমি অপরিচিত; —নূতন; তাই পান্থশালায় উঠিয়াছিলাম।

পান্থশালায় যাইয়া বেশ পরিবর্তনের পর ব্যবসার কথা সব ব্রহ্মে আফিসে লিখিলাম; তাহার পর বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

॥ ২ ॥

কত কথা মনে পড়িতে লাগিল!—

আমার পিতা এলাহাবাদে ওকালতি করিতেন। আমাদের আদিবাস হুগলী জিলায়। মার স্বাস্থ্য স্বভাবত ভালো ছিল না; তাই বাবা ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাঁহাকে লইয়া এলাহাবাদে গিয়াছিলেন। সেখানে মার শরীর ভালো হইল দেখিয়া তিনি এলাহাবাদে ওকালতি পরীক্ষা দিয়া সেই স্থানেই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়াছিল। বিধবা পিতামহী এলাহাবাদে স্বর্গারোহণ করেন। তাহার পর বাবা দেশের বাটী জ্ঞাতিদের দান করিয়া সংস্কারের ব্যয় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন, এবং এলাহাবাদবাসী হইয়া পড়েন।

এলাহাবাদে আমার জন্ম হয়। আমার জন্মের চারি বৎসর পরে আমার ভগিনী সুরমা ভূমিষ্ঠ হয়। তাহার তিন বৎসর পরে আমাব একটি ভ্রাতার জন্ম হয়। সে বিকল যকৃৎ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। বর্ষব্যাপী চিকিৎসায় ও শুশ্রূষায় তাহাকে মাতৃবক্ষে রক্ষা করা যায় নাই। তাহার মৃত্যু হইতেই মার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া যায়; বৎসর ফিরিতে না-ফিরিতে একদিন তাঁহার দুর্বল হৃদয়ের ক্রিয়া রহিত হইয়া গেল। তিনি আপনিও কিছু বুঝিতে পারিবার পূর্বে মৃত্যু সন্তানশোকতপ্ত মাতৃহৃদয়ের সকল বেদনা দূর করিয়া দিল। নয় বৎসর বয়সে আমি মাতৃহীন হইলাম।

মা যখন পীড়িত কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, সেই সময় হইতেই সুরমা প্রায় আমার কাছে থাকিত। আমরা দুইজনে খেলা করিতাম, বেড়াইতাম, বাবার কাছে ঘুরিতাম। এখন সুরমার খেলার সাথী ও সুখ-দুঃখের ভাগী আমি ছাড়া আর কেহ রহিল না। আর আমাদের উভয়ের—মাতৃহীন সন্তানদ্বয়ের পিতা ব্যতীত আর কেহ রহিলেন না। আমরা যেমন বাবাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতাম না, বাবাও তেমনই আমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না।

তিন বৎসর কাটিয়া গেল; বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটিল না। চতুর্থবর্ষে বাবার একজন বন্ধুর বিধবা পত্নী একমাত্র পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তীর্থভ্রমণব্যপদেশে এলাহাবাদে আসিলেন। আমাদের বাটীতে উঠিলেন। পুত্রের বয়স পঞ্চদশ হইবে। দুই-তিন দিনের মধ্যেই আমার সহিত বিভূতির মিশামিশি হইয়া গেল। এই সময় একদিন দেখিলাম, যে বৃদ্ধা দাসী সুরমাকে মানুষ করিয়াছিল, সে অন্য দাসদাসীদের সহিত কি তর্ক করিতেছে। অন্তরাল হইতে শুনিয়া বুঝিলাম, বাবা বিভূতির সহিত সুরমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। আরও শুনিলাম, বিভূতির জননীর তীর্থভ্রমণের পর এই পথে ফিরিবার সময় প্রস্তাব স্থির হইবে।

ইহার কয়দিন পরেই বিভূতির মাতা পুত্রকে লইয়া যাত্রা করিলেন;—যাইবার সময় সুরমাকে আদর করিয়া অনেক খেলানা ও কি-কি অলঙ্কার দিয়া যাইলেন। কয়দিন পরে বাবার নামে একখানি টেলিগ্রাম আসিল,—বিভূতির মাতা বিসূচিকায় আক্রান্ত। বাবা ব্যস্ত হইয়া লোক পাঠাইলেন; তাহার সঙ্গে মাতৃহীন বিভূতি আসিল। সেই হইতে বিভূতি আমাদের পরিবারভুক্ত হইয়া গেল। আমি গৃহে একজন সঙ্গী পাইলাম।

বিভূতি এত দিন বাঙলার একটি জেলা-স্কুলে পড়িত। বাবা দেখিয়া-শুনিয়া তাহাকে আমার সঙ্গে একশ্রেণীতে পড়িতে দিলেন। এই সময় ব্রজেশের পিতা এলাহাবাদে বদলি হইয়া আসিলেন। ব্রজেশ আমাদের সহপাঠী হইল। নিকটেই তাহাদের বাসা। সে সর্বদা আমাদের বাড়ি আসিত; আমরাও সর্বদা তাহাদের বাসায় যাইতাম। তাহার স্নেহশীলা জননীর ব্যবহারে আমাদের দুই জনের হৃদয়ে মাতৃশোক-বেদনা বাজিয়া উঠিত।

তাহাব পর সুরমার বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, তখন বিভূতির সহিত তাহার বিবাহ হইল। বৎসবের পর বৎসর কাটিতে লাগিল। বিভূতি ও আমি একবৎসরে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। তাহার পর আমি এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম, বিভূতি পারিল না; কিন্তু সে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, আমি বিফলশ্রম হইলাম। সেই বৎসর আমি কন্‌গ্রেস উপলক্ষে বোম্বাই গমন করিলাম।

তথায় একজন গুজরাটি বণিকের সহিত আমার পরিচয় হইল। তিনি কয়জন অংশীর সহিত একটা কারবার স্থাপনের আয়োজন করিতেছিলেন। আমার এই কারবারে লিপ্ত হইবার ইচ্ছা হইল। সব কথা লিখিয়া বাবার কাছে কয়হাজার টাকা চাহিলাম। তিনি আমাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। নবীন উৎসাহে আমি সে কথা শুনিলাম না। মাতৃহীন পুত্র স্বভাবত পিতার কিছু আদরের হয়; তিনি শেষে আমার প্রার্থিত কয়হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার কথার অবাধ্য হইয়া,—তাঁহার নিকট হইতে আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে কি বেদনাই দিয়াছিলাম! হায়! তখন যদি স্বপ্নেও মনে করিতে পারিতাম, সে বেদনা দূর করিবার অবসর এ জীবনে আর পাইব না!

অংশী হইয়া সোৎসাহে কাজ করিতে লাগিলাম। কারবারে লাভও হইতে লাগিল। কাজ বাড়াইতে লাগিলাম। দুই বৎসর বাড়ি যাওয়া ঘটিল না। তাহার পর বিভূতির পত্র পাইলাম;—মফঃস্বলে মোকর্দমায় যাইয়া জ্বর লইয়া বাবা গৃহে ফিরেন,—তিন দিনের জ্বরে সব ফুরাইয়াছে। মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল।

বিভূতি এলাহাবাদে যাইতে লিখিয়াছিল। আর যাইতে ইচ্ছা হইল না। হৃদয়ের যন্ত্রণা ভুলিবার চেষ্টায় দ্বিগুণ শ্রম কবিতে লাগিলাম। কারবারের শাখা-সংস্থাপনের জন্য করাচি বন্দরে গমন করিলাম। তিন বৎসরে সে স্থানে কারবার ফলাও করিয়া ব্রহ্মে শাখা সংস্থাপন করিতে যাইলাম। সাত বৎসরে ব্রহ্মের শাখা মূলকে অতিক্রম করিয়াছে; সেই ব্যবসায়ব্যপদেশে কলিকাতায় আসিয়াছি। এখন আমি কারবারে প্রধান অংশী।

আজ একে-একে সব কথা মনে পড়িতে লাগিল। সুরমার শেষ পত্রখানি নিকটে ছিল; আবার পাঠ করিলাম। মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল; স্থির করিলাম ব্রহ্মে ফিরিবার পূর্বে একবার এলাহাবাদে যাইব। জগতে আমার আপনার বলিতে যাহারা আছে, তাহাদের দেখিয়া যাইব। এ দশ বৎসরে সুরমা কতবার আমাকে যাইতে লিখিয়াছে!

॥ ৩ ॥

পরদিন যথাকালে ব্রজেশের গৃহে উপনীত হইলাম। ব্রজেশ গৃহে ছিল না; ভ্রাতাকে লইয়া জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য একটি পাত্র দেখিতে গিয়াছিল। সে পূর্বদিনই তাহার জননীকে আমার কথা বলিয়াছিল; আমি গিয়াছি সংবাদ পাইয়াই তিনি আসিলেন। আমি প্রণাম করিলাম। তিনি একে-একে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কত খুঁটিনাটি, সুরমার কথা,

বিভূতির কথা, তাহাদের ছেলেদের কথা প্রভৃতি। আমি বিবাহ করি নাই শুনিয়া অনেক দুঃখ করিলেন। ব্রজেশের ছেলে-মেয়েরা আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল।

ব্রজেশ ফিরিয়া আসিল। দেখিলাম, তাহার মুখ ভার। আমরা একত্রে আহারে বসিলাম। মা কাছে বসিয়া রহিলেন, এটা খাও ওটা খাও, বলিয়া কত যত্ন করিতে লাগিলেন। এমন আদরে এ ভাবে আহার বহু দিন অদৃষ্টে ঘটে নাই। রমণীহৃদয় স্বভাবত স্নেহময়, আমি যে সকল ব্যঞ্জন ভালোবাসিতাম, তিনি মনে করিয়া সে সকল প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

আহারের পর ব্রজেশ ও আমি বাহিরে আসিলাম। ব্রজেশ বড় অন্যমনস্ক। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। ব্রজেশের দুশ্চিন্তা আজ জলধারার মতো তাহার হৃদয়ে বদ্ধ ছিল; আমার জিজ্ঞাসায় বাঁধ ভাঙিয়া গেল। যে পাত্রে কন্যাকে অর্পণ করিতে পারিলে সে সুখী হইতে পারিত, সে পাত্রের পিতা প্রচুর অর্থ যৌতুক চাহেন। তত অর্থ দরিদ্র সে কোথায় পাইবে? আর যে দুইটি পাত্র উপস্থিত, তাহাদের কাহাকেও কন্যা দিতে পিতৃহৃদয় অনিচ্ছুক। বলিতে-বলিতে ব্রজেশের গলা ধরিয়া আসিল।

আমারও মন কেমন হইয়া গেল। প্রথমে মনে হইল, যে ঘরে কন্যার সহিত ওজন করিয়া টাকা দিতে হইবে, সে ঘরে কন্যা-দানই অপমান। তাহার পর বুঝিলাম, চোবের উপর রাগ করিয়া ভূমিতে অন্নাহার সুবুদ্ধির কার্য নহে। পাত্রের পিতা অর্থপিশাচ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার উপর রাগ করিয়া কন্যার ভবিষ্যৎ সুখ-সম্ভাবনা অবহেলা করা যুক্তিযুক্ত নহে। সে চিন্তায় পিতৃহৃদয়ে যে বেদনার সঞ্চার হয়, তাহা অনাস্বাদিত অপত্যস্নেহ আমি কেমন করিয়া বুঝিব?

ভাবিতে-ভাবিতে পান্থশালায় ফিরিলাম।

॥ ৪ ॥

আমার মনে কেবল ব্রজেশের কথাই উঠিতে লাগিল। আমার ব্যর্থজীবনে যদি তাহার কিছু উপকারও করিতে পারি! আপনি সঞ্চয় অভ্যাস করি নাই, অভাবও অনুভব করি নাই। টাকা পাইলেই কারবারে ঢালিয়াছি। মনে হইল, বিভূতি বহুবার আমার পিতৃত্যক্ত অর্থের কথা লিখিয়াছে। অনেক ভাবিয়া স্থির করিলাম, এলাহাবাদের যাইয়া ব্রজেশকে টাকা সংগ্রহ করিয়া দিব।

পরদিন প্রাতে পুনরায় ব্রজেশের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তাহাকে সব কথা বলিলাম। কৃতজ্ঞতায় তাহার কণ্ঠস্বর বদ্ধ হইয়া আসিল। কিন্তু সে অর্থগ্রহণে কুণ্ঠিত হইতে লাগিল। আমি অনেক করিয়া তাহাকে বুঝাইলাম;—শেষে বলিলাম, যখন পার, টাকা শোধ করিও।

আমার পরামর্শে অনেক চেষ্টার ফলে ব্রজেশ আফিসে এক সপ্তাহের ছুটি পাইল। উভয়ে এলাহাবাদে যাত্রা করিলাম।

॥ ৫ ॥

এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়া সুরমার আনন্দ ও যত্ন, বিভূতির আপ্যায়ন, ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীদিগের উল্লাস, এই সকলের ধাক্কা সামলাইতেই একদিন কাটিয়া গেল। সুরমার সে আনন্দে আমার হৃদয়েও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বালক-বালিকাদিগকে দেখিয়া মনে হইল, আমার পক্ষেও সংসার মরুভূমি নহে।

পরদিন বিভূতিকে গোপনে ব্রজেশের কথা ও আমার সঙ্কল্প জানাইলাম। বিভূতি হিসাবের খাতাপত্র বাহির করিবার উদ্যোগ করিল। আমি বলিলাম, "ভাই, এই বারো বৎসর ওই সব লইয়াই আছি। যে দুই দিন এখানে থাকি, ও দায় হইতে অব্যাহতি দাও। ব্যাপারটা কি, বলো।"

বিভূতি জানাইল,—আমার পিতৃত্যক্ত অর্থ তাহার চেষ্টায় দ্বিগুণ হইয়াছে। অল্প দিন পূর্বে আমার নামে একটা সম্পত্তি ক্রীত হইয়াছে। সহস্রাধিক নগদ টাকা হাতে নাই।

আমি বলিলাম, "ভালো। তাহাই দেওয়া যাউক। কি বলো?"

তাহাই স্থির হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, অবশিষ্ট টাকাটার কি করি?

আমি এলাহাবাদে আসিয়াছি শুনিয়া আমাদের আর একজন বাল্যবন্ধু সেই দিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। ভগবানদাস এলাহাবাদের উকিল, এবং অতি প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। টাকা ধার দেওয়াই তাঁহার প্রধান ব্যবসায় ছিল; লোকে বলাবলি করিত, তাঁহার কাছে যে একবার টাকা ধার করিত, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বাড়াইয়া তিনি তাহার সর্বস্ব গ্রাস করিতেন। রামশরণ তাঁহার একমাত্র পুত্র। আমাদের বাড়ি পাশাপাশি, এবং আমরা সহপাঠী, তাই রামশরণের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। আজ রামশরণকে দেখিয়া আমার মনে হইল, তাহার নিকটে আমার দায়িত্বে এক হাজার টাকা ধার করিয়া ব্রজেশকে দিব, এবং যাইবার সময় টাকা শোধ করিবার ভার বিভূতির স্কন্ধে চাপাইয়া যাইব।

সেই দিন অপরাহ্নে আমি রামশরণের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম; সব কথা বলিয়া আমি স্বয়ং আমার দায়িত্বে এক হাজার টাকা ধার চাহিলাম। রামশরণ কয়মিনিট ইতস্তত করিল; আমি ভাবিলাম, বেনে-বুদ্ধি প্রবল হইতেছে। তাহার পর সে উঠিয়া পার্শ্বের কক্ষে গেল, এবং অল্পক্ষণ পরে আমাকে হাজার টাকার একখানি চেক আনিযা দিল।

আমি বলিলাম, "তোমার খাতা আন; লিখিয়া দিব। একটা লেখা-পড়া থাকা ভালো।"

রামশরণ বলিল, "আমি কেবল তোমার অনুরোধে ও আর এক জন বাল্যবন্ধুর উপকারের জন্য এ টাকা দিলাম। কিছু লিখিতে হইবে না। ব্রজেশের যদি সুবিধা হয়, টাকা শোধ করিবে। আমি দাদনের কাজ তুলিয়া দিয়াছি।"

অত বড় কাজ তুলিয়া দিয়াছে শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

"বাবার একজন খাতক যে ভাবে ঋণ পরিশোধ করিয়াছিল, তাহাতে আর কাজ চালাইতে পারিলাম না।"

আমি ভাবিলাম, একটা মোটা লোকসান হইয়া গিয়াছে; জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি?"

॥ ৬ ॥

রামশরণ বলিতে লাগিল,—আমাদের বিদ্যালয়ের পথে মুন্সী নন্দকিশোরের সেই বড় বাড়ি তোমার মনে আছে?—সে-ই হরিণ, ময়ূর ও পারাবত দেখিতে আমরা যে বাড়িতে প্রবেশ করিতাম? নন্দকিশোর সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। শেষ বয়সে তাঁহাদের শরিকে-শরিকে মোকদ্দমা বাধে। বাবাই নন্দকিশোরের উকিল ছিলেন। কয় বৎসর মোকদ্দমা

চলিল;—জলের মতো অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। মুন্সীজীর সঞ্চিত ধন ফুরাইয়া গেল। বাবা প্রথম অমনই, ক্রমে সম্পত্তি ও বাড়ি আবদ্ধ রাখিয়া, টাকা ধার দিতে লাগিলেন। কয় বৎসরে সুদে-আসলে টাকা আসলের দ্বিগুণ হইয়া গেল। এই সময় মোকদ্দামাও শেষ হইল, মুন্সীজীরও মৃত্যু হইল।

বাবা নালিশ করিয়া ডিক্রি পাইলেন। সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়া আপনি কিনিয়া লইলেন। গৃহমাত্র অবশিষ্ট রহিল, টাকাও পাওনা রহিল। অল্প দিন পরে বাবা বাড়িখানিও বিক্রয় করাইয়া কিনিলেন। কিন্তু বাড়ি দখল লইবার পূর্বেই তাঁহাকে সংসারের বাস উঠাইতে হইল।

আদালতে সেলামী দিয়া পিতৃসম্পত্তিব ব্যবহারের আদেশ পাইলাম। আমি দেখিলাম, বাড়ি দখল লইতে হইবে। মুন্সীজীর সন্তান ছিল না। অজস্র সুখে অভ্যস্তা তাঁহার বিধবা সেই গৃহে কোনওরূপে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। কেমন করিয়া গৃহ অধিকার করি?

কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া উকিলের পরামর্শ লইলাম। উকিল বলিলেন, দখল না-লইলে সব বৃথা। আর অধিক সময় নাই; ইহার মধ্যে দখল না-লইলে সব বিফল হইবে। আমি মুন্সীজীর পত্নীর নিকট সংবাদ পাঠাইলাম। সুখদিনসহচর দাস-দাসীরা পূর্বেই চলিয়া গিয়াছিল। কেবল জগতে অন্য কোনও আকর্ষণহীনা এক বৃদ্ধা দাসী পুরাতন প্রভুপত্নীকে ত্যাগ করে নাই। সে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল; বলিল, বিধবাকে ভিটা হইতে তাড়াইলে তাঁহাকে পথে মরিতে হইবে। আমার অভাব নাই। তিনি যে কয়দিন আছেন, আমি যেন দয়া করিয়া তাঁহাকে ভিটাচ্যুত না করি। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করিবেন।

সব শুনিয়া আমি কিছু টাকা ছাড়িয়া দিতে চাহিলাম। দাসী বলিল, "তাঁহার দিবার ক্ষমতা থাকিলে সব টাকাই দিতেন। ক্ষমতা নাই। সকল দিন আহার জুটাও কষ্টসাধ্য হইয়াছে।"

আরও একমাস গেল। আর চার দিন মাত্র সময় আছে। আমি আবার সংবাদ পাঠাইলাম; আবার সেই দাসী আসিল। আবার সেই কথা। কিন্তু আমি তো আর অপেক্ষা করিতে পারি না।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় আমি সংবাদ পাঠাইলাম, পরদিন প্রভাতে যাইয়া বাড়ি দখল করিব।

পরদিন প্রভাতে পরোয়ানা ও লোক লইয়া গৃহদ্বারে উপনীত হইলাম। দ্বার মুক্ত। আমরা প্রবেশ করিলাম। বাহিরের মহল শূন্য,—অপরিচ্ছন্ন; ঝাঁকে-ঝাঁকে পারাবত আমাদের অপরিচিত পদধ্বনিতে শঙ্কিত হইয়া উড়িতে লাগিল।

আমরা সে মহল অতিক্রম করিলাম।

অন্দর-মহলের দ্বারে সেই দাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার নয়নে কি পৈশাচিক দীপ্তি! সে বলিল, "আইস; তোমার ঋণ পরিশোধ করিব।"

আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। কয়টি কক্ষ অতিক্রম করিয়া আমরা অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম।

দাসী প্রাঙ্গণমধ্যস্থলে তুলসীবেদীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

আমি চাহিয়া দেখিলাম,—সেই বেদীমূলে মরণাহতা রমণী,—মৃত্যুযাতনায় চঞ্চল! বুঝিলাম, সৌভাগ্যগৌরবচ্যুতা রমণী ভিখারিণীর লাঞ্ছিত জীবনের যাতনা-ভোগ হইতে অব্যাহতিলাভের আশায় আত্মঘাতিনী হইয়াছেন। গৃহ-অধিকারের প্রমাণ কাগজপত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দ্রুত চিকিৎসকের সন্ধানে বাহির হইলাম।

অল্পক্ষণ পরে চিকিৎসক লইয়া ফিরিলাম।

তখন রমণীর মৃত্যুচাঞ্চল্য শেষ হইয়াছে; তিনি দুর্ভাগ্য-দুর্দশার সকল যাতনা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

আমি রমণীর সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

সেই ঋণ পরিশোধের পর আমি দাদনের কাজ বন্ধ করিয়া দিলাম। বিস্তৃত জাল ক্রমে গুটাইয়া তুলিলাম।

সে গৃহ অধিকৃত হইল। কিন্তু হায়!—সে গৃহ লইয়া আমি কি করিব? অনেক ভাবিয়া পিতার নামে একটি অনাথ-আশ্রম সংস্থাপন করা স্থির করিলাম। সে আশ্রমের ব্যয়নির্বাহের জন্য একলক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দিয়াছি। অনাথ-আশ্রম সেই গৃহে সংস্থাপিত হইয়াছে।

যদি আর কোথাও যাইবার না থাকে, চলো, সে আশ্রম দেখিয়া আসি।

১৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩১৪



মধুস্রবা

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গুর্জর প্রদেশের অন্তর্গত কুসুম্ভপুরের রাজা বন্ধুহিত পরমসুখে রাজ্যভোগ করিতেছিলেন। কন্যা মধুস্রবার যত্ন, সেনাপতি বলাহকের শত্রুশাসন ও সভাকবি ক্ষেমশ্রীর মধুর কাব্যরস রাজাকে চিন্তামুক্ত ও সদানন্দ করিয়া রাখিয়াছিল।

মধুস্রবার তনুলতায় লাবণ্যললিত পুষ্পশ্রী ঈষচ্চঞ্চল আয়ত নয়নে শুভ্র দুগ্ধনদীর ন্যায় মুগ্ধ দৃষ্টি; তরঙ্গায়িত ভ্রমরকৃষ্ণ বিপুল কেশরাশি ও লীলামধুর গতিভঙ্গীতে তাহাকে ঘনবর্ষার বিদ্যুৎপুঞ্জের মত মনে হইত।

সাগরোপকণ্ঠে রাজসভা,—মর্মরমণ্ডিত ভীমকান্ত সমুদ্র; পূর্বে সাগরসম্মিলিতা ক্ষুদ্রা স্রোতস্বিনী বিশাখা; উত্তরে নগরপ্রান্তে মেঘমালার মতো ধূম্রধূসর মুঞ্জকেশ পর্বত; পশ্চিমে এলালিঙ্গিত চন্দনতরুর উদ্যান। সমুদ্রে গর্জন, বিশাখার গুঞ্জন, মুঞ্জকেশের তরুরাজিনীলা শ্রী, উদ্যানলুণ্ঠিত মিশ্রগন্ধ রাজসভাটিকে অত্যন্ত মধুর করিয়া রাখিত; রাজার পার্শ্বোপবিষ্টা মধুস্রবার রূপজ্যোতি রাজসভাকে পূর্ণশ্রী দান করিত।

মধুস্রবার রূপ ও কুসুম্ভপুরীর সংস্থানসৌন্দর্যে বহু বীরহৃদয় প্রলুব্ধ হইত; কিন্তু বলাহকের তরবারি সকলকে বিমুখ করিত। রাজা সানন্দচিত্তে ক্ষেমশ্রীর কাব্যরস উপভোগ করিতেন। বলাহকের তরবারি মধুস্রবাকে স্মরণ করিয়া যেমন ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ হইয়াছিল, ক্ষেমশ্রীর কাব্যও তেমনই মধুস্রবাকে আশ্রয় করিয়া সকলের হর্ষ উৎপাদন করিত।

শত্রু-মথন-কালে বলাহক যে করুণ প্রেমব্যাকুল দৃষ্টিতে মধুস্রবার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিত, বলাহকের সেই চকিত দৃষ্টিতে কত প্রেম কত নীরব প্রার্থনা মধুস্রবার চরণে নিবেদিত হইত, তাহা কাহারও অগোচর থাকিত না। শত্রুবিজয়-অন্তে ক্ষেমশ্রীর কবিতায় মুদ্রিত-কমল-বেষ্টনকারী ভ্রমরের মতো যে হর্ষ-শোকার্দ্র গুঞ্জনধ্বনি ধ্বনিত হইত, তাহাতে মধুস্রবা বুঝিত, কত প্রেম, কত অব্যক্ত ব্যাকুলতা তাহাকেই আশ্রয় করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। যখন বলাহক গর্বোন্নতমস্তকে সভাস্থলে দাঁড়াইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিত, মহারাজ, আপনাদের স্নেহের কবচে আত্মরক্ষা করিয়া আমি আজ জয়ী। তখন ক্ষেমশ্রী কম্পিতকণ্ঠে হ্রীদীপ্তনয়নে নতমস্তকে গাহিত, ওগো! তোমার প্রেমে আমি আজ বন্দি। বন্দীকৃত শত্রুকে রাজসন্মুখে আনিয়া বলাহক যখন বলিত, মহারাজ, এই দুর্ধর্ষ শত্রুকে শৃঙ্খলীবদ্ধ করিয়া আনিয়াছি, এখন ইহাকে কি শাস্তি দিব, বলুন। তখন ক্ষেমশ্রী অশ্রুসজলনয়নে করুণামধুরকণ্ঠে গাহিত, বন্দীর লৌহশৃঙ্খল খুলিয়া দাও, উহাকে প্রেমের শৃঙ্খলে চিরবন্দি কর। বলাহক যখন শুভারম্ভে দেবদর্শনের ন্যায় চকিতে মধুস্রবার লাবণ্যললিত কৌমারশ্রী একাগ্রনয়নে পান করিয়া লক্ষ্যবেধে প্রবৃত্ত হইত, ক্ষেমশ্রী তখন পুষ্পস্তবকাভিরাম দৃষ্টি দ্বারা মধুস্রবার আরতি করিয়া আসিত। বলাহক চাহিয়া চাহিয়া হাসিত; দেখিতে-দেখিতে ক্ষেমশ্রীর চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিত।

॥ ২ ॥

মধুস্রবার বিবাহকাল উপস্থিত হইল। বলাহক মধুস্রবার পাণিপ্রার্থী হইয়া রাজাকে বলিল, মহারাজ হৃদয়ের শোণিত ব্যয় করিয়া চিরকাল আপনার আদেশ পালন করিয়াছি,

আজ তাহার পুরস্কার দিন। ক্ষেমশ্রী কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিতকণ্ঠে ভয়চকিত চিত্তে বলিল, মহারাজ ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়া আজীবন আপনাদের সেবা করিয়াছি,—তাহা স্মরণ করিয়া আজ প্রবাদ ভিক্ষা দিন।

উভয়েই রাজার প্রিয়। ক্ষেমশ্রী শুধু প্রীতি দিয়াছে; বলাহক ধনপ্রাণ রক্ষা করিয়াছে। তিনি সংশয়ভঞ্জনের ও কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের আশায় মধুস্রবার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মধুস্রবা উভয়কেই প্রীতিমধুরদৃষ্টিতে অভিনন্দন করিতেছে। তখন রাজাই বলিলেন, ধরণী ও রমণী বীরভোগ্যা; তোমাদের বলের পরীক্ষা হউক।

বলাহকের মুখচ্ছবি আশায় দীপ্ত হইল; বক্ষঃ স্ফীত হইয়া উঠিল। বলাহকের দিকে চাহিয়া মধুস্রবা একটু হাসিলেন, কিন্তু ক্ষেমশ্রীর মলিন মুখের দিকে চাহিতেই সে হাসি ম্লান হইয়া গেল।

ক্ষেমশ্রী বলিল, মহারাজ কবি সৌন্দর্য্যের উপাসক, রমণী প্রেম-পক্ষ পাতিনী; আমাদের প্রেমের গভীরতার পরীক্ষা হউক। মধুস্রবার মধুর দৃষ্টিপাতে ক্ষেমশ্রীর সুন্দর কমনীয় মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলাহক ব্যাকুল হইয়া রাজার মুখের দিকে চাহিল। রাজা বলিলেন, বলহীন কখনও আত্মরক্ষায় সক্ষম নহে; আমার রাজ্য ও কন্যার রক্ষায় কে সমর্থ? বলাহক তরবারি কোষমুক্ত করিল, মধুস্রবার স্মিতমধুর মুখের দিকে চাহিল। ক্ষেমশ্রী গাহিয়া উঠিল, প্রেম দিয়া শত্রুজয় করিব, প্রেমের বলে বলী হইব; স্বার্থই কি পরমার্থ? বিরোধী বিক্ষুব্ধ রাজ্য অপেক্ষা নির্বিরোধ তরুতলবাস শ্রেয়ঃকল্প। এইরূপে পর্যায়ক্রমে আত্মপক্ষসমর্থন করিয়া যে যখন মধুস্রবার সদয় দৃষ্টি লাভ করিতেছিল, সে তখন প্রফুল্ল ও অপর জন বিষণ্ণ হইতেছিল। রাজা বলিলেন, বলীই আমার কন্যা লাভ করিবে। বলাহক স্বীয় সৌভাগ্যগর্বে ক্ষেমশ্রীকে বিদ্রূপ-দগ্ধ দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করিল। ক্ষেমশ্রী বিনয়নম্রবচনে বলিল, তবে বলেরই পরীক্ষা হউক। তখন দন্তভরে বলাহক অসি গ্রহণ করিয়া ক্ষেমশ্রীকে আহবান করিল। ক্ষেমশ্রীর ব্যাকুল দৃষ্টি মধুস্রবা নয়নে সন্নদ্ধ হইল।

এতক্ষণ পরে মধুস্রবা কহিল, এরূপ বলপরীক্ষা ন্যায়সঙ্গত নহে। এক জন আজন্মশিক্ষিত অস্ত্রব্যবসায়ী, অপর জন অস্ত্র প্রয়োগে অনভিজ্ঞ, কবি। এরূপ অসম যুদ্ধে বল অপেক্ষা কৌশলেরই জয় হইবার অধিকতর সম্ভবনা। আর, অস্ত্রযুদ্ধে এক জন হত বা আহত হইতে পারে। তাহাও আমার অনভিপ্রেত। বলাহক তাহার প্রতি ভর্ৎসনাসূচক দৃষ্টিপাত করিল; ক্ষেমশ্রীর দৃষ্টিতে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। তবে বাহুযুদ্ধ হউক। মধুস্রবা তাহাও নিরাপদ মনে করিল না। তখন স্থির হইল, ভারোত্তোলনের শক্তি দেখিয়া বলের পরিমাণ হউক।

॥ ৩ ॥

শরতের কনকাভ উজ্জ্বল রবি-কিরণ সভা-প্রাঙ্গণে ব্যাপ্ত হইতে না হইতে সভাগৃহ জনপূর্ণ হইল। বৈতালিক রাজার আগমন ঘোষণা করিল। ক্ষেমশ্রী চির প্রথামত রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়া গান ধরিল; কিন্তু আজিকার গান অতি সংক্ষিপ্ত, অতি করুণ। নহবৎ বাজিয়া উঠিল। রাজাদেশে পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

বলাহক গুরু ভার সকল তুলিতে লাগিল। ক্রমশ অধিকতর গুরু ভার তাহার সন্মুখে উপস্থাপিত হইতেছে, আর সে তাহা তুলিয়া ফেলিয়া দিতেছে। বলাহক একটি ভার বক্ষ পর্যন্ত তুলিয়া আর তুলিতে পারিল না।

এখন ক্ষেমশ্রীর পালা। ক্ষেমশ্রীর সদা প্রফুল্ল মুখ আজ শারদ প্রভাতের মতো গম্ভীর সৌন্দর্যে পূর্ণ! সে অগ্রসর হইল। শত সহস্র চক্ষু সেই অক্ষমের উপর করুণা ও মঙ্গলেচ্ছার বৃষ্টি করিতে লাগিল। ক্ষেমশ্রী একবার সাগরের স্তব্ধ গম্ভীর মূর্তি নিরীক্ষণ করিল, একবার বিশাখাকে দেখিল, একবার মুঞ্জকেশ পর্বতের দিকে চাহিল, একবার এলালিঙ্গিত চন্দনতরুশ্রেণী দেখিয়া লইল,—সর্বশেষে মধুস্রবাকে দেখিয়া দেখিয়া দীপ্ত হইয়া উঠিল; তাহার পর পদ প্রান্তপতিত সেই গুরু ভার দুই হস্তে ধারণ করিয়া দ্রুতহস্তে মাথার উপর তুলিয়া ধরিল।

ক্ষেমশ্রীর জয়ে সভায় হর্ষকোলহল উত্থিত হইল; সভাজনের দৃষ্টির আঘাতে বলাহকের পরাজয় সহস্রগুণ তীব্র হইয়া উঠিল। লজ্জায় বলাহক ঘমাক্তবদন, পাংশুবর্ণ মৃত্তিকাবদ্ধদৃষ্টি। রাজা বলিলেন, সাধু ক্ষেমশ্রী! সাধু! তোমার প্রেমের জয় হইযাছে। গুরু ভার আর ধারণ করিয়া থাকিবার আবশ্যক নাই, ফেলিয়া দাও।

জয়োল্লসিত কবির কর্ণে সে কথা প্রবেশ করিল না। কবি মধুস্রবার দিকে বদ্ধদৃষ্টি, গুরু ভার প্রস্তর মাথার উপর ধরিয়া নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান। চারি দিক হইতে ধ্বনি উঠিল, ফেল, ফেল, প্রস্তর ফেলিয়া দাও। কবির মুখ হাস্যদীপ্ত, চক্ষু মধুস্রবার প্রতি নিবদ্ধ, হস্তে গুরু ভার। কবি অবিচল, অকম্পিত। মধুস্রবা বলিলেন, কবির হাত হইতে প্রস্তর নামাইয়া দাও। অমনই কয়েক জন লোক অগ্রসর হইয়া কবির হস্তধৃত প্রস্তর আকর্ষণ করিল। সে আকর্ষণে ক্ষেমশ্রীর প্রাণহীন দেহ প্রস্তর মূর্তিবৎ ভূমিতলে পতিত হইল।

বিজয়দৃপ্ত কবির এই অপূর্ব তিরোধান রাজসভার আনন্দকোলাহলের উপর মরণের করুণগম্ভীর একখানি যবনিকা টানিয়া দিল। মধুস্রবা তাহার পণজেতা স্বামীর এই মহিম-মণ্ডিত মৃত্যুতে হর্ষ-শোকে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছায় শান্তিলাভ করিল।

১৫ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, কার্তিক ১৩১১

প্রতিশোধ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্যামাশঙ্কর রায় যখন বর্তমান ছিলেন, তখন পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য হরিদাসের কর্তৃত্ব সামান্য দাস-দাসীগণকে অতিক্রম করিয়া প্রভুর পুত্রকন্যাগণ, এমনকি, গৃহিণী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বিচক্ষণ শ্যামাশঙ্কর পুত্র অপেক্ষা হরিদাসকে অধিক বিশ্বাস করিতেন, এবং দক্ষিণহস্ত অপেক্ষা তাহাকে অধিক প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিতেন। কোনও সঙ্কট উপস্থিত হইলে শ্যামাশঙ্কর গোপনে হরিদাসের পরামর্শ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই প্রভুভক্ত ভৃত্যটির বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তির পরিচয় পাইয়া অবধি বিজ্ঞ শ্যামাশঙ্কর সংসারের অর্ধেক কার্যের ভার তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

আজ একমাস হইল, শ্যামাশঙ্কর ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বিপর্যস্ত শোকাকুল সংসারের মধ্যে এখনও সে স্বাভাবিক শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে নাই। ভূমিকম্পের পর কোনও নগরের যেমন অবস্থা দাঁড়ায়, রায়-পরিবারের বর্তমান অবস্থাও কতকটা সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে। পূর্বের সে অভগ্ন সংযত অবস্থা কোথাও নাই; সব গ্রন্থি, সব বন্ধন শিথিল হইয়াছে। কিন্তু সংসারের নিয়ম, ভূমিকম্পের পর আবার নগর গঠিত হয়; ধনীব প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্যন্ত কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সেই নিয়মানুযায়ী ক্রমশ রায়-পরিবারের রন্ধনশালায় রন্ধনের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, গোয়ালে যথারীতি গোসেবা হইতেছে, অর্থলোলুপ দাস-দাসীর অবিশ্রান্ত চৌর্যবৃত্তিতে বাধা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, দ্বি-প্রহরে বধূ হেমলতার নির্জন কক্ষে তাস-হস্তে প্রতিবেশিনী বালিকাগণের প্রবেশ আরম্ভ হইয়াছে, এবং সন্ধ্যার পরে বৈঠকখানায় পরেশনাথের বন্ধুর সংখ্যা ও হারমোনিয়ম-তবলার শব্দ দিনে-দিনে বর্ধিত হইয়া উঠিতেছে।

ইহাই সহজ ও চিরন্তন নিয়ম; ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কোনও অনুযোগ ছিল না। কিন্তু হরিদাসের চক্ষে এই অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য পরিবর্তন সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। কর্তার জীবদ্দশায় তাঁহার অগোচরে তাস খেলাও চলিত, এবং সময়ে-সময়ে হারমোনিয়মও বাজিত;—কিন্তু তাহার মধ্যে যথেষ্ট সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের ভাব ছিল। শ্যামাশঙ্কর অন্দর হইতে বহির্বাটীতে আসিলে, অন্দরে তাস চলিত; এবং গ্রামান্তরে গমন করিলে হারমোনিয়ম বাজিত। এখন সে সংযত ভাব সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে;—যখন ইচ্ছা অন্দরে তাস চলিতেছে, এবং বাহিরে হারমোনিয়ম বাজিতেছে! এতদিন হারমোনিয়ম ও তাস শ্যামাশঙ্করের মৃত্যুর অপেক্ষায় যেন প্রচ্ছন্ন ছিল; এখন অবসর পাইয়া তাহারা সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতেছে; যেন তাহারা শ্যামাশঙ্করের মৃত্যুশোকসময়ের মধ্যেও অসঙ্গত দাবি স্থাপন করিতে চাহে। ব্রাহ্মণের ঘর না হইলে এতদিনে যে অশৌচও শেষ হইত না!

পরেশনাথ ও হেমলতার হৃদয়হীনতার নির্মম আঘাতে ক্ষুব্ধ হরিদাস অস্থির হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু কাহাকে সে দোষ দিবে, কি বলিয়া সে অভিযোগ আনিবে, তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

দ্বিপ্রহরে হেমলতা যখন সঙ্গিনীগণের সহিত তাসখেলায় মগ্ন থাকে—হরিদ

ভাবে,—সে গিয়া বলে,—"বউমা, কাজটা ভালো হইতেছে না।" কিন্তু কেন ভালো হইতেছে না, তাহা সপ্রমাণ করা বড় কঠিন হইবে। হৃদযেব এত সূক্ষ্ম অদৃশ্য অপরাধের নিকট তর্ক নিশ্চয় পরাস্ত হইবে। এ কথা যে স্বয়ং বুঝিতে না পারে, যুক্তির দ্বারা তাহাকে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। হেমলতা যদি জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, "কেন ভালো হইতেছে না?" তাহা হইলে সেই দণ্ডেই হরিদাসকে পরাজয় মানিতে হইবে। সংসারের একজন ভৃত্যের এরূপ আচরণ দেখিয়া রহস্যরসভোগিনী সঙ্গিনীগণের পক্ষে হযতো হাস্যসংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিবে। হেমলতা হয়তো এমন একটা কথা বলিয়া ফেলিবে, যাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে হইলে হরিদাসকে রায়-পরিবার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয।

সন্ধ্যার পর যখন পরেশনাথ বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়া হারমোনিয়মের সহিত গান ধবে, তখন হরিদাস পার্শ্বের ঘরে বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়া থাকে। হারমোনিয়মের সাতটা সুর সপ্তরথীর মতো তাহার ক্ষুব্ধ-চঞ্চল হৃদয়কে চারিদিক হইতে আক্রমণ করে। তাহার ইচ্ছা হয, পরেশনাথের অসাক্ষাতে গোপনে তাহার সখের হাবমোনিযম চূর্ণ করিয়া ফেলে, এবং তাহার তবলার সটান চর্মর মধ্যে একটা বড় ছিদ্র করিয়া দেয়। কিন্তু পরেশের উক্তপ্রকার ক্ষতি হইবার পূর্বেই তাহারই হৃদয়ের কতকটা চূর্ণ ও কতকটা ছিন্ন হইয়া যায়! এখনও মাসাধিক হয নাই পিতার মৃত্যু হইয়াছে। ইহারই মধ্যে পুত্রের এরূপ আচরণ দেখিয়া হরিদাস অত্যন্ত মর্মাহত হইত। বউমা তো পরের বাড়ির মেয়ে, তাহার কথা স্বতন্ত্র;—কিন্তু পরেশনাথের এ আচরণ হরিদাস কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না।

॥ ২ ॥

একদিন সন্ধ্যাবেলা হেমলতা পরেশনাথকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, "দেখো, হরি আমার শ্বশুরের পুরানো চাকর, কিন্তু আমিও তো তাঁহারই পুত্রবধূ। আমি তো' সংসারে ভেসে আসি নাই!"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "এ দুটোই ধ্রুব সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে তৃতীয় সত্য,—তোমার পিতৃকুলকে তুমি ভাসিয়ে এসেছ!"

অন্য সময় হইলে হেমলতা এ কথা লইয়া যথেষ্ট আলোচনা করিত। তাহার বিবাহের সময়ে অর্থ লইয়া তাহার দরিদ্র পিতার প্রতি অন্যায় উৎপীড়নের বিষয়ে নানাপ্রকার তর্ক ও যুক্তি দ্বারা অর্ধঘণ্টাকাল বচসা করিত, এবং হয়তো সেই উপলক্ষে দুই-তিন দিবস স্থায়ী মান-অভিমানের একটা বিষম গোলযোগ বাধিয়া যাইত। কিন্তু এখন মনের অবস্থা অন্যরূপ। সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া হেমলতা বলিল, "রঙ্গ রেখে, কথাটা শুনবে?"

ঘাড় নাড়িয়া পরেশ বলিল,—"রঙ্গ রাখিলাম, কথাটাও শুনব, অতএব বল।"

কথাটা সহজভাবে প্রকাশ করিতে হেমলতা একটু সঙ্কোচ বোধ করিল। পরেশের নিকট সে যে অভিযোগ রুজু করিতে আসিয়াছে, তাহাতে সে সম্পূর্ণ নিরপরাধা, সে বিষয়ে যেন সে ঠিক নিঃসন্দেহ নহে। প্রভু ও ভৃত্যের বিবাদে যে বেসুরা কর্কশ স্বর বাজিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে,—তাহার বাঁশি যেন হরিদাস নির্মাণ করিয়াছে, এবং হেমলতা যেন সেই বাঁশিতে ফুঁ দিয়াছে। হেমলতার মনে হইতেছিল, বিচারে বোধহয় একতরফা ডিক্রি তাহার ভাগ্যে ঘটিবে না। তাই কথাটা একটু ঘুরাইয়া বলিল, "তোমার চাকর তোমার স্ত্রীব আদেশ পালন করা কর্তব্য বলিয়া মনে করে না।"

পরেশ বলিল, "বলো কি? যাঁর আদেশ পালন করতে পারলে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করি, আমার ভৃত্য তাঁর আদেশ পালন করা কর্তব্য বলেই মনে করে না!"

বিচারকের এরূপ শোচনীয় গাম্ভীর্যের অভাব ও লঘুত্ব দেখিয়া বাদিনীর কপোলদুটি লাল হইয়া উঠিল। তাহার অলকের গুচ্ছ টানিয়া দিয়া বলিল, "তুমি যদি আর ঠাট্টা করো তো আমি—"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "মাটি! একেবারে অত বড় শপথটা করে ফেললে। আচ্ছা, তবে আসল কথাটা খুলে বল।"

"আমি আজ বাজারের ফর্দের সঙ্গে একজোড়া তাস কিনতে দিয়েছিলাম; হরি ফর্দ থেকে—তাসের জায়গাটি কেটে দিয়ে ফর্দ আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে, এবং বলে পাঠিয়েছে যে, কর্তার আমলে কেহ কখনও তাহাকে তাস কেনবার আদেশ করেনি। কর্তার মৃত্যুর একমাসের মধ্যে যদি তাকে তাসের দোকানে ঢুকতে হয়, তা হলে অল্প দিনেই তার দুর্দশার সীমা থাকবে না; সে তাস কিনতে পারবে না। দেখো দেখি, এ কি চাকরের কথা!"

পরেশ বলিল, "না, ঠিক চাকরের কথা নয়; কিন্তু এইটে মনে রেখো হেম, এই চাকরটিই কয়েক বৎসর পূর্বে তোমার স্বামীকে সকল বিষয়ে শাসন করত, এবং এখনও প্রয়োজনকালে করে' থাকে। এটা ভেবে তুমি তাকে ক্ষমা করতে পার। যাই হোক, কথাটা হরির ভালো হয়নি।"

"ভালো যে হয়নি, সেটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।"

"কাজ নেই; পুরাতন লোক, কিছু বললে মনে কষ্ট পাবে। আমাদের শাসন করতে পারে মনে করে' ও যদি একটু সুখ পায়, তাতে ক্ষতি কি?"

এ কথাব উপর কিছু বলিতে যাইলে স্বামীব সহিত বচসা করিতে হয়। রায়টা হেমলতার মোটেই পছন্দ হইল না। বিচারে হরিদাসেরই সম্পূর্ণ জিৎ হইল। সে মনে-মনে স্থির করিল, আর যদি কখনও হরিদাসের সহিত বিবাদ হয় তো পরেশের নিকট আর বিচারের জন্য আসিবে না। এবার স্বয়ং তাহাকে শাসন করিবে।

এই ঘটনার পর হইতে প্রায়ই হরিদাসের সহিত হেমলতার বিবাদ বাধিতে লাগিল। অতি সামান্য কারণ পাইলেই হেমলতা তাহাকে অপমান করে, এবং হরিদাসও এই অল্পবয়স্কা পরগৃহাগতা দাম্ভিকা বধূর অসঙ্গত কর্তৃত্ব কোনও প্রকারেই সহ্য করিতে পারে না। হেমলতা যখন তাহার অবগুণ্ঠন একটু সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে দুইটা অপমানবাণী শুনাইতে যায়, তখন হরিদাস এমন একটি কথা বলিয়া প্রস্থান করে, যাহা শুনিয়া হেমলতার একবার স্বামীর নিকট যাইতে ইচ্ছা হয়, এবং একবার পিত্রালয়ে যাইতে ইচ্ছা হয়। কোনও বিবাদ উপস্থিত হইলে, হেমলতা দশটা কথা বলিলে হরিদাস একটা কথা বলে; কিন্তু এমনই একটা গুরুতর কথা বলে, যাহার কঠিন আঘাতে হেমলতার দশটা কথা চূর্ণ হইয়া যায়,—রাগে ও অপমানে তাহার চক্ষু জলে পূর্ণ হয়।

এই প্রকার ছোট-ছোট অবিশ্রান্ত পরাজয়ে বধূ হেমলতার অন্তরে যে বহ্নি প্রত্যহ সঞ্চিত হইতেছিল, একদিন সহসা তাহা সহস্রশিখায় জ্বলিয়া উঠিল।

হেমলতার বিশ্বস্ত পরিচারিকা গোলাপ হেমলতার আদেশনুসারে হরিকে বলিল, "হরিদাস, মা বলিলেন, তুমি বাজারের জন্য যেমন পয়সা নাও, তেমন জিনিস আসে না।" দুই-একবার ইতস্তত করিয়া, ঢোক গিলিয়া বলিল, "মা বললেন, বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে।"

ক্রোধে ও ক্ষোভে হরিদাসের সর্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। সামান্য একটা দাসীর মুখে এমন স্পর্দ্ধা ও অপবাদের কথা শুনিয়া তাহার হিতাহিতজ্ঞান লোপ পাইবার উপক্রম হইল। হরিদাস গর্জন করিয়া বলিল, "কিসের বাড়াবাড়ি রে? তুই যদি আর কোনও কথা মুখে আনবি তো তোর মুণ্ড ছিঁড়িয়া দিব।"

ক্ষণভঙ্গুর দেহ-রক্ষার জন্য মুণ্ডের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দাসীর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল, এবং সমুণ্ড দেহের মায়াও তাহার অল্প ছিল না। সেই সযত্ন রক্ষিত দেহেব সম্বন্ধে এইরূপ আশঙ্কাজনক প্রস্তাবের পর গোলাপ দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া বিবেচনা ও সতর্কতাব পরিচয় দিল।

॥ ৩ ॥

ঠিক সেই সময়ে ফুলবাগানের দিকে দক্ষিণেব বাবান্ডায় একটা বেঞ্চেব উপব হেমলতা ও পরেশ উপবেশন কবিযা গ্রীষ্মকালের সবটুকু সুখ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সুশীতল স্নিগ্ধ পবনে বাগানেব সব ফুলগুলি ফুটিযা উঠিযাছে; সপ্তমীর শশাঙ্কের ক্ষীণালোকে সমস্ত বাগানটি মাযাজলে জড়িত একটি অস্পষ্ট স্বপ্নবাজ্যেব ন্যায় দেখাইতেছে; এবং দূরে মালীর ঘরে মালীর এক কন্যা উচ্চস্বরে ছড়া পড়িতেছে।

হেমলতার হস্ত ধারণ করিয়া পবেশ বলিল, "জীবনটা যদি ঠিক এইখানে আটকে যায় তো মন্দ হয় না। গ্রীষ্মকালেব সন্ধ্যা, ফুলের বাগান, চাঁদেব আলো, আর তুমি!"

হেমলতা অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল, গোলাপের নিকট অপমানিত হইয়া হরিদাস কি করিবে। তাহার মনে একটু ভয়ও হইতেছিল। শ্বশুরের এই অতি পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যের প্রতি সে যেমন দিন-দিন নির্মম হইয়া উঠিতেছিল, তেমনই তাহাকে একটু ভয়ও করিত। এই স্বতন্ত্রপ্রকৃতি নির্ভীক স্পষ্টবাদী ভৃত্যকে অতি যত্নেও হেমলতা সামান্য একটা বেতনভোগীর মতো মনে করিতে পারিত না। রূঢ় আচরণের দ্বারা সে সেই ভাবই প্রকাশ কবিতে চেষ্টা করে, কিন্তু অন্তবের মধ্যে মনে হয, সে যেন অন্তরঃ তাহার একজন সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। এইরূপ একটা অসহনীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হৃদয়ে বহন কবিতেছিল বলিয়াই হেমলতা স্থির করিযাছে, যে এবারে এরূপ একটা বাণ নিক্ষেপ কবিতে হইবে, যাহার তাড়নায় হরিদাসের বিশাল গর্বস্ফীত বক্ষ বিদীর্ণ হইযা, তাহাব ভৃত্যত্বের দীন মূর্তি সকলের সমক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, এবং হেমলতার প্রভুত্ব এই নিরুপায়-লাঞ্ছিত ভৃত্যত্বকে ক্ষমা করিয়া স্বীয় মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিবে! নারীহৃদয়ের কোন অজ্ঞেয় প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা সামান্য কৌতূহলেব বিষয় নহে। সেই অস্পষ্ট চন্দ্রালোকের দিকে চাহিয়া সেও হয়তো আপনার দুর্বলতার বিষয়ই চিন্তা করিতেছিল, তাই স্বামীর সোহাগবচনের সবটা তাহার কর্ণে প্রবেশ কবে নাই; লজ্জিত হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি কি?"

তাহার কবরীর মধ্য হইতে একটা ফুল তুলিয়া লইয়া পরেশ বলিল, "তুমি আমার স্ত্রী!"

"সেটা কি আজ প্রথম অনুভব করলে?"

"প্রথম না হলেও, প্রথম দিনকার মতনই আজ যেন অনুভব কবছি।" বলিয়া পরেশনাথ হেমলতার রক্তিম কপোল আরও একটু রক্তিম করিয়া দিল।

কঠোর আদান-প্রদানময় কর্কশ গদ্যপূর্ণ সংসারের মধ্যে এতটা কাব্যেব সৃষ্টি বোধহয়

সীমা অতিক্রম করিতেছিল, তাই ভাগ্যদেবতার অভিশাপস্বরূপ সমস্ত কবিত্ব নষ্ট করিয়া পশ্চাতে ক্রোধকম্পিত গুরুগম্ভীর স্বরে ধ্বনিত হইল, "বউমা, গোলাপকে দিয়ে কি বলে পাঠিয়েছ? আমি চোর? আমি তোমার বাজারের পয়সা চুরি করি?"

পূর্ব হইতে কতকটা প্রস্তুত থাকিলেও, হেমলতা আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িল; প্রেমের সুশীতল বারিসেচনে তাহার অন্তর যখন বেশ সিক্ত হইয়া আসিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে এক ক্রুদ্ধ উৎপীড়িত অন্তঃকরণ সুযোগ পাইয়া সেই অসংযত হৃদয়কে আক্রমণ করিয়াছে! অল্প সময়ের মধ্যে তাহার সহিত যুঝিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া কিছু কঠিন। হেমলতা বাক্যহীন হইয়া বসিয়া রহিল। পরেশের পক্ষে ব্যাপারটা আরও আকস্মিক, পূর্বে সে এ-বিষয়ে কিছুমাত্র অবগত ছিল না।

হরিদাস বলিল, "এত বয়সে মা, তোমার মতো বালিকার সহিত ঝগড়া করিতে প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু তুমি যে কথা আজ আমাকে বলেছ, ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তোমার শ্বশুর একদিনও আমাকে সেরকম কথা বলেননি।"

হেমলতা এতক্ষণে কতকটা সামলাইয়া লইয়াছিল। অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; সে বলিল, "তুমি আজ আমার চাকর; তোমাকে যাহা ইচ্ছা বলতে পারি, তোমাকে বলতে পারি তুমি চোর। তুমি বেয়াদব!"

ক্রোধে হরিদাস চারিদিকে অন্ধকার দেখিল, বলিল, "অন্যায় কথা বোলো না বউমা, তুমি স্ত্রীলোক, পরেশের স্ত্রী, তোমাকে আজ ক্ষমা করব প্রতিজ্ঞা করেছি। কিন্তু বেশি রাগিয়ো না মা, রক্তটা আমার গরম, কি জানি যদি তোমার সম্মান রেখে না চলতে পারি।"

পরেশ বলিল, "দেখো হরি, তোমার অনেক অপরাধ ক্ষমা করেছি—কিন্তু আর তোমাকে ক্ষমা করতে পারি না। তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা, তুমি আমার সম্মুখে আমার স্ত্রীকে অপমান করো? যাও, তুমি দূর হয়ে যাও।" কথাটা এরূপ কঠিনভাবে বলিবার ইচ্ছা ছিল না,—কিন্তু কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া কাঠিন্য অনিবার্যভাবে আসিয়া পড়িল। স্থিরভাবে হরিদাস বলিল, "যাব ভাই, তাই যাব। তবে যাবার আগে বউমাকে দুটো কথা বলে যেতে চাই। দেখো বউমা, তোমার মা! আমি অনেক চুরি করেছি, আজ একমাস আমি তোমার চাকর, এই একমাসের মধ্যে যখন যা সুবিধা পেয়েছি চুরি করেছি। মোটামুটি একটা হিসাবে চুরিটার শোধ দেবার জন্য একশো টাকা এনেছি। কিছু যদি কম পড়ে তো ক্ষমা কোরো। ত্রিশ বৎসরের একটা পাকা চোর আজ তোমার হাতে ধরা পড়ে বিদায় নিচ্ছে। বিদায় নিতে তার চোখে যদি জল এসে থাকে তো মনে কোরো, এই ত্রিশ বৎসরের লোভটা বন্ধ হল—সেই দুঃখের সে মায়াকান্না। আজ থেকে তোমার সংসার নিষ্কণ্টক হল!"

বারান্ডার আলো ও অন্ধকারের মধ্য দিয়া হরিদাসের দীর্ঘদেহ সরিয়া গেল। হেমলতা ও পরেশনাথ চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া রহিল; কাহারও কথা কহিবার শক্তি ছিল না। তাহাদের পদতলস্থিত টাকার থলির মধ্য হইতে প্রত্যেক মুদ্রা তাহাদিগকে কশাঘাত করিতে লাগিল। মালীর কন্যা তখন দুর্গার অধিবাস ও বিবাহের ছড়া শেষ করিয়া পড়িতেছে,—

চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা।

কিন্তু হায়, ধরা পড়িয়াছে! এই বড় বিদ্যায় বিদ্বান না হইয়াও যে অপমানিত-লাঞ্ছিত হইয়া আজ ধৃত হইয়াছে, তাহার সান্ত্বনার জন্য কোনও ছড়া আছে কি না, জানি না।

॥ ৪ ॥

সেই রাত্রেই হরিদাস রায়-পরিবার ত্যাগ করিয়া আপনার গৃহে চলিয়া গেল। এতকালের পুরাতন ভৃত্যের অভাব বোধ করিয়া পরেশনাথ অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়াছিল, এবং হেমলতাও বোধহয় একটু অনুতপ্ত হইয়াছিল। কিছুদিন পরেই তাহারা এই কষ্টটুকু ভুলিয়া গেল, এবং সুখে-দুঃখে বিজড়িত হইয়া তাহাদের সংসার আবাব পূর্ব্বে মতো চলিতে লাগিল।

কিন্তু প্রায় তিন বৎসর পরে একদিন সহসা এই সুখ-দুঃখ-মিশ্রণের মধ্যে দুঃখের অংশটা চূড়ান্তপরিমাণে বাড়িয়া উঠিল। গ্রামে একটা হত্যা হইয়া গেল, এবং তৎক্ষণাৎ চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইল যে, প্রাতঃস্মরণীয় শ্যামশঙ্কব বায়ের কুলাঙ্গার পুত্র পরেশনাথের দ্বারা এই প্রণয়ঘটিত দুষ্কর্ম ঘটিয়াছে। তদন্তের জন্য পুলিশ যখন সদলবলে গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন পরেশের একদল শত্রু হলফ লইয়া সাক্ষ্য দিল যে, তাহারা স্বচক্ষে পরেশকে হত্যা করিতে দেখিয়াছে। পুলিশসাহেব সন্তুষ্টচিত্তে পরেশনাথকে চালান দিলেন।

এই আকস্মিক বিপদে ভয়ে ও ভাবনায় হেমলতা অবসন্ন হইয়া পড়িল। কি উপায়ে তাহার নির্দোষ স্বামী এ বিপত্তি হইতে উদ্ধার লাভ কবিতে পাবে, তাহা কোনমতেই তাহার বুদ্ধিতে আসে না। ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া যখন কোনও উপাযই সে করিতে পারিল না, তখন তাহার পিতাকে লিখিল, "বাবা অভাগিনীকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করো, নহিলে বিষ খাইয়া মরিব।"

অজস্র অর্থব্যয় ও পিতার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও কোনও ফল হইল না। বিচারপতি পবেশনাথকে দোষী সাব্যস্ত করিযা মোকর্দমা সেশনে দিলেন। অশেষচিন্তাগ্রস্ত হেমলতার পিতা বলিলেন, "কিছু ভয় নাই মা, এখনও হাতে হাইকোর্ট পর্যন্ত আছে।"

সেশন-জজের নিকট পরেশনাথেব বিচারেব দিন বিচাবালয লোকারণ্য। বিচারের ফল জানিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। এই অতিবিপন্ন ভদ্রসন্তানটির দুঃখে সকলেরই মন বিষণ্ণ। সকলেই বলিতেছে, আহা এ যেন বাঁচিয়া যায়। পরেশনাথের পক্ষাবলম্বী ব্যারিস্টার তাঁহার সাধ্যমতো কর্তব্য শেষ করিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার পার্শ্বে হেমলতাব পিতা হরমোহনবাবু দণ্ডায়মান হইয়া দুর্গানাম স্মবণ করিতেছেন।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মুখমণ্ডল বিকৃত করিয়া বিচাবক পরেশকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, "তোমার পক্ষ হইতে তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাতে আমি তোমাকে অব্যাহতি দিতে পারি না, প্রতিকূল প্রমাণের বলে তোমার মৃত্যুদণ্ড স্থির হইল।"

গৃহমধ্যে সহসা বজ্রাঘাত হইলেও সকলে সেরূপ চমকিত হইত না। সকলেই অনুমান করিয়াছিল যে, পরেশনাথ একেবারে অব্যাহতি লাভ করিতে সক্ষম হইবে না; কিন্তু এরূপ ভীষণ দণ্ড তাহাকে বহন করিতে হইবে, তাহা কেহও মনে করে নাই। ব্যারিস্টার টেবিলে হস্তাঘাত করিয়া বলিল, "Lord, this is hard indeed!" হরমোহন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। এবং পরেশনাথ স্তম্ভিত হইয়া নির্বাক-নিশ্চল প্রস্তবমূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা একমুহূর্তের মধ্যে সহসা তাহার আকৃতির মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন ঘটাইয়া দিল, যাহা দেখিয়া বিচারক পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিলেন, এবং সম্মুখে একটা দর্পণ থাকিলে তাহাতে নিজমূর্তি দেখিয়া পরেশনাথের উন্মত্ত হইতে বিলম্ব হইত না। তাহার হৃদয়ের স্পন্দন রহিত হইবার উপক্রম হইল, তাহার চক্ষের আলো নিভিয়া আসিল। মনে হইল, বিশ্বসংসারের সমস্ত সুখ, সমস্ত আশা, সমস্ত সম্পদ, একটা রজ্জুতে

বদ্ধ হইয়া নির্মম কঠিন ফাঁসিকাঠে ঝুলিতেছে;—মনে হইল, বহির্জগতের অপরিমেয় বায়ুরাশির সহিত তাহার শ্বাসনালীর সংযোগ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ভয়ে ও নৈরাশ্যে তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, এবং উন্মত্তের ন্যায় চক্ষু ধক্-ধক্ করিতে লাগিল।

হস্তে পৈতা জড়াইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে হরমোহন বলিল, "ভগবান! আমার নির্দোষ জামাইকে রক্ষা করো, আমার অসহায় কন্যার সহায় হও। এ কথা শুনিলে সেও দড়িতে ঝুলিবে!"

এমনসময়ে একটা কাণ্ড ঘটিল। সহসা জনতার মধ্য হইতে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া আরক্তনয়নে ঘর্মাক্তকলেবরে হরিদাস বিচাবকের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার সুদীর্ঘ দেহ উত্তেজনায় কম্পিত হইতেছে, মুখে উৎকট চিন্তার পর স্থির সিদ্ধান্তের দৃঢ় চিহ্ন অঙ্কিত, এবং চক্ষু দুইটা আবেগে ঠিকরিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

সে কহিল, "ধর্মাবতার! আপনি বিচার করুন, আমি আর পাপ লুকাইয়া রাখিতে পারিতেছি না; যন্ত্রণায় আমাকে পাগল করিয়া দিবে। এ খুন আমি করিয়াছি। ধর্মাবতার! আর-একটা খুনের দায় থেকে আমাকে রক্ষা করুন। পরেশের কোনও দোষ নাই, যাহারা তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহারা মিথ্যা বলিয়াছে। এতদিন ভয়ে কিছু বলি নাই—আজ প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া সত্য কথা বলিয়া ফেলিলাম—আমাকে দণ্ড দিন, আমার বাঁচিয়া সুখ নাই।"

পরেশের কৌন্সিলি উল্লাসে লাফাইয়া উঠিলেন, "Here is the culprit-the devil!" হরমোহন কাঁপিতে-কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—"ভগবান মুখ তুলে চাও!" জজ হরিদাসকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, "তুমি যে কথা বলিতেছ, তাহার প্রমাণ কী?"

ভীষণ মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে আসিয়াছে, তাহার আবার প্রমাণের অভাব! সে এমনভাবে গুছাইয়া-বানাইয়া কৌশলে মিথ্যার রাশি বলিয়া গেল যে, তাহার যুক্তি ও সঙ্গতি দেখিয়া জজ তখনই লিখিত রায় কাটিয়া ফেলিলেন, এবং পরেশনাথের পরম শত্রু মিথ্যা সাক্ষিগণ আশঙ্কায় দুর্গানাম স্মরণ করিতে লাগিল। পরেশনাথেব ব্যারিস্টার রক্তবর্ণনেত্রে গর্জন করিয়া ধমক দিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে সত্যটুকু বাহির করিয়া লইলেন। তাহার দ্বারা এই সপ্রমাণ হয় যে, কে খুন করিয়াছে, তাহা তাহারা অবগত নহে; শুধু পরেশনাথের এক পরম শত্রু জমিদার-পুত্রের প্ররোচনায় ও নির্যাতনে তাহারা পরেশের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছে।

॥ ৫ ॥

সন্ধ্যাকাল। শুভ্র জ্যোৎস্নায় জেলখানার ফুলের বাগানটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। নীড়ে প্রত্যাগত পক্ষিগণ তখনও তাহাদের ক্ষুদ্র বাসায় রাত্রিযাপনের জন্য সম্পূর্ণ সুবিধা করিয়া লইতে পারে নাই। আম্রশাখার অন্তরালে তাহাদের পাখার ঝাপট শুনা যাইতেছে। এক ঝাড় কামিনী ফুল ফুটিয়া জেলখানার সমগ্র প্রাঙ্গণ গন্ধে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। দূরে আলোকসমুজ্জ্বল দ্বিতলকক্ষে ইংরাজ জেলরের স্ত্রী ও কন্যা পিয়ানো বাজাইয়া গান গাহিতেছে। বন্দীরা সকলেই কারাকক্ষে আশ্রয় লইয়াছে—কেবল হরিদাসকে একজন প্রহরী ফুলবাগানের এক নির্জন প্রান্তে লইয়া আসিয়াছে।

হরিদাস নীরব, অত্যন্ত উদাসীন। অনন্ত আকাশের নীলিমার দিকে চাহিয়া হরিদাস ভাবিতেছিল, মানুষ মবিয়া কোথায় যায়! এই অনাদি অনন্ত বিশ্বসংসারের কোন প্রান্তে

কোন কোণে তাহার বিশ্রাম করিবার অবসর ঘটে! শেষ বিশ্রামের অবকাশ ঘটে! সে বিশ্রাম কত দিন স্থায়ী হয়, কোথায় কবে তাহার শেষ! আবার কি কোনও জগতে তাহাকে জন্ম লইতে হয়! মানুষ যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তখন সে কত মুক্ত, কত সুখী! তার পর যেমন দিন-দিন তাহার বয়স বাড়িতে থাকে, এক-একটি করিয়া গ্রন্থি আসিয়া কেমন একটি সম্পূর্ণ জাল তাহার চতুর্দিকে বুনিয়া দিয়া যায়; কোনও দিকে তাহা মুক্ত নহে—একটি সম্পূর্ণ সমগ্র জাল! এই জাল বুনিতে-বুনিতেই জীবনের শেষদিন আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন জাল ছিন্ন করিবার পালা। সমগ্র জীবনেব গ্রথিত জালকে মুহূর্তে ছিন্ন করিতে হইবে! জীবনের এ অংশটা এত কঠিন, এত ভয়ানক কেন করেছ, ভগবান!

এই রাত্রি শেষ হইলেই একটা কঠিন রজ্জুব গ্রন্থির দ্বাবা তাহার জীবনেব সব গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইবে। সেই নির্মম জীবনান্তক গ্রন্থির সাহায্যে কল্য হইতে তাহাকে যে নূতন সূত্র অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাব আকার-প্রকাব, দৈর্ঘ্য, গতি ও গন্তব্য তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আবার কাল প্রভাতে পৃথিবীতে নিত্যকাব মতো সূর্য উঠিবে, নিত্যকার মতো জেলখানার বাগানে ফুল ফুটিবে,—নিত্যকার মতো বিশ্ববাসীব সমস্ত তুচ্ছ ও মহৎ কার্য চলিতে থাকিবে। কেবল তাহাকে এই সকলেব মধ্য দিয়া চল্লিশ বৎসবের অভ্যস্ত, চিরপরিচিত সূর্যালোকিত আশ্রয়স্থল ত্যাগ কবিয়া একটা সংশয়পূর্ণ আশঙ্কাপূর্ণ অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ কবিতে হইবে। এই দুইটি অতি-পরিচিত ও অতি-অজ্ঞাতেব সন্ধিস্থলে কেবল দুইটি তুচ্ছ কাঠ ও একগাছি অকিঞ্চিৎকর রজ্জু! তাহারাই অবলীলাক্রমে এই দুইটা অসামান্য বিপর্যয়ের সংযোগ ঘটাইয়া দিবে!

পার্শ্বের প্রাচীরগাত্রসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া গেল। একজন প্রহরীর সহিত পরেশনাথ প্রবেশ করিল। প্রহরী দুইজন কিছু দূরে গিয়া বসিল। পরেশ আসিয়া হরিদাসের পার্শ্বে বসিল। হরিদাস ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কেন এমন করে তুমি এখানে আসো? কেউ জানতে পারলে আবার যদি কোনও বিপদ হয়। যাও; তুমি বড় ছেলেমানুষ।"

এই আশঙ্কাজনিত স্নেহের ভর্ৎসনায় পরেশের চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। বলিল, "হরি, আমার সমস্ত জীবনটা শূন্য করে দিয়ে গেলে!"

"উপায় যে ছিল না ভাই, মানুষে কি সহজে প্রাণের মায়া ছাড়ে? কি করব বলো, সব ভগবানের ইচ্ছা!"

"তুমি আমার জন্য প্রাণ দিলে হরি, আমি তোমার কিছু করতে পাবলাম না! এই রকম করে কি উপকার করতে হয় ভাই? প্রত্যুপকার করবার আর অবসর দিলে না!"

শুনিয়া হরিদাসের গণ্ড বহিয়া দুইবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। মনটা মহাশূন্য নীলিমার রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া আবার জালে গ্রন্থি দিতে আরম্ভ করিল। বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। তখন জীবনটা কত সুখের, আর পৃথিবী কত সুন্দর মনে হইত! বাপ-মার মুখ তেমন মনে পড়ে না, কিন্তু যে দিন রায়-পরিবারে আশ্রয় গ্রহন করিল, সেদিনকার কথা বেশ মনে পড়ে। কর্তার পিতার ন্যায় স্নেহ, গৃহিণীর মাতার ন্যায় যত্ন! আহা! তাঁহারা যেন দেবতা ছিলেন! সেদিনকার কথা বেশ মনে পড়ে, যেদিন কর্তা ও গৃহিণীর উদ্যোগে তাহার বিবাহ হইল। কিন্তু কত দিনের জনাই বা! সে এখন কোথায় আছে, কে জানে! তাহার পর একদিন পরেশ জন্মগ্রহণ করিল—একটি ফুটফুটে চাঁদ! তাহাকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিল, তাহার আবার একদিন বিবাহ হইল। গৃহিণীর মৃত্যু, তাহার পর কর্তার মৃত্যু। আহা, সেদিন কি দুঃখের দিন! তাহার পর হেমলতাব ব্যবহারের কথা মনে পড়িল।

সে দিন কি ভয়ানক,—যেদিন সে অপমানে পীড়িত হইয়া পর্বতপ্রমাণ অভিমান লইয়া রায়-পরিবার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু মাথার উপর ভগবান আছেন! সেই অন্যায় অপমানেব চূড়ান্ত প্রতিশোধ লইবার সুযোগ উপস্থিত হইল! এ লোভ কি সংবরণ করা যায়! হরিদাস সেই অপমানের আজ প্রাণান্তক প্রতিশোধ লইয়াছে। হেমলতার আজ সম্পূর্ণ পরাজয়! আত্মপ্রসাদে হরিদাস সর্বান্তঃকরণে হেমলতাকে ক্ষমা করিল।

"হরি!"

"কি ভাই?"

"একটা কথা বলব?"

"বলো।"

"সে এসেছে।"

"কে, বউমা?"

"হ্যাঁ, সে তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে এসেছে।"

হরিদাস জিব কাটিয়া বলিল, "ও কথা বোলো না, পাপ হবে। কিন্তু তাঁকে এখানে এনে ভালো করোনি।"

"তাকে নিয়ে আসব? কোনও ভয নেই; আমি এদেব অনেক ঘুস দিযেছি।"

"অন্যায় করেছ ভাই, তুমি বড় ছেলেমানুষ। বউমাকে এখানে এনো না, তুমি যাও।"

"তবে তুমি তাকে ক্ষমা করোনি?"

"ভাই। ক্ষমা না করলে কি প্রাণের মায়া ত্যাগ করতাম? তুমি যাও, তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ো।"

দূরে কিসের শব্দ হইল। প্রহরী বলিল, "চলে আও বাবু! চলে আও, সাহেব আতা হ্যায।"

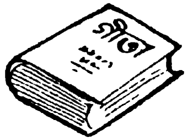
হরিদাস যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। পরেশ তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, "হবি, ভাই আমাকে ক্ষমা করো—"

"আর জ্বালা দিস নে ভাই, আমি চল্লাম।"

আর এত দিনের মতো হরিদাস আলো ও অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল।

সে দিন হরিদাস চোর ছিল না, কিন্তু চোরের অপবাদ বহন কবিযাছিল। আজও সে খুনী নয়, কিন্তু আজ সে মিথ্যাবাদী। এ মিথ্যার পুরস্কার বোধ হয় স্বর্গ।

১৯শ বর্ষ, ৩য সংখ্যা, আষাঢ় ১৩১৫



ব্রত-ভঙ্গ

নিরুপমা দেবী

অতুলচন্দ্র কবিতা, কল্পনা, নাটক-নভেল, এমন-কি, প্রণয়, ভালোবাসা, প্রেম শব্দগুলার উপরেও বিষম চটিয়া গেল। অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইলেই সেটা কার্যে প্রকাশ করা শরীর ও মনের একটা বিশেষ গুণ; নহিলে শক্তির মূর্তির প্রমাণাভাব ঘটে। অন্তরে চৈতন্য জাগ্রত হইলে দেহে তাহার তেজ বিকাশ পাইয়া থাকে।

কাজেই অতুলচন্দ্র তাহার দেওয়ান, গোমস্তা, অভিভাবক, আত্মীয় ইত্যাদি বলিতে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' জেঠাইমার স্কন্ধে তাহার যাবতীয় অস্থাবর, কি না কবিতার খাতা, ফাউন্টেন পেন, রবিবাবুর কাব্যগ্রন্থাবলী, মহিমফ্লুট হারমোনিয়ম, 'হাওয়াগাড়ি' সিগারেটের বাক্স, কেস্, জাপানি দেশলাই প্রভৃতি এবং স্থাবর সম্পত্তির নূতন বোঝাটি ফেলিয়া দিয়া, এলাহাবাদে বন্ধু রমেশের নিকট পলাইয়া গেল। বৈষয়িক হিসাবে যাহাকে স্থাবর-অস্থাবর বিষয় বলা যায়, বহুদিন হইতেই সেগুলি জেঠাইমার অধিকারভুক্ত।

জেঠাইমা অতুলের পলায়নে তত বেশি উদ্বিগ্ন হইলেন না; কেন না, অতুলের এরূপ কার্য এই প্রথম নয়। তাহার দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি জোর করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। ভাবিলেন, 'যুগ্যি ছেলে। আর বেশি রাশ টানা উচিত নয়। দুদিন মনটা একটু ভালো করে ঝোঁকটা সামলে আসুক।'

অতুলের বন্ধু ও শিষ্য শ্রীমান রমেশচন্দ্র কল্পনা ও কবিতায় এখন তাহাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। গুরুর বাক্যে ও কার্যে বৈরাগ্যের ঘোর প্রভাব দেখিয়াও সে ব্যক্তি পশ্চাৎপদ হইল না। বহু গুরু-মারা টীকা করিয়াও যখন সে সুকৃতিশালী, চতুর্বিধ ভজনাকারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী, বিবিক্ত-হৃদয় অতুলকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিল না, (হায় মূঢ় রমেশ! ভগবানের অতি প্রিয় যে পথ, সেই পথের পথিক অতুলের মাথা নিশ্চিতই খারাপ হইয়াছে, এই তাহার ধারণা।) তখন সে তাহার ত্রিতলস্থ একটি কক্ষের সমস্ত আস্বাব বাহির করিয়া দিয়া এক সুদীর্ঘ কম্বল পাতিয়া, খানকয়েক মৃগচর্ম ও এক বিকট শার্দূলচর্ম সংগ্রহ করিয়া গুরুকে ব্যবহার করিতে দিল। ছয় আনা দামের একখানি ক্ষুদ্র গীতা-হস্তে নবীন সন্ন্যাসী অতুলচন্দ্র সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং পরমনিবিষ্টচিত্তে জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রকৃতি, পুরুষ, মায়া, সত্ত্ব রজঃ তমঃ, কাম্য, নিষ্কাম, বন্ধন, মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় নিমগ্ন হইয়া গেল। শ্রীধর স্বামী, শ্রীমৎশঙ্করাচার্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ ধর-ধর করিয়াও তখন তাহার নাগাল পাইলেন না।

জীবের মুক্তির পথ নিকটস্থ হইলে অহেতুক বৈরাগ্য এই রূপেই উপস্থিত হয়। ইহা জন্মান্তরীণ সুকৃতির ফল।

॥ ২ ॥

পুরা একমাস এই বৈরাগ্যের স্রোতে তরতর বেগে ভাসিয়া গিয়া সহসা এক বিষম চোরাবালিতে ঠেকিয়া অতুলচন্দ্রের গীতা-রূপ তরণী স্থির হইয়া দাঁড়াইল। যে তরণীর আশ্রয়ে তাহার জীবাত্মা সংসার-সাগরের আধিপূর্বব্যাধিরূপ ঝঞ্ঝা-ব্যাত্যাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া "উদাসীনো গতব্যথঃ" হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছিল, সেই তরণীর এহেন বিপত্তিতে অতুলচন্দ্র

নষ্টপ্রজ্ঞ হইয়া পড়িল। নৌকা প্রথমে গতিহীন, পরে চারিদিকের বিষম ঠেলাঠেলিতে কাতভাবে একটু টলিয়া শেষে দরিয়ায় ভুস্ করিয়া তলাইয়া গেল। এই চোরাবালিও একটি আত্মাভিমানী বস্তু! ইনি রমেশের তরুণী বিধবা সহোদরা ইন্দুমতী।

সত্যেব অনুরোধে ইহাও স্বীকার কবিতে হইবে যে, কিছুদিন হইতেই অতুলের অমিশ্র সত্ত্বগুণাশ্রিত জীবাত্মায় কিঞ্চিৎ তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া হইয়াছিল। ভগবানই বলিয়াছেন "রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত। রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা।" তমোগুণ যথা "আলস্যনিদ্রাভিঃ।" তবে পরজন্মের জন্যই তিনি পুরা এই একমাস নৌকাখানা অতিশয় অধ্যবসায়ের সহিত চালাইয়াছিলেন; কেন না, এ সব কিছুই নষ্ট হইবার নয়। ভগবান বলিয়াছেন—

"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।"

"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।"

সন্তরণবিদ্যা যেমন বহুদিনের অনভ্যাসেও লোপ পায় না, যে কেহ সে বিদ্যা যতটুকু আয়ত্ত করিয়া রাখে, জলে পড়িবামাত্র তাহার হস্ত-পদে তখন সেটুকুর আবির্ভাব হয়, সেইরূপ এ ক্ষেত্রেও অতুল যে জন্মজন্মান্তরেও তাহার এই একমাসের সঞ্চিত সম্পত্তির দায়াধিকার প্রাপ্ত হইবে, সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ ছিল।

ইন্দুমতী বালবিধবা, কিন্তু শিক্ষিতা, এবং বোধহয় সমধিক শিক্ষার জন্য উৎসুক। কেন না অতুল তাহাকে প্রায়ই বারান্দায় রয়েলরিডার, মেঘনাদবধ কাব্য, ঋজুপাঠ প্রভৃতি হস্তে আসীনা দেখিতে পাইত। রমেশের মাতা নাই, পিতা অল্পদিন গত হইয়াছেন। তিনি কিশোরী কন্যাকে অন্দরে বাহিরে সমান অধিকার দিয়াছিলেন। সেই অভ্যাসবশত ইন্দুমতী এখনও মাথায় কাপড় দিতে বা কাহাকেও দেখিয়া সঙ্কুচিতা হইতে শিখে নাই। সংসারে অভিভাবিকার মধ্যে এক বৃদ্ধা মাতুলানী। পিতা বালিকা কন্যাকে বিধবা-বেশ পরান নাই, সেই জন্য এখনও ইন্দুমতীর বেশ কুমারীর ন্যায়। পিতা মনে-মনে একটু স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতীও ছিলেন। অনেক সময় রমেশের অনুপস্থিতিতে তাহার কক্ষে কোনও শিক্ষানবীশের সসঙ্কোচ অঙ্গুলিস্পর্শে দুই চারিটা সোজা গৎ এবং চলিত গানের সুর ধীরে-ধীরে বাজিতে থাকে, তাহাও অতুলের কর্ণ এড়ায় নাই।

তমঃকে অভিভূত করিয়া ক্কচিৎ রজঃ ও সত্ত্ব উত্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু এবারে যে কি আসিল, তাহা স্থির করিতে অতুলচন্দ্রের অনেকক্ষণ লাগিল। বহু চিন্তার পর স্থির হইল যে, ইহা রজোমিশ্রিত সত্ত্ব। কেন না, কর্মে প্রবৃত্তি আসিতেছে, অথচ সে কর্মটি নিষ্কাম। এই যে বালিকাটি, ইহাকে দেখিলেই বুঝা যায়, এ শিক্ষা-প্রয়াসিনী। ভগবান বলিয়াছেন, —"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর"। তাঁহার কোনও কর্তব্য নাই, তথাপি তিনি সর্বদাই কর্মে লিপ্ত রহিয়াছেন। বিশেষত 'সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথ কুর্বন্তি ভারত। কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষু লোকসংগ্রহম্।" অতএব এই শিক্ষাভিলাষিণী বালিকাটিব সমধিক শিক্ষার ব্যবস্থা নিষ্কাম হইয়া করিতেই হইবে।

রমেশের প্রকৃতি তমঃপ্রধান। 'ঈশ্বরোঽহম্ অহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী"—এ ভাবটি রমেশে অত্যন্ত প্রস্ফুট। কেবল সে নিজের সুখেই মত্ত, ভগিনীর কোনও সংবাদই রাখে না। অতুল একদিন রমেশকে এ জন্য যথোচিত তিরস্কার করিল। ওটা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হাসিয়া বলিল, " তোমার গীতা জ্ঞান শেষে

যে রিফর্‌মেশনে দাঁড়াল; এতে আশা হচ্ছে।" অতুল বন্ধুর অজ্ঞানসম্ভূত প্রজ্ঞা নষ্ট করিবার জন্য কর্মের গুরুত্ব সম্বন্ধে ঝাড়া দুই ঘণ্টা বক্তৃতা দিল, তথাপি রমেশের কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। ভগবান এই জন্যই অজ্ঞানের—মূঢ়ের নিকট পরাবুদ্ধির রহস্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রান্ত অতুল হাঁফ ছাড়িয়া দিয়া খানিকটা বরফজল চাহিয়া পান করিল।

কিন্তু পরদিন ইন্দুমতীর শিক্ষার বন্দোবস্ত হইল। ইংরাজি ও বাঙালা বহু পুস্তক আসিল। একটি কক্ষ তাহার পাঠাগার রূপে নির্দিষ্ট হইল। শ্রীমতী ইন্দুমতী প্রফুল্লমুখে শিক্ষকের নিকট নিয়মিতভাবে পাঠ লইতে লাগিল। অতুলচন্দ্র সে বিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টরের পদ গ্রহণ করিল। দ্বাদশ বৎসরে বিধবা হইয়া গত দুই বৎসর ইন্দুমতী পিতার নিকট কেবল পড়াশুনাতেই কাটাইয়াছে। জগতে সে আর কিছুই জানে না, তাহার অন্য কামনাও কিছু ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর এই একবৎসর সে জীবনের কোনও আশ্রয় পাইতেছিল না। খেয়ালী ভ্রাতাটিরও নিকটস্থ হইতে পাইত না। এখন এই শিক্ষাব্যপদেশে ভ্রাতাও এক-এক দিন, "দেখি রে ইন্দু, কি শিখ্‌লি?"—বলিয়া তাহাকে ডাকে, এবং অতুলকে বাহবা দেয়। ইন্দু জানিল, অতুলই ইহার মূল। নিষ্কাম কর্ম এবং কর্মযোগ কাহাকে বলে, তাহা সে বোধহয় জন্মেও শোনে নাই। তাই একদিন আমাদের নিষ্কাম কর্মবীর অতুলচন্দ্রকে সে কথাপ্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। অতুলের তাহা লাগিল ভালো। সতত আত্মসন্ধিৎসু অতুলচন্দ্র ভাবিল, তবে কি এ অমিশ্র রজোগুণ?

॥ ৩ ॥

যত দিন যাইতে লাগিল, তত্ত্বজ্ঞানী অতুলচন্দ্রের তত্ত্বান্বেষী মনে ততই নানা ভাবের বিকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমশ বোধ হইল, সে গুণাতীত পুরুষ। কেন না, কোনও গুণের বিচারই এখন তাহার সহজে মনে আসে না। কয়েক মাস পরে মনে হইল, তাহার জীবন্মুক্ত আত্মার কোনও বন্ধন নাই। সে কর্ম করিয়াও নির্লিপ্ত, মুমুক্ষ, আত্মবশী। সে পরাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব এটা কি, সেটা কি, তাহার আব বিচারের প্রয়োজন নাই। বৎসর যখন পূর্ণ হইয়া গেল,তখন আর এ সব চিন্তা তাহার মনেও উদিত হইত না। বোধ হয়, ইহাই ব্রহ্মস্বরূপত্ব। কিন্তু হায়! সে সত্তা যে ভোগ করিবে, সে এ বিষয়ে তখন একেবারেই উদাসীন। সে-ই এখন ইন্দুমতীর শিক্ষক।

বাটী হইতে জেঠাইমা পত্রের উপর পত্র লিখিয়াও কোনও উত্তর পাইলেন না। তিনি বহু সাধ্য-সাধনা, অনুনয়-বিনয়, শেষে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিবার পর অতুলের নিকট হইতে একখানি পত্রের উত্তর পাইয়াছিলেন। অতুল লিখিয়াছিল,—"আমার জীবনের যত দূর ক্ষতি করিতে হয়, তাহা করিয়াছেন; এখন যদি আমাকে বিবাগীর বেশে সংসার ত্যাগ করাইতে ইচ্ছা না করেন তো এরূপে আমায় ত্যক্ত করিবেন না। আমি আর দেশে যাইব না, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু এরূপ টানাটানি কবিলে শেষে সন্ন্যাস-পন্থা গ্রহণ করিব।" কাজেই জেঠাইমা আর তাহাকে বিরক্ত করেন নাই।

সন্ন্যাসীর লক্ষণ কি, তাহা মিলাইবার জন্য অতুল গীতাখানার সন্ধান করিয়া সংবাদ পাইল, মলিন ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সে এ কোণে ও কোণে পড়িয়া থাকিয়া ঘরময় কেবল ছেঁড়া কাগজের টুকরা ছড়াইতেছিল। ঝড়ুয়া খান্‌মাসা সেখানাকে শেষে বাবুদের চায়ের উনানের ইন্ধন-স্বরূপে ব্যবহার করিয়া তাহার গীতা-জন্ম সার্থক করিয়া দিয়াছে।

অতুল গুম্ হইয়া খানিক ভাবিল, শেষে তাহার মনে পড়িল, "ব্রহ্মাগ্নে,", তাহাতে গীতার পাতাগুলি "ব্রহ্মহবিঃ", এবং হোতাও ব্রহ্ম, অতএব ঝড়ুয়া এই ব্রহ্মকর্মসাধন হেতু পরিণামে ব্রহ্মত্বই পাইবে।

অতুলচন্দ্র তো গীতা ছাড়িয়াছে, কিন্তু গীতা তাহাকে ছাড়ে কই! দগ্ধীভূত হইবার পরও তাহার অচ্ছেদ্য অদাহ্য অশরীরী আত্মা অতুলচন্দ্রের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অতুলচন্দ্র দেখিল,গীতার সেই অনাসক্তির ভাব সর্বত্রই যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। এ দিকে রমেশেব কাব্যে ও কবিতায় অনাসক্তি ও গান বাজনায় বিরক্তি জন্মিয়াছিল; "দূর হোক্ গে ছাই—আর ভালোলাগে না" ভাষায় প্রকাশ না কবিলেও, এই ভাবগুলি সর্বদাই যেন রমেশেব মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু অতুল ইন্দুমতীর পাঠে অমনোযোগ দেখিয়াই সর্বাপেক্ষা বিস্মিত, বুঝি একটু ব্যথিতও হইল। সেদিন প্রভাতে চা-পানের পর রমেশ একখানা খবরের কাগজ লইয়া বারান্দায় চলিযা গেল। অতুল ইন্দুমতীর পাঠ্য পুস্তকগুলি সম্মুখে রাখিয়া "মানসী" কাব্যখানা হস্তে লইয়া ইন্দুমতীর প্রতীক্ষা করিতেছিল, এবং মধ্যে-মধ্যে এক-একবার কাব্যখানায় মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু মন বসিল না। অনেকক্ষণ পরে ইন্দুমতী আসিল। অতুল চাহিয়া দেখিল, তাহার হস্তে গুটিকতক সিক্ত পুষ্প, ললাটে চন্দনচিহ্ন, চুলগুলা একটু বিশৃঙ্খলভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, পরিধানে একখানা সরুপাড় গরদ। ইন্দুমতী ফুল কাটি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "দাদা কই? মামীমা আশীর্বাদী দিয়েছেন।" অতুল বলিল, "তোমার স্নান হয়ে গেছে দেখছি যে? আজ পড়লে না?" "না; মামীমার আজ অনেক কাজ ছিল, সে জন্য তাঁর কাছে ছিলাম। দাদা! মামীমা তোমায় আশীর্বাদী দিয়েছেন।" রমেশ গৃহে প্রবেশ করিয়া কাগজখানা একদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উদাসীনভাবে একটা ফুল তুলিয়া লইল। ইন্দুমতী অতুলকে বলিল "আপনিও নেন।" ফুলটি লইতে গিয়াই, জেঠইমার কথা অতুলের মনে পড়িল। অতুল বলিল, "তুমিও পুজো করতে শিখেছ নাকি?" ইন্দুমতী একটু সলজ্জভাবে হাসিল। "আজ আর পড়বে না?" "না, ওবেলায় পড়া নেবেন।" অতুল গম্ভীরমুখে বলিল, "তুমি আজকাল একটু অমনোযোগী হয়েছ।" ইন্দুমতী হাসিল। অতুল শিক্ষকের গুরুত্বসূচক স্বরে বলিল, "এ রকমে তো চলবে না।" ইন্দুমতী মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "ভালোলাগে না।"রমেশ বলিল, "ঠিক। ত্যক্ত ধরে যাচ্ছে। না, একটু চেঞ্জ্ না আনলে আর চলে না।" অতুল সে কথা কানে না করিয়া বলিল, "অভ্যাসটাই একেবারে না ছেড়ে, সে সময়ে পড়ার বই ছাড়া অন্য কিছু পড়তে হয়। কাব্য বা গদ্য-সাহিত্য যা ভালোলাগে।" "তাই তো পড়ি।" "কই তোমার কাব্য-টাব্য, বই-টই সবই তো এই ঘরে ছড়াছড়ি দেখছি।" "আমি একখানা নূতন বই আনিয়েছি, দ্যাখেননি বুঝি?"" "কি বই?" "নৈবেদ্য।" রমেশ বলিল, "চলো অতুল, দুদিন একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।" "কোথায়?" "বাঙালায়; যেখানে ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট-ছোট গ্রামগুলি। পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ, ছায়া অসরল দীঘি কালো জল নিশীথ শীতল স্নেহ।" অতুলের অন্তরে কে যেন সজোরে বারকয়েক আঘাত করিল। সে বলিল, "না।" "ও, তুমি যে বঙ্গ হইতে পলাতক! তবে কলিঙ্গে চলো। ওয়াল্‌টেয়ারে যাবে?" "তা গেলে হয়। কিন্তু বেশি দেরি করা হবে না।" "কেন? তোমার ও আমার গৃহ তো শাস্ত্রোক্ত গৃহ নয়। ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ'—" অতুল আবার একটু ধাক্কা খাইল। বলিল, 'ইন্দুমতীর

পড়ার ক্ষতি হবে।" ইন্দুমতী বাধা দিয়া বলিল, "কিছু ক্ষতি হবে না। দাদার মন ভালো হবে, ওয়াল্টেয়ার খুব ভালো জায়গা শুনি, শরীরটাও সারবে, আপনারা যান। আমি নিজে নিজেই পড়ব। " রমেশ বলিল, "অর্থাৎ এই ফাঁকে তুইও একট হাওয়া খেয়ে নিবি?" ইন্দুমতী হাসিল।

সত্যই রমেশ তল্পি-তাল্পা বাঁধিয়া ফেলিল। অগত্যা অতুলও প্রস্তুত হইল। যদিও সঙ্গে চামড়া-বাঁধা বিছানা, খাবাবের বাক্স, দড়াদড়ি-বাঁধা ট্রাঙ্ক, টিকিটমাবা দুখানা বাইক, ঝড়ুয়া খানসামা, তথাপি অতুলের মনে তাহার বৎসরাধিক পূর্ব্বে প্রব্রজ্যার কথা স্মরণ হইল! আর মনে পড়িতেছিল, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে নির্জনে বসিয়া নিজমনে মৃদুসুরে কি বৈরাগ্যমাখা মুখে ইন্দুমতী গাহিতেছিল, "ঘাটে বসে আছি আনমনা, যেতেছে বহিয়া সুসময়। এ বাতাসে তরী ভাসাব না, তোমা পানে যদি নাহি বয়।"

॥ ৪ ॥

চিল্কা হ্রদ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত মহাসাগব এবং তথা হইতে বৈতরণী নদী, শতদ্রু, বিপাশা, মহানদী, কাটজুড়ী, ভদ্রক প্রভৃতি নদ-নদীর ঘাটে-ঘাটে ঘুরিয়া তিন মাস পরে অতুল ও বমেশের তরী গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থালে ফিরিয়া আসিল।

ইন্দুমতী হাসিমুখে আসিয়া তাহাদেব অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু এত বিলম্ব কবার জন্য অনুযোগ করিতে ছাড়িল না। অতুল বলিল "রমেশ কি তবু ফিরতে চায়?" রমেশ হাসিয়া বলিল, "না রে ইন্দু। তোর পড়ার ক্ষতি হচ্চে বলেই এতই শিগ্‌গির ফিরলাম। অতুল তো ভেবেই অস্থির যে, যা শিখেছিলি, সব বুঝি এ তিন মাসে গুলে খেয়ে ফেললি।" ইন্দু মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা ঠিক ভেবেছেন।"

বিকালে রমেশ তাগাদা লাগাইল, "চলো, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করে আসা যাক্!" "চলো" বলিয়া অতুল টেবিলের উপরিস্থ কযেকখানা ক্ষুদ্রাকার নূতন পুস্তক হইতে চোখ তুলিয়া বলিল, "এ বই কার?" রমেশ নত হইয়া বলিল, "শান্তিনিকেতন। ইন্দুর হাতে! ইন্দুও তোমার মতো যোগ-অভ্যাসে মন দিলে নাকি? ইন্দু! ইন্দু!" ইন্দু আসিল। "এ বই কার?" "আমার।" "পড়িস নাকি?" ইন্দু চুপ করিয়া রহিল। "বইগুলো কেমন? ভালোলাগে?" "হাঁ।" রমেশ দু-এক পাতা উল্টাইয়া উদাসীনভাবে রাখিয়া দিয়া বলিল, "ভালো বটে, পড়িস। চলো হে অতুল।" অতুল প্রশ্ন করিল, "সব বুঝতে পার?" ইন্দু নতমস্তকে বলিল, "না।" "তবে?" "বুঝতে চেষ্টা করি। যেটুকু বুঝি, তাতেই আনন্দ পাই।" অতুল আর প্রশ্ন করিল না।

অতুল দেখিল, ইন্দুমতী যেন ক্রমশ পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। আর সে বালিকার মতো চালচলন বেশ-ভূষা আচার-ব্যবহার কিছুই নাই। চুল আর বাঁধেই না, রুক্ষ বিশৃঙ্খলভাবে জড়ানো থাকে মাত্র। বসন-ভূষণও তদ্রূপ। হার্মোনিয়মে ছাতা ধরিয়া গিয়াছে। পড়ার বই অপেক্ষা সাংসারিক কাজকর্মে, পূজা ইত্যাদিতে তাহার বেশি সময় যায়। অতুল বিস্মিত হইতেছিল বটে, কিন্তু বিরক্ত হয় না। এই পূজারিণী তরুণী সুন্দরীকে দেখিয়া তাহার নয়ন যেন পরিতৃপ্ত হইল। বৈরাগ্য বা অনাসক্তি বস্তুটি কি সর্বত্রই এত মধুব! অতুল ভাবিতে লাগিল।

বন্ধুর দল সেদিন নৌকোযোগে ত্রিবেণীসঙ্গমে বায়ুসেবনে বাহির হইল। দাঁড় টানিতে-টানিতে তরুণ হৃদয়গুলি নানা কাব্যালোচনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। জলে-

স্থলে তখন অপূর্ব শোভা। প্রকৃতির অনবদ্য মাধুর্য সৌন্দর্যদর্শনে একজন চেঁচাইয়া উঠিল, "দেখো-দেখো কি সুন্দর!" "ওই হোথা জলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা।" আর-একজন বলিল, "হোথায় কি আছে আলয় তোমার, উর্মিমুখর সাগরের পার, "মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে?" তিন-চারিজন একসঙ্গে চিৎকার করিয়া উঠিল, "কাহার, কাহার?" রমেশ বলিল, "নৌকা ফেরাও; আর না।" অতুল নীরবে হালখানা ধরিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল। হালটা সজোরে ঘুরাইতে যাইবামাত্র জীর্ণ দড়ি সহসা ছিঁড়িয়া গেল। ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া অতুল একেবারে জলে পড়িয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তিন-চারিজন বন্ধু ও রমেশ ঝাঁপ দিয়া অতুলকে বহু চেষ্টায় নৌকায় তুলিল। পতনের সময় মস্তকে গুরু আঘাত লাগিয়া অতুল নিশ্চেষ্ট বলহীন হইয়া পড়িয়াছিল। নৌকায় তোলার সঙ্গে-সঙ্গে অতুলের চৈতন্য বিলুপ্ত হইল।

অতুলকে পাঁচ-সাত দিন শয্যাগত থাকিতে হইল। প্রবল জ্বরে ও মস্তকের বেদনায় ৩/৪ দিন সে অজ্ঞান ভাবেই ছিল; পরে সুস্থ হইতে লাগিল। ডাক্তার বলিয়াছিলেন, "প্রাণের আশঙ্কা নাই।"

ইন্দুমতী ও রমেশের অক্লান্ত সেবায় অতুল অষ্টম দিবসে উঠিয়া বারান্দায় চেয়ারে গিয়া বসিল। আট দিন পরে আজ রমেশও একটু বেড়াইতে বাহির হইল। ইন্দুও কর্মান্তরে গেল। অতুল চেয়ারের গায়ে দুর্বল মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। ললাটে তখনও যেন কাহার কোমল হস্তের মধুর স্পর্শ লাগিয়া রহিয়াছে, মুদ্রিত চক্ষুর সম্মুখেও কাহার উদ্বিগ্ন কোমল দৃষ্টি নাসাপথে কাহার অঙ্গসৌরভ। তখনও অতুল আত্মসন্ধানে বিরত নয়। কিন্তু সে দেখিল, শরীরের এই দুর্বল অবস্থায় তাহার হৃদয়ও অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে; এ সুখচিন্তাকে এখন তাহার মস্তিষ্ক হইতে তাড়াইবার সাধ্য নাই। একটু সবল হইতে হইবে; তবে।

ঝড়ুয়া একখানা চিঠি দিয়া গেল। জেঠাইমার হস্তাক্ষর। অনেক দিন পরে। ঈষৎ বিচলিতভাবে সে পত্রখানা ধীরে-ধীরে খুলিয়া ফেলিল। জেঠাইমা লিখিয়াছিলেন, "কল্যাণবরেষু!

অতুল! কর্তব্যবোধে তোমায় আজ একবার আসিতে বলিতেছি। তোমার বিষয়-আশয় সবই আমার হাতে। আমি আগামী ৭ই তারিখে কাশী যাত্রা করিতেছি। তোমার সম্পত্তি একবার আসিয়া বুঝিয়া লইয়া, তারপর তুমি যাহা ইচ্ছা করিও। বাড়ি আসিতে তোমার যে বাধা, তাহাও আর নাই। যে বোঝা তোমার মাথায় আমি দিয়াছিলাম, আমিই তাহা নামাইয়া দিয়া তোমার সংসার হইতে বিদায় লইতেছি। আজ দেড় বৎসর তাহাকে আনিয়া শুধু চোখের জলেই ভাসাইয়া রাখিয়াছিলাম, কাল তাহাকে আমি নদীর ধারে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তোমার সঙ্গে আমার আর কোনও বন্ধনই নাই, শুধু এই বিষয়ের বাধাই আমায় এ দুদিন বিলম্ব করাইল। যদি ৭ই তারিখের মধ্যে নাও আস, তথাপি আমার কাশী যাওয়া নিশ্চিত। ধর্মে খালাস হইবার জন্য তোমায় একবার জানাইলাম ইতি—

শ্রীভবতারিণী দেব্যা।"

"আপনার ওষুধ খাওয়ার সময় বয়ে গেছে যে। ওষুধ খান!" অতুল চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, ইন্দুমতী! ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাড়ি যেতে হবে।"

"বাড়ি—কোন বাড়ি? আপনাব দেশে?" "হাঁ!" ইন্দুমতী কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল; কেন না, কথাটা অশ্রুতপূর্ব। তাহার বিস্মিত দৃষ্টি দেখিয়া অতুলও লজ্জিতভাবে চক্ষু নত করিয়া রহিল।

"এ রকম অবস্থায় বাড়ি যাবেন কেন? খুব দরকার নাকি?" "হাঁ!"

"তা হলেও প্রাণের চেয়ে বড় কিছুই নয়। অন্তত আর দিন পাচ-ছয় না গেলে হতেই পারে না।" "দিন পাঁচ-ছয় দূরের কথা, আজই—এই রাত্রের ট্রেনেই আমাকে যেতে হবে পরশু ৭ই।" "কোনও বিপদের আশঙ্কা আছে কি?" "হাঁ!" ইন্দুমতী চিন্তিতভাবে বলিল, "তাই তো! দাদাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করুন, আপনার এই অবস্থা, কি করে' এত রাস্তা একা ট্রেনে যাবেন?" "যেতেই হবে।" বলিয়া অতুল প্রায় টলিতে-টলিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। ইন্দুমতী বলিল, "কি খুঁজছেন!" "আমার ট্রাঙ্ক—কাপড়-চোপড়গুলো।" "কি আশ্চর্য! যদি নিতান্ত যেতেই হয়, দাদাও হয়তো আপনার সঙ্গে যাবেন। তিনি আসুন! এত ব্যস্ত হচ্চেন কেন?" "সময় নেই বেশি; ৮টা বাজে; আমার বইগুলো—" —"এই সঙ্গে সবই নিয়ে যাবেন? আর আসবেন না নাকি কখনও যে, সব খোঁজ করছেন?" "না-না, আর আসব না।" ইন্দুমতী সম্মুখে আসিয়া ভর্ৎসনাসূচকস্বরে বলিল, "ফেলুন ও সব। চেয়ারখানায় বসুন একটু, বসুন—" অতুল চেয়ারের দিকে না গিয়া টলিতে টলিতে গিয়া, শয্যায় পড়িল। পশ্চাৎ হইতে ইন্দুমতী তাহার বাহু না ধরিলে হয়তো সে পড়িয়াই যাইত।

একটু পরে অতুল বলিল, "একখানা গাড়ি আনতে বলো।" "পাগল হলেন কি? এইটুকু চলতে পারছেন না, ট্রেনে যাবেন?" নিজ মনে ইন্দুমতী বলিল, "আঃ, দাদা করছেন কি? এখনও এলেন না।" অতুল চাহিয়া দেখিল, কি আশঙ্কাব্যাকুলমুখে ইন্দুমতী তাহার পানে চাহিয়া বাতাস করিতেছে। তাহাকে চাহিতে দেখিয়া পাখা রাখিয়া টেবিলের উপর হইতে বলকারক ঔষধ ঢালিয়া আনিল, "এটুকু খান দেখি।" —অতুল নীরবে তাহার আদেশ পালন করিল।

সেই করুণ মুখের পানে চাহিয়া মুহূর্তে অতুলের দিক্‌ভ্রম হইল; সে স্থান-কাল-পাত্র সমস্তই বিস্মৃত হইল; তাহার মনে হইল, সে ও ইন্দুমতী—উভয়ে "অনাদি কালের হৃদয়-উৎস" হইতে যেন একজোড়া ফুলের মতো প্রণয়ের কূলপ্লাবী স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছে। এ সংসারে আর কেহ, আর কিছু নাই। মুক্ত আজ অতুল মুক্ত। আজ সে অনায়াসে ইন্দুমতীকে জানাইতে পারে, তাহার হৃদয়ে বহু দিন হইতে বিশ্বহিতবাসনার যে অরবিন্দ ফুটিযাছে, তাহার কোরকে "পাদপদ্ম রয়েছে তোমার অতি লঘুভার।" অতুল কি বলিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না; কিন্তু সেই মুহূর্তে নবীনার আননে সেই কারুণ্যজ্যোৎস্নালোক নিবিড় নীল নীরদে ঢাকিয়া গেল। অতুল দেখিল, কি করালকান্তি মেঘ, চকিতে তীব্র বিদ্যুৎস্ফুরণ, সঙ্গে-সঙ্গে বজ্রবাণী—"ছি-ছি, অতুল দাদা! দাদার মতো আপনাকে জানি, আপনার মুখে এ কি কথা! মাথা খারাপ হয়েছে আপনার।"

সেই বজ্রনির্ঘোষের সঙ্গে-সঙ্গে অতুলের নষ্ট সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল সে আজ একি করিল। এতকাল সাধনার পর শেষে তাহার এই পরিণাম? অতুল তাড়িতপৃষ্টের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তখনও তাহার মস্তিষ্ক ধূম্রজালে পরিপূর্ণ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা দিয়া অগ্নির

জ্বলন্ত শিখা তখনও বহির্গত হইতেছে। সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। সবেগে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সে-ষ্টেশনের দিকে ছুটিল।

প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া নৈশ অন্ধকারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতে-করিতে সগর্জনে ট্রেন ছুটিয়াছে। অতুল একটা খোলা জানালায় ক্লান্ত বাহু ও মস্তক রাখিল। চলন্ত ট্রেনের গতি ও বায়ুর মত্ত হুঙ্কারের শব্দের সঙ্গে সুর বাঁধিয়া তাহার মস্তিষ্কে ধ্বনিত হইতেছিল—'সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ, স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।" অতুলের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

॥ ৬ ॥

অতুল ডাকিল, "মা!" তখনও তাহার স্মৃতি স্বস্থানে ফেরে নাই, নহিলে সে হয়তো "জেঠাইমা" বলিয়া শেষ নিঃশ্বাসটা ত্যাগ করিত।

কোনও উত্তর আসিল না, কেবল ক্ষুদ্র একখানি হাত তাহার ললাটের উপর অতি মৃদুভাবে চলিতে লাগিল। অতুল অনুভব করিল, হাতখানি অতি কোমল। এ হাত তো জেঠাইমার নয়। অতুল বলিল, "আমি কোথায়?" তথাপি কেহই উত্তর দিল না। অতুল বিস্মিতভাবে চাহিয়া দেখিল। এই খাট, এই মশারি, ওই জানালা, তাহার পার্শ্বে ওই টেবিল-চেয়ার, ওই বইয়ের সেল্‌ফ, সবই যে তাহার সুপরিচিত। ওই যে জানালা দিয়া চিরপরিচিত নিম গাছের মাথা দেখা যাইতেছে। এ যে তাহার ঘর। অতুল ডাকিল, 'জেঠাইমা!"

এবার উত্তর আসিল, অতি নিকট হইতে ততোধিক মৃদুকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "জ্যাঠাইমা খাবার করে আনতে গেছেন।" অতুল ধীবে-ধীরে মুখ ফিরাইল; কেন না, কণ্ঠটি অপরিচিত। ফিরিয়া দেখিল, মুখখানিও তাই। অতুল চাহিতেই মুখখানি কুণ্ঠার সহিত নত হইয়া পড়িল। চাহিয়া-চাহিয়া অতুল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" অতুলের বিস্মিত দৃষ্টিপাতের প্রতিপলকে সে অত্যন্ত সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িতেছিল, এবারে মাথার কাপড়টা সে দীর্ঘতর করিয়া টানিয়া দিল। অতুলের বিস্ময় ক্রমে সীমা অতিক্রম করিতে লাগিল। "তোমার নাম কি? জ্যাঠাইমার কে হও তুমি?" বালিকা রক্তিমমুখে একবার তাহার পানে চাহিয়া সহসা কক্ষান্তরে পলাইয়া গেল; তাহার মলের রুনুঝুনু শব্দটুকু অতুলের কানে বড় মধুর লাগিল; কিন্তু ততোধিক মধুর সেই সলাজ দৃষ্টিটুকু।

জেঠাইমার গম্ভীর মুখের কঠিন দৃষ্টি দেখিয়া অতুল কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করিতে সাহস করিল না। পথ্যপানান্তে একবারমাত্র মৃদুস্বরে বলিল, "আমি কবে বাড়ি এলাম?" ভাষাটা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইবার পূর্বেই সেই বাল্যকাল হইতে শ্রুত অলঙ্ঘ্য আদেশ কানে আসিল, "আর খানিকটা ঘুমোও, তার পরে সে কথা।" ক্লান্ত মস্তিষ্ক এ আদেশ পালন করিতে বড় বেশি বিলম্ব করিল না।

নিদ্রাভঙ্গে আবার যখন সে চক্ষু মেলিল, তখন তাহার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ। অস্তোন্মুখ সূর্যের রক্ত-আভা মুক্ত গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট হইয়া ঘরখানাকে যেন সোনালি আলোকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। নিকটে বসিয়া যে মাথায় বাতাস দিতেছি, অস্তগামী সূর্যের বিচিত্র আলোকে তাহাকে সন্ধ্যারানির মতো দেখাইতেছিল। তাহার মৃদু নিঃশ্বাসে যেন স্ফুটনোন্মুখ পুষ্পকোরকের সুবাস, নয়নে সন্ধ্যা-তারকার স্নেহকোমল দীপ্তি। মুগ্ধ অতুল আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?" বালিকা এবার পলাইল না। পাখা রাখিয়া অবগুণ্ঠনটা একটু টানিয়া

দিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। চাহিয়া-চাহিয়া সানুনয়স্বরে অতুল বলিল, "আমার কিছু মনে পড়ছে না; অসুখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।" নত মুখ তুলিয়া বালিকা অতুলের পানে চাহিল—বেদনাব্যাকুল দৃষ্টি সহসা যেন তরল আকারে গলিয়া পড়িল। বিস্মিত অতুল সহসা তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কে তুমি? তুমি কি—তুমি কি—কমলা?"

বালিকা বামহস্তে চক্ষু আবৃত করিল, ডান হাতখানি অতুলের মুষ্টির ভিতরে। অতুল অনুভব করিল, সেখানি বড় কাঁপিতেছে; চাহিয়া দেখিল, আবৃত হস্ত বহিয়া সেই তরল বেদনাধারা কম্পিত ক্ষীণ ওষ্ঠের উপর আসিয়া পড়িতেছে। আবার অতুল নষ্টপ্রজ্ঞ হইয়া পড়িল। কয়বার ব্যাকুলকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "কমলা—কমলা—কমলা!"

॥ ৭ ॥

জেঠাইমার মানবচরিত্র-জ্ঞান ও অপূর্ব কৌশলময়ী প্রতিভার সহিত তাহার শিশুকাল হইতেই পরিচয় আছে, তাই অতুল সে বিষয়ে আর কোনও উচ্চবাচ্য করিল না। সে কিরূপে বাড়ি আসিয়াছিল, এ সম্বন্ধেও জেঠাইমার কাছে প্রশ্ন করিবাব ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু স্বল্পভাষিণী জেঠাইমার গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া অপরাধী অতুল প্রশ্নটা নিজেই পরিপাক করিয়া ফেলিল। তত্ত্বান্বেষী হৃদয় এবার অল্পেই তৃপ্ত হইল। কমলার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া সে এইটুকু জানিয়াছিল, একটি ভদ্রলোক তাহাকে পঁহুছিয়া দিযা পরদিবসই চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহা হইতেই সে ব্যাপারটা কতক অনুমান করিয়া লইয়াছিল। অতুল সবল হইয়াই গ্রামের পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার মহাভারতের ভীষ্মপর্বাধ্যায়খানা চাহিয়া আনিয়া শ্রীমদ্ভগবৎগীতার পাতাগুলা খুলিয়া বসিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস,—"যে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধরে।" গীতা সে শীঘ্র ছাড়িবে না।

ষষ্ঠাধ্যায়ে অর্জুনের "বায়োরিব সুদুষ্করং" তুলনাটিতে অত্যন্ত মুগ্ধ হইল। ইতিপূর্বে অর্জুনকে সে অতীব কৃপাপাত্র বলিয়াই বিবেচনা করিত। তাঁহার প্রশ্নগুলি অত্যন্ত মূঢ়ের মতো। কেন না বায়ুরোধের অপেক্ষা মনোনিগ্রহ যে কত সহজ, তাহা অর্জুন বুঝিতেন না। কিন্তু অতুল জলে ডুব দিয়া দু-চার মুহূর্ত না-থাকিতে পারিলেও, মনের দুর্নিগ্রহত্ব সম্বন্ধে কই তাহাকে এত ভাবিতে হয় নাই! তাহার বিশ্বাস ছিল, সে অর্জুনের সমসাময়িক হইলে ভগবানকে কখনই অত বাক্যব্যয় করিতে হইত না! কিন্তু আজ সে ধীরে-ধীরে অর্জুন-বাণীর অন্তরালে লুকাইয়া তাঁহার "কাং গতিং গচ্ছতি" প্রশ্নের সমাধান খুঁজিতে লাগিল।

"শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে"। অতুল ধীরে-ধীরে বইখানি বন্ধ করিয়া রাখিল। এ তাহার পুনর্জন্ম। শ্রী—সে তো মূর্তিমতী, এবং কি বিশুদ্ধ শুচিতা মনে-প্রাণে সে সম্প্রতি অনুভব করিতেছে! গুম হইয়া বসিয়া ভাবিতে-ভাবিতে দেখিল, কমলা সহাস্যমুখে একখানা পত্র লইয়া আসিতেছে। অতুলের প্রজ্ঞা শুষ্কতত্ত্বানুসন্ধানে বিরত হইল। এ দেহে পূর্ব-দেহের বুদ্ধিসংযোগ তাহার মনঃপূত হইল না। গীতাকে মাথায় ঠেকাইয়া সরাইয়া রাখিল।

রমেশ পত্র লিখিয়াছে।—

"ভায়া হে! —ভেব না যে, আমায় একেবারে অবাক করে দেবে। এ উত্তর গো-গৃহে বৃহন্নলা বেশে কালযাপনের সময় সৈরিন্ধ্রীকে যে সঙ্গে আননি, সে ভালোই করেছিলে; তা হলে হয়তো বেচারা আমাকেই কীচকবধ করে যেত। এখন অজ্ঞাতবাসের

শেষে উভয়-হস্তে গান্ডীবজ্যা-নির্ঘোষ করিতে করিতে উত্তর গো-গৃহে কবে দেখা দেবে, বল দেখি? হে ভারতশ্রেষ্ঠ! স-সহধর্মিণী তোমাকে দেখবার জন্য এখন আমরা অতিশয় ব্যাকুল। আমরা অর্থে আমি ও ইন্দু। ইন্দুর বুদ্ধি শোন—সে ইতিমধ্যে একটা অচিন্তনীয় কাণ্ড বাধিয়েছে। এই ২৫শে আমার বিয়ে। কনে দেখা-টেখা ইন্দু কিছুই বাকি রাখেনি! তুমি সস্ত্রীক কবে আসছ? ইন্দুর আর-একটি বিশেষ অনুরোধ,—প্রয়াগ তীর্থস্থানে, জেঠাইমাকে অবশ্যই সঙ্গে আনবে—অন্যথা না হয়। তোমাদের যেন দেরি না হয়; কেন না, ইন্দু একা। ইতি তোমার রমেশ। —পুঃ—তোমার মাথাটা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে তো? ইন্দু সে জন্য চিন্তিত।'' অতুলের পত্রপাঠ শেষ না-হইতেই বাধা দিয়া কমলা বলিল, ''তুমি এখানে আসার সময় যিনি সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি রমেশবাবু? তোমার ব্যারামের সময় তাঁর বোন জ্যাঠাইমাকে কত করে পত্র দিয়েছেন। তার নাম ইন্দুমতী—নাকি? তাব ভাইয়ের বিয়েতে আমাদেরও তো যেতে হবে? ইন্দু নামটি বেশ!'' অতুল কমলাকে নিকটে টানিয়া লইয়া মৃদু-কোমলস্বরে বলিল, ''হাঁ, সে রমেশের বোন। সে আমারও দিদি।''

২৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২১

নীরা

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়



॥ ১ ॥

বহুকাল পূর্বে বৃদ্ধ নন্দকিশোরের পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল। সে শোকও ক্রমশ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। পরে যখন তিন মাসের মধ্যে তাঁহার লক্ষ্মীস্বরূপা পুত্রবধূ সুরমা ও একমাত্র উপযুক্ত পুত্র কৃষ্ণকিশোরও ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন শিশু পৌত্রী নীরাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন হইল।

বৃদ্ধের আর-একটি অবলম্বন ছিল, সেটি একটি সেতার। সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে বহুদিন ধরিয়া সেতারটি নন্দকিশোরের প্রিয় সহচরের স্থান অধিকার করিয়াছিল। মধ্যে-মধ্যে বিনিদ্র রজনীতে যখন অতীতের সমস্ত ঘটনা সজীব হইয়া বৃদ্ধের প্রাণে আর্তনাদ করিত, তখন বৃদ্ধের সে যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণলাভ নিতান্ত দুরূহ হইয়া পড়িত। বৃদ্ধের সব কথা মনে পড়িয়া যাইত;—সেই ছোটখাটো স্বচ্ছল পরিবারটি, লক্ষ্মী সহধর্মিণীর স্নিগ্ধ প্রণয়, শিশুপুত্রের সেই হাসিভরা সরল ছোট টুকটুকে মুখখানি, পুত্রের বিবাহ-রাত্রির সেই আনন্দোৎসব, ফুটফুটে চাঁদের মত আলো-করা নববধূর মুখখানি, হায় এখন কোথায় সে সব! তাহাদেরই একটি ছোট স্মৃতি নীরা,—ফুলের মতো সুন্দর কোমল মেয়েটি! এই নীরা যদি একদিন আবার তাহাদেরই মতো বৃদ্ধকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায়! বৃদ্ধ আর ভাবিতে পারিতেন না। হয় ভগবান! দুঃখের অংশটা বৃদ্ধের অদৃষ্টে কেন এত প্রচুর করিয়া দিলে?

অসহ্য বেদনায় বৃদ্ধের হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িত। বৃদ্ধ তখন তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া সেতারটিকে প্রিয়তমার মতো আপনার বক্ষে টানিয়া লইতেন, এবং তাহার পর ধীরে-ধীরে তাহার তারগুলিতে ঝঙ্কার তুলিতেন! স্তব্ধ বিজন-নিশীথে সমস্ত অতীত-বেদনা যখন বৃদ্ধের জীর্ণ হৃদয় চূর্ণ করিত, তখন এই প্রিয় সেতারটি প্রিয়তম সুহৃদের ন্যায় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিত।

সেতার বাজাইতে বসিয়া বৃদ্ধ ভুলিয়া যাইতেন যে, শয্যায় তাঁহার নাতিনীটি নিদ্রা যাইতেছে। সেতারের ঝঙ্কারে নীরার নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে একেবারে ডাকিয়া উঠিত, "দাদা!"

বালিকার কোমল কণ্ঠস্বরে, সেই সুমিষ্ট নির্ভরপূর্ণ আহ্বানে, দাদার মোহ কাটিয়া যাইত। তিনি তাড়াতাড়ি সেতার রাখিয়া নীরার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া কোমলস্বরে কহিতেন, "কেন ডাক্‌ছ দিদি? ঘুম হচ্ছে না?"

"না দাদা!"

বৃদ্ধ অস্থির হইয়া উঠিতেন; নীরার ঘুম হইতেছে না—তাই তো, কি করা যায়? বৃদ্ধ নীরবে নীরার মুখে-চোখে হাত বুলাইতে-বুলাইতে কহিতেন, "একটু চোখ বুজে থাক, তা হলেই ঘুম হবে এখন।" কিন্তু নীরা আবদার করিয়া বলিত, "না দাদা, আমি আর শোব না।" দাদা তখন তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার ছোট মাথাটি বুকের মধ্যে টানিয়া মৃদু করাঘাত পূর্বক বলিতেন, "ঘুমাও লক্ষ্মী দিদিটি! না হলে অসুখ করবে!"

বালিকা ছোট মাথাটি নাড়িয়া ব্যগ্রভাবে বলিত, "ঘুম যে কিছুতেই আসছে না।"

তখন স্নেহময় দাদার অস্থিরতার সীমা থাকিত না। তাড়াতাড়ি ঘরের জানালা খুলিয়া দিতেন। পরিস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে বহিঃপ্রকৃতির সুমোহন শোভার দিকে চাহিয়া দাদা নীরাকে বলিতেন, "ঘরে কেমন চাঁদের আলো এসেছে। এবার ঘুমাও তো দিদি!" "তুমি একটা গল্প বলো দাদা!" বলিয়া নীরা জানালার ধারে বসিয়া পড়িত। দাদা তখন ঈষৎ হাসিয়া গল্প বলিতে আরম্ভ করিতেন,—"এক ছিল রাজা, তার দুই রাণি। বড় রাণিটি—"। নীরা এমন সময়ে বলিয়া উঠিত, "হ্যাঁ দাদা! ওই যে আকাশে বড় তারাটি, তার পাশে আর-একটি—ওই বুঝি বাবা আর মা—?" বৃদ্ধের হৃদয় তখন কম্পিত হইয়া উঠিত, কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিত। কোনও গতিকে 'হাঁ' বলিয়া ফেলিয়া বৃদ্ধ আবার গল্প আরম্ভ করিয়া দিতেন,—"বড় রাণিটি বড় দুঃখিনী। রাজা তাঁকে দেখতে পারতেন না। ছোট রাণি সুয়োরাণী একদিন রাজাকে বললেন—" নীরা আবার গল্পে বাধা দিয়া বলিত,, "আচ্ছা, বাবা মা আমাদের কাছে আসেন না কেন? —আমারও অমনিই তারা হতে ইচ্ছা করে দাদা!" বৃদ্ধের চক্ষু ছলছল করিত। বৃদ্ধ বলিতেন, "গল্প শোন না দিদি!—তারপর ছোট রাণি, রাজাকে বলে,—" নীরা সাভিমানে বলিয়া উঠিত, "আমি রাজার গল্প শুনিতে চাই না —আমি যা বলছি, তা আগে বল না দাদা।—" "কি বলব নীরা?" নীরা আবদার করিত, "তুমি বাবা-মার গল্প বলো।"

তখন সেই চন্দ্রালোকিত কক্ষে নিস্তব্ধ রাত্রে পিতামহ এই বুদ্ধিমতী পৌত্রীর নিকট আপনার সুখ দুঃখের গল্প করিতেন। সে যেন কতকটা সত্যের মতো, কতকটা স্বপ্নের মতো। কতকটা সম্ভব, আবার কতকটা যেন অত্যন্ত অসম্ভব। গল্প করিতে-করিতে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিত; কিন্তু নীরা তখন হয়তো বেশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার সুন্দর-কোমল মুখখানির উপর চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, মৃদু মলয়স্পর্শে তাহার মুক্ত কেশের গুচ্ছ উড়িয়া-উড়িয়া মুখের উপর পড়িতেছে! বৃদ্ধ অনিমেষনেত্রে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন, আর কত কি ভাবিতেন। এই চন্দ্রালোকে বৃদ্ধের মনে কত কথাই উদিত হইত। এই সরলা বালিকা কি দোষ করিয়াছিল যে, ভগবান! এই বয়সে তাহাকে সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে? দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ কহিতেন, "সবই গিয়াছে, কিন্তু স্মৃতিটুকু কিছুতেই যে যায় না ভগবান!"

॥ ২ ॥

ক্ষুদ্র পল্লীর সকলেই নন্দকিশোরকে শ্রদ্ধা করিতেন, ভালোবাসিতেন। এই সহায়হীন, সম্বলহীন বৃদ্ধের উপকারের জন্য সকলেই ব্যগ্র ছিল। সুবিধা মতো সকলেই বাগানের তরি-তরকারি, ফলমূল প্রভৃতি উপহার দিত। বৃদ্ধকে সংসার সম্বন্ধে বড়-একটা ভাবিতে হইত না। আর-একজন বৃদ্ধকে যথেষ্ট ভালোবাসিতেন। তিনি পল্লীর বিখ্যাত ধনী—গোবিন্দবাবু। গোবিন্দবাবু নন্দকিশোরের সমবয়স্ক, এবং গীতবাদ্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল; কাজেই সেতার-নিপুণ নন্দকিশোরের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব একটু প্রগাঢ় হইয়াছিল। পূর্বে গোবিন্দবাবু পল্লীতে বড়-একটা থাকিতেন না। কলিকাতায় প্রশস্ত বাসাবাটী নির্মাণ করিয়া সেইখানেই বাস করিতেন। এক্ষণে কলিকাতার মায়া কাটাইয়া পল্লীভবনে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রবোধচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল। পৌত্র সুবোধচন্দ্র হেয়ারস্কুলে সেকেন্ড ক্লাসে পড়িতেছিল। বৃদ্ধা সহধর্মিণী ভিন্ন পরিবারের আর সকলেই

কলিকাতায় বাস করেন। গোবিন্দবাবু নন্দকিশোরকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। নন্দকিশোরও প্রিয় নাতিনী নীরাকে যেমন অসন্দিগ্ধচিত্তে সেতার শুনাইয়া আনন্দলাভ করিতেন, গোবিন্দবাবুকে সেতার শুনাইয়া তদপেক্ষা অল্প আনন্দ অনুভব করিতেন না। দুটি বৃদ্ধই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন; যেন ডাক পড়িলে চলিয়া যাইতে কাতর নহেন। তবে একজন পৃথিবীতে আসিয়া লক্ষ্মীব শুভাশীর্বাদধারা নিঃশেষ করিয়া বসিয়াছিলেন, আর-একজন হতভাগ্যের দিকে চপলা লক্ষ্মী কখনও দৃষ্টিপাত কবিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয না। এক জন পৃথিবীতে আসিয়া অমৃতের পাত্র হইতে আকণ্ঠ অমৃত পান করিয়াছেন আর-একজনেব সম্মুখে নিষ্ঠুর অদৃষ্ট চিরকাল হলাহলপূর্ণ পাত্রখানি ধরিযা আসিয়াছে! এই দুইটি মরণপথের যাত্রীর মধ্যে হৃদয়ের বন্ধনটুকু ক্রমশই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল।

॥ ৩ ॥

সেবাব বড়দিনের ছুটিতে প্রবোধচন্দ্র কয়েকজন বন্ধুবান্ধব লইয়া দেশে আসিলেন। ঐশ্বর্যের চাকচিক্যে সমগ্র পল্লী প্রতিভাসিত হইযা উঠিল। দরিদ্র পল্লীবাসীরা ইহাদেব শালের বহর, অলঙ্কারের বিস্তার, ঘড়ি ও চেনের আড়ম্বর প্রভৃতি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহাদের কাজকর্ম একরকম বন্ধ হইয়া গেল। আজ বাবুরা পুকুরে মাছ ধরিবেন, কাল বাগানে চড়ুইভাতি, পরশু নদীতে নৌকায় বাই! তাঁহাদের রসদ বহন করিয়া নৌকার দড়ি খুলিয়া দিয়া, বাখারি ছুলিয়া ছিপ প্রস্তুত করিয়া, নানাবিধ উপায়ে বাবুদের মন যোগাইয়া পল্লীর অধিবাসিগণ পরম তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল। পাঁচ বৎসরের নীরা বাই-খেলা দেখিল, ম্লাননয়নে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া বাবুদিগকে দেখিল! তাহার কিন্তু বাবুদিগকে তত ভালো লাগিল না। এরা তো তাব দাদার মতো নয়—তার সঙ্গে একটা কথাও কয় না, একটু আদরও করে না!

প্রবোধচন্দ্রের এক কবি-বন্ধু বৃদ্ধ নন্দকিশোরকে কহিল, "সেতারটা একবার শুনিয়ে দিন না মহাশয়!" বৃদ্ধ সরলভাবে তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া তাহাদিগের নিকট যথেষ্ট পরিহাসভাজন হইয়া উঠিলেন। কবি-বন্ধুটি হাসিয়া কহিলেন,—"আপনার একেবারে যে ওস্তাদী হাত দেখিতেছি।" কম্পিতহস্তে সেতারটি নামাইয়া রাখিয়া নন্দকিশোর নীরবে বসিয়া রহিলেন! সত্য কথা বলিতে কি,—প্রবোধচন্দ্র ও তাহার বন্ধুবর্গের উচ্ছৃঙ্খল হাস্য-কলরব আমোদ-কৌতুক প্রভৃতি বৃদ্ধের অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইতেছিল। তাঁহাব মনে হইতেছিল, যেন শান্তিপূর্ণ ক্ষুদ্র পল্লীটির মধ্যে সহসা কোথা হইতে একটা তীব্র বিপ্লবস্রোত বহিয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভাবে গৃহের শান্ত কুললক্ষ্মীর মতো পল্লীখানি যেন সহসা বিলাসিনী নায়িকার ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে! হায়! কোথায় আজ সেই চিরপুরাতন সরল-সহজ-আনন্দ-পরিপূর্ণ পল্লীশ্রী!

ইংরাজি নববর্ষে প্রবোধচন্দ্র বাড়িতে একটা বড় ভোজের আয়োজন করিল! গোবিন্দবাবু নন্দকিশোরকেও নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রবোধ কহিল, "সে স্সপুস্ত্র ন্দ্রস্সস্সপ্ত টাকে আবার আনা কেন?"

প্রবোধের জনৈক মক্কেল বন্ধু নববর্ষ উপলক্ষে প্রবোধকে একটি হীরক-অঙ্গুরিয় উপহার পাঠাইয়াছিল। আহারের পর বৈঠকখানায় বসিয়া সেই অঙ্গুরির সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। সকলেই প্রশংসা করিতেছিল। নন্দকিশোরও কম্পিত-হস্তে অঙ্গুরিটি দেখিয়া

তাহার নির্মাণ-পারিপাট্যের প্রশংসা করিলেন। নানাবিধ গল্পও চলিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রবোধ তাহার উকিল বন্ধুটির দিকে চাহিয়া কহিল, "কই, আংটিটা দেখি হে! Presents প্রেজেন্টস-এর সম্বন্ধে মন্মথর বেশ taste আছে, কি বলো?" উকিল বন্ধু কহিল,— "আংটিটা আমার কাছে নাই তো। নন্দবাবু দেখছিলেন না?" নন্দকিশোর স্থিরকণ্ঠে কহিলেন, "আজ্ঞে, আমি প্রবোধবাবুর হাতে দিয়াছি।" প্রবোধ বিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে কহিল, "কখন আবার দিলেন মশাই?" তখন আংটির অনুসন্ধান হইতে লাগিল। সকলেই উঠিয়া খোঁজ করিতে লাগিল। তখন প্রবোধের আর-একটি বন্ধু কহিল, "আচ্ছা, ভুলে কেউ পকেটে রাখেননি তো!" তখন সকলেই আপন-আপন পকেট উল্টাইয়া দেখিতে ও দেখাইতে লাগিল। প্রবোধ কহিল, "নন্দবাবুর পকেটটা দেখি!" নন্দকিশোর কিছু না বলিয়া চুপ কবিয়া রহিল। প্রবোধের বন্ধুবর্গ বলিয়া উঠিল, "এ কি রকম মশায়? আমরা সবাই যখন পকেট দেখাতে পারলুম, তখন আপনিই বা আর বাদ যান কেন? —দেখান না পকেটটা!" নন্দকিশোর সবলে পকেট চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রবোধ চিৎকার করিয়া বলিল, "এ কিন্তু বড় অন্যায় হচ্ছে নন্দবাবু!" নন্দকিশোর কাতর দৃষ্টিতে গোবিন্দবাবুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। গোবিন্দবাবুরও মুখে কোনও কথা ছিল না। উকিল বন্ধুটি কহিলেন, "শুধু পকেটটা একবার দেখাতে আপনার আপত্তি কি বলুন? Simply to make, us doubly sure-আপনি তো আর আংটি নেন নি! পকেটটা দেখালেনই বা, এই তো আমরা সবাই দেখালুম।" নন্দকিশোর কম্পিতস্বরে কহিলেন, "আমার একটু আপত্তি আছে।" প্রবোধ হাঁকিয়া উঠিল, "কিসের আপনার আপত্তি?" বৃদ্ধ নন্দকিশোরের দুই চক্ষু দিযা ঝর্-ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল; নন্দকিশোর সবলে আপনার জামার পকেট চাপিয়া কহিলেন, "আমাকে বিশ্বাস করুন—আমি—আমি আংটি নিইনি। বিশেষ আপত্তি না থাকলে আমি—আমি নিশ্চয় পকেট দেখাতুম।" প্রবোধ গোবিন্দবাবুর দিকে চাহিয়া উত্তেজিতস্বরে কহিল,—"আচ্ছা বাবা, এটা কি নন্দবাবুর ভালো হচ্ছে?" গোবিন্দবাবু নন্দর দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। নন্দকিশোর গোবিন্দবাবুর দিকে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "আপনি যদি পকেট দেখাতে বলেন, তা হলে এখনি দেখাব গোবিন্দবাবু! আমি যথার্থ বলছি, আংটি আমার কাছে নাই।" গোবিন্দবাবু হঠাৎ উঠিয়া নন্দকিশোরের পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিয়া কহিলেন, "না, না, নন্দবাবু আপনাকে পকেট দেখাতে হবে না। আপনি বাড়ি চলুন।" পরে পুত্র ও পুত্রের বন্ধুবর্গের দিকে চাহিয়া তীব্রস্বরে কহিলেন, "কেন তোমরা নন্দবাবুকে অপমান করছ?" গোবিন্দবাবুর স্বর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। গোবিন্দবাবু নন্দকিশোরের সহিত বহির্দ্বার অবধি অগ্রসর হইলেন। বাহিরে আসিয়া কম্পিতস্বরে নন্দকিশোর কহিলেন, "গোবিন্দবাবু! আপনি কি আমাকে সন্দেহ করেছেন?" গোবিন্দবাবু যেন চমকিয়া উঠিলেন, চট করিয়া উত্তর দিতে পারিলেন না। ঢোক গিলিয়া তিনি কহিলেন, "অ্যাঁ—না, সন্দেহ নয়!" নন্দকিশোবের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিল—চারিদিক ধোঁয়ার মতো বোধ হইল। বৃদ্ধ ধীরে-ধীরে বাড়ি চলিয়া গেলেন।

গোবিন্দবাবু পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করিলে প্রবোধ করিল, "বাবার যেমন কাণ্ড! কোথাকার "old rascal" কে এখানে নিয়ে আসেন!" গোবিন্দবাবু গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "চুপ করো,—নন্দবাবু লোক ভালো!" প্রবোধ কহিল, "লোক ভালো তো পকেট দেখালে

না কেন? যদি আংটি না নেবে, তা হলে পকেট দেখাতে আপত্তি কি? এঁরা সকলেই তো পকেট দেখালেন!" গোবিন্দবাবু কিছু বলিলেন না। সেইদিন শেষরাত্রে কম্প দিয়া গোবিন্দবাবুর জ্বর আসিল। গোবিন্দবাবুর পীড়ার জন্য পরদিন প্রভাতে প্রবোধের কলিকাতায় প্রত্যাগমন ঘটিল না। প্রায় একসপ্তাহ পরে গোবিন্দবাবু পথ্য পাইলেন।

তাহার পরে একদিন প্রাতঃকালে প্রবোধের কলিকাতা গমনের জন্য ভৃত্যবর্গ জিনিসপত্র গুছাইতে ব্যস্ত হইল। প্রবোধ বৈঠকখানায় চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল। সহসা সে দেখিল, কক্ষের এক কোণে ওয়েস্টপেপার-বাস্কেটের পার্শ্বে কি একটা ঝিক-ঝিক করিতেছে! উঠিয়া গিয়া দেখে, সেই অঙ্গুরি! প্রবোধের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। সেই মুহূর্তেই, নন্দকিশোরের বেদনাকাতর মুখখানি তাহার মনে পড়িয়া গেল। আহা, বেচারিকে বড়ই রূঢ় কথা বলা হইয়াছে! তাহার মনে বড় অনুতাপ হইতে লাগিল। বৃদ্ধ না জানি কত কষ্টই পাইয়াছে। বৃদ্ধের নিকট এখনই ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্তব্য! কিন্তু এখন আর সময় নাই, এখনই যাত্রা করিতে হইবে! প্রবোধ-স্থির করিল, এবাবে যখন দেশে আসিব, তখন প্রথমেই বৃদ্ধের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব।

প্রবোধ চলিয়া গেল। গোবিন্দবাবুর বাড়িটা যেন বড় ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল! ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে ভোলা, নন্দবাবু আসেননি?" ভোলা কহিল, "আজ্ঞে, তিনি তো এ কদিন আসেননি।"

"এক দিনও আসেননি? কেন রে?"

গোবিন্দবাবু ভাবিলেন, বৃদ্ধের কি অসুখ করিয়াছে? সে রাত্রিব প্রত্যেক ঘটনা গোবিন্দবাবুর মনে পড়িল। সেই কাতব কম্পিত কণ্ঠস্বর;—সেই নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ের ব্যাকুল নিবেদন! আহা, সেই লাঞ্ছনায় ও অপমানে বৃদ্ধের প্রাণে কতই না কষ্ট হইয়াছে। তাই বৃদ্ধ লজ্জায়-ঘৃণায় আর এ দিকে পদার্পণ করেন নাই! গোবিন্দবাবুব সামান্য একটু সর্দি হইলে সে নন্দকিশোর একদণ্ডে তাঁহার কষ্টলাঘবের চেষ্টা করিতেন, সেই নন্দকিশোর আজ কয়দিন একেবারে এ দিকে আসেন নাই! সেই নন্দকিশোরকে, সেই প্রাণের বন্ধুকে গোবিন্দবাবু সে রাত্রে একটু সন্দেহ করিয়াছিলেন,—হাঁ করিয়াছিলেন বই কি! অনুশোচনায় গোবিন্দবাবুর হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। গোবিন্দবাবু ডাকিলেন, "ভোলা।"

"আজ্ঞে!"

"তুই চট করে একবার নন্দবাবুকে ডেকে আনত! আর বলিস যে, যে আংটি-হারিয়েছিল, তা' পাওয়া গেছে।"

কয়েক মুহূর্ত পরে ভোলা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "বাড়িতে কেউ নেই!"

অধীরভাবে গোবিন্দবাবু কহিলেন, "সে কি—কোথায় গেল সব?"

"তা কেউ বলতে পারলে না—বাড়িতে জিনিসপত্রও কিছু নেই।"

"কবে গেল?"

"পাড়ার লোকে বলে, যেদিন আপনার অসুখ করে, তার পরদিন সন্ধ্যার সময় তিনি নাতিনীটিকে নিয়ে কোথায় চলে গেছেন—আর ফিরে আসেননি।"

গোবিন্দবাবু চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল! তিনি বিছানায় শুইয়া পড়িয়া মনে-মনে কহিলেন, "হায় বন্ধু, এমনই করিয়া আমার অপরাধের শাস্তি দিয়া গেলে! ক্ষমাভিক্ষার অবসরটকুও কাড়িয়া লইলে!"

॥ ৪ ॥

এই ঘটনার পর প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই নাতিসংক্ষিপ্ত অবসরটুকুর মধ্যে গোবিন্দবাবুর পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। প্রবোধচন্দ্রের পশারও পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে;—তাঁহার পুত্রটিও বি. এ. পড়িতেছে! চঞ্চলা কমলা এই পরিবারটির উপর আপনার স্নেহদৃষ্টি অচঞ্চলই রাখিয়াছেন। সরস্বতী দেবীরও কৃপাপ্রকাশে কার্পণ্য ছিল না।

পূজার ছুটিতে পক্ষিশিকারের জন্য প্রবোধচন্দ্র নদীয়ার একটি বিলে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। খোড়ের নাতিপ্রশস্ত খাতে নৌকা-রাখিয়া প্রবোধচন্দ্র পল্লীগ্রাম-দর্শন-বাসনায় একাকী প্রান্তরমধ্যে বেড়াইতে চলিলেন। পল্লীর কুতূহলী বালকবালিকা ও বধূবর্গ সাহেবী পোষাক পরা প্রবোধচন্দ্রকে বিস্ময়-বিহ্বলদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। প্রবোধচন্দ্র মাঠের মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া একটা গ্রাম্যপথে পড়িলেন। এমন সময় একটি বালিকা নিতান্ত অপ্রতিভ-ভাবে প্রবোধচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া কহিল, "ওগো! তুমি কি ডাক্তারসাহেব?" *গ্রাম্য বালিকার এতখানি সাহস দেখিয়া প্রবোচন্দ্র বিস্মিত হইল; কহিল,* "কেন বলো দেখি?" বালিকা তাহার ডাগর-করুণ চোখদুটি প্রবোধের প্রতি নিবদ্ধ রাখিয়া কহিল, "আমার দাদার বড় অসুখ করেছে,—একবার দেখবে এসো না!" বালিকার ব্যাকুলতায় বিগলিত হইয়া প্রবোধ তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে দ্বিধা করিল না। প্রবোধ গৃহে হোমিওপ্যাথির আলোচনা করিত—নৌকায় ঔষুধের বাক্সও ছিল। ভাবিল, যদি তেমন দেখি তো ঔষধ পাঠাইয়া দিব।

বালিকা প্রবোধকে লইয়া একটি ভগ্ন-জীর্ণ, বৃহৎ বাটীতে প্রবেশ করিল। সে ধীরে-ধীরে শয্যায় শায়িত এক বৃদ্ধের নিকট গিয়া ডাকিল, "দাদা!"

বৃদ্ধ চোখ চাহিয়া কহিল, "নীরা—আয়—দিদি?"

নীরা কহিল, "দাদা, ডাক্তারসাহেব এসেছেন!" ঈষৎ হাসিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বৃদ্ধ কহিল, "কাছে আয় দিদি!" বৃদ্ধের রোগপীড়িত আকৃতি ও কণ্ঠস্বরে প্রবোধের একটা অতীত কথা মনে পড়িয়া গেল। প্রবোধ ভাবিল, তাহা কি সম্ভব? এই কি নন্দবাবু? নীরাকে কহিল, "আচ্ছা, তোমরা কি আগে বাঁশগাছিতে থাকতে?"

"হাঁ।"

"সেখান থেকে চাল এলে কেন?"

"তারা দাদাকে তাড়িয়ে দিলে যে!"

"কেন তাড়িয়ে দিলে?"

"সে অনেক কথা—এখন দাদাকে তুমি ওষুধ দাও না ডাক্তার সাহেব!"

প্রবোধ বৃদ্ধের নাড়ি পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, নাড়ি নাই! ঔষধেরও আর প্রয়োজন নাই! বৃদ্ধের অন্তিমকাল উপস্থিত।

প্রবোধের পকেটে সৌভাগ্যক্রমে একটু পোর্ট ও কনডেন্সড্ মিল্ক ছিল। তাড়াতাড়ি তাহারই কিঞ্চিৎ বৃদ্ধকে পান করাইল। পরে নীরাকে কহিল, "কোনও ভয় নাই;—এখন বলো দেখি, তোমরা এখানে এলে কেন?"

নীরা সরলভাবে কহিতে লাগিল, "দাদার কাছেই সব কথা শুনেছি। বাঁশগাছিতে গোবিন্দবাবুর সঙ্গে দাদার খুব ভাব ছিল। তাঁর ছেলে একবার বাঁশগাছিতে আসেন, সঙ্গে আরও কে-কে এসেছিল। তারা দাদাকে দেখতে পারত না। একদিন তাহাদের একটা আংটি

হারিয়ে যায়। তারা দাদাকে পকেট দেখাতে বলে—ওরা মনে করলে, দাদা চুরি করেছে। কিন্তু দাদা তা করেনি—তারা দাদাকে চোর বললে—তাই দাদা আমাকে নিয়ে এখানে চলে এল। এখানে খুব আগে আমাদের বাড়ি ছিল। দাদা চাষাদের ছেলে পড়ায়, তাই তারা চাল-ডাল দিয়ে যায়; তাইতে আমাদের চলে। দাদা বলে,—বাঁশগাছিতে আর যাবে না—সেখানকার লোক দাদাকে বোধহয় আবার চোর বলবে। গোবিন্দবাবুর ছেলে দাদাকে বড় বকেছিল।" —বালিকার চোখ হইতে টস্ করিয়া এককোঁটা জল পড়িল। প্রবোধ গম্ভীরস্বরে কহিল, "তা, তোমায় দাদা যদি চুরি করেন নি তো পকেট দেখালেন না কেন?" বালিকা অবনতমস্তকে কহিল, "দাদা কেমন করে পকেট দেখাবে? গোবিন্দবাবুর বাড়িতে দাদার যে নিমন্ত্রণ ছিল। তারা দাদাকে কমলালেবু, আঙুর, আপেল,—এই সব খেতে দিয়েছিল। দাদা তা নিজে না খেয়ে সেগুলি চুপিচুপি পকেটে করে আমার জন্যে নিয়ে আসছিল! পকেট দেখালে গোবিন্দবাবুর ছেলে-টেলেরা পাছে ঠাট্টা করে, তাই দাদা পকেট দেখায়নি! দাদা যখন যেখানে খেতে যায়, তখনই নিজে না খেয়ে আমার জন্যে সব নিয়ে আসে! আমি কত বারণ করি, তবু দাদা শোনে না।"

প্রবোধের হৃদয় অসহ্য বেদনায় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। হায়! বৃদ্ধ স্নেহের অনুরোধে সে রাত্রে অপবাদ বহন করিতেও প্রস্তুত ছিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রবোধ করিল, "তোমার বাবা-মা নেই?"

"না, তাঁরা স্বর্গে।"

নীরার চোখ ছলছল করিতে লাগিল। প্রবোধ আবার কহিল, "তাদের কথা তোমার মনে আছে?"

"না; দাদা বলে, তখন আমি খুব ছোট ছিলুম।"

প্রবোধের সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া একটা কাতরস্বর বাহির হইল,—'আহা!' প্রবোধ ভাবিল, হায়! ইহাদের প্রতি কত নৃশংসতা করিয়াছি। এই পিতৃমাতৃহীনা বালিকাটির একমাত্র আশ্রয় সেই হতভাগ্য বৃদ্ধকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাহাকে কি বর্বরভাবে লাঞ্ছিত করিয়াছি! হায়! কি করিয়া সে গভীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে? প্রাণ দিয়াও যদি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, প্রবোধ তাহাতেও কিছুমাত্র অসম্মত নহে।

বৃদ্ধ ধীরে-ধীরে ডাকিল, "দিদি!"

"কেন দাদা?"

"কাছে একবার আয় না দিদি!'

নীরা বৃদ্ধের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার ললাটে হাত বুলাইতে লাগিল। বৃদ্ধ ধীরে-ধীরে কহিলেন, "তোকে কার কাছে রেখে যাব দিদি?"

বালিকা রুদ্ধস্বরে কহিল, "ও কথা বলো না দাদা, আমার বড় কান্না পায়! তুমি ভালো হবে দাদা, ডাক্তারসাহেব বলেছেন!" হায়! এই মাতৃহৃদয়া বালিকার সান্ত্বনা কি মধুর, কি সুন্দর!

প্রবোধ ধীরে-ধীরে ডাকিল, "নন্দবাবু!" বৃদ্ধ অতি কষ্টে চাহিলেন। প্রবোধ কহিল, "আমাকে মাপ করবেন নন্দবাবু। আমি প্রবোধ। বাঁশগাছির গোবিন্দবাবুর ছেলে আমি! বেশ বুঝতে পারছি,—আমিই আপনাদের এ দুর্দশার কারণ। বলুন, কি করলে আপনাকে সুখী করতে পারি?"

বৃদ্ধের মৃত্যুচ্ছায়ামলিন মুখে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। শীর্ণ হাতখানি নীরার অঙ্গে স্থাপন করিয়া অতি কষ্টে বলিলেন, "নীরা অনাথিনী, ওকে দেখো!"

প্রবোধ কহিল, "আমার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী একমাত্র পুত্র সুবোধের সঙ্গে আমি নীরার বিবাহ দিব, প্রতিজ্ঞা করছি! বলুন, আপনার এতে মত আছে?"

বৃদ্ধ প্রবোধের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁহার নয়নপ্রান্তে দুইবিন্দু অশ্রু মুক্তার মতো গড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধ কহিলেন, "চিরদুঃখিনী নীরা সুখী হবে, ভগবান তোমার ভালো করুন!" বৃদ্ধ স্থির হইলেন। নীরার হাতখানি আপনার বুকের উপর টানিয়া কহিলেন, "সুখী হও নীরা, দিদি আমার!" তাহার পর বৃদ্ধের কণ্ঠ নীরব হইল।

প্রবোধ তাড়াতাড়ি বুকে হাত দিয়া দেখিল, সব ফুরাইয়াছে। বৃদ্ধের জীবনদীপ চিরদিনের জন্য নির্বাপিত হইয়াছে। আশ্রয়হীনা নাতিনিটিব সংস্থান করিয়া দিবার জন্যই যেন বৃদ্ধ এতক্ষণ জীবিত ছিলেন!

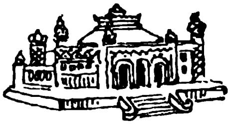
নীরা বৃদ্ধের বুকের উপর মাথা রাখিয়া ডাকিল, "দাদা!"

কে উত্তর দিবে? তাহার স্নেহময় সরলহৃদয় দাদা আজ এতদিন পরে ছুটি পাইয়াছেন! আজ তাঁহার সকল দুঃখ সকল শোকের অবসান!

নীরা ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

১৭শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩১৩

জাপানি গল্প



মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ঝিনুক পুরী ॥

দুই রাজপুত্তুর; বড় হলেন ঝলককুমার, ছোট হলেন ঝিলিককুমার। বড় কুমার রেগেই আছেন, কাছে যায় কার সাধ্য? যেন আগুনের ঝলক! আর ছোট কুমারের রাগ পলকে মিশায়, যেন আকাশের ঝিলিক!

ঝলককুমার মাছ ধরতে ভারি পটু; আর ঝিলিককুমার বড় শিকারী; ঝলককুমারের ছিপ জলে পড়লে সমুদ্র যেন শুকিয়ে যায়, আপনি এসে মাছ ধরা দেয়। আর ঝিলিককুমারের তীর বিদ্যুতের মতো ছোটে, তাঁর তলোয়াব বজ্রের মতো হানে, আকাশের পাখি, বনের বাঘ, কারও নিস্তার নাই। রাজা-রানি ছোট ছেলেটিকে বেশি ভালোবাসেন; সেই জন্যে ঝলককুমার ছোট ভাইয়ের উপর হাড়ে চটা।

ঝিলিককুমার দাদার কাছে রোজ বকুনি খান, মার খান, কিছু বলেন না; দাদার হাতে-পায়ে ধরে বলেন,—"দাদা! রাগ কোরো না, আমায় ক্ষমা করো।"

দাদা রোজ বড়-বড় মাছ ধরে আনেন দেখে ঝিলিককুমারের একদিন মাছ ধরবার ভারি ইচ্ছে হল; দাদাকে গিয়ে বললেন,—"দাদা, বনের পশু মেরে-মেরে আমার অরুচি জন্মে গেছে; আজ আমার মাছ ধরবার সাধ হয়েছে, তোমার ছিপটা একবার দাও না দাদা।"

ঝলককুমার এই কথা শুনে রেগে উঠে বললেন,—"যা, যা; তোর আর মাছ ধরতে হবে না, আমার ছিপ খারাপ করে ফেলবি।"

ঝিলিককুমারের অনেক সাধ্যসাধনার পর, কি জানি কেন, সে দিন ঝলককুমারের মনটা একটু নরম হয়ে এল। তিনি ছোট ভাইকে মাছ ধরতে নিজের ছিপগাছটি দিলেন।

ঝিলিককুমার জাল-দড়া-টোপ-বঁড়শি নিয়ে রাত থাকতে গিয়ে সমুদ্রে ছিপ ফেলেছেন। দেখতে-দেখতে খটমটে রোদ উঠল, ঝিলিককুমার এক দৃষ্টিতে ফাৎনার দিকে চেয়ে বসে আছেন, আর চার ফেলছেন; চারের গন্ধে মাছ ভুর-ভুর করছে, কিন্তু সে গন্ধে একটাও টোপ গিলছে না।

এমনি করে বেলা বয়ে যায়; সকাল গিয়ে দুপুরের রোদ আগুন হয়ে উঠল; সেই রোদ মাথায় লেগে ঝিলিককুমারের রক্তও আগুন হয়ে উঠল। রাজবাড়ি থেকে কতবার কত লোক ছোট রাজকুমারকে খাবার জন্যে ডাকতে এল, তিনি তাদের সকলকে হাঁকিয়ে দিলেন; বললেন, "মাছ না-ধরে আজ আমি জলস্পর্শ করব না।"

রাজা ডেকে পাঠালেন; রাণি বলে পাঠালেন; তবুও রাজপুত্র উঠলেন না। ছিপ হাতে গোঁ হয়ে বসে রইলেন। রোদ পড়ে গেল; সন্ধ্যা হয়ে এসেছে; চেয়ে আর কিছু দেখা যায় না; তবুও রাজপুত্র ওঠেন না। এমন সময় একটা মাছ ঠক্ করে এসে একবার ঠোকরালে। রাজকুমার ছিপটা একটু শক্ত করে ধরে বসলেন, সময় বুঝে এক টান! কিন্তু যেমন টান মারা, মাছটাও ল্যাজের এক ঝাপটায় ডোর-বঁড়শি ছিঁড়ে দৌড়।

এত রাত্রে শুধু হাতে বাড়ি ফিরতে দেখে ঝলককুমার ছোট ভাইকে বিদ্রূপ করে বললেন,—"দে আমার ছিপ, মাছ ধরা কি তোর কর্ম? বুনো কোথাকার!"

তারপর যখন ছিপ হাতে নিয়ে ঝলককুমার দেখলেন, বঁড়শি নেই, তখন আর কোথা যায়, একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে গালমন্দ দিয়ে বললেন,—"যেখান থেকে পারিস আমার বঁড়শি এনে দে; নয়তো আজ তোরই এক দিন কি আমারই একদিন।"

সমস্ত দিন না-খেয়ে না-দেয়ে একটা মাছও ধরতে না পেরে ঝিলিককুমারের মন ভারি খারাপ ছিল; তার উপর দাদার এই বকুনিতে তাঁর মনে ভারি রাগ হল। মনের ক্ষোভে নিজের শখের তরোয়ালখানা বার করে হাতুড়ির ঘায়ে চুরমার করে ফেললেন, তার পর সেই ইস্পাতের টুকরো নিয়ে তাতে পাঁচশো বঁড়শি গড়িয়ে দাদাকে দিতে গেলেন। ঝলককুমারের রাগ তাতে পড়ল না; ঝিলিককুমারের গালে একচড় বসিয়ে দিয়ে বললেন, পাঁচশো' বঁড়শি চাই না; আমার সেই বঁড়শিই এনে দে।"

দাদা রাগ করেছেন; ঝিলিককুমারের প্রাণে তখন আর রাগ নাই; তিনি দাদাকে ভোলাবাব জন্যে পাঁচশো বঁড়শির জায়গায় হাজার বঁড়শি তৈরি করে নিয়ে বললেন, "দাদা! তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার উপর রাগ করে থেকো না, এই নাও, তোমার জন্যে ভালো ইস্পাত নিয়ে নিজের হাতে গড়ে হাজার বঁড়শি এনেছি।"

ঝলককুমার সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লেন,—"এ আমি চাই না—যে বঁড়শি হারিয়েছিস, তাই এনে দে।"

ঝিলিককুমার কি করেন? সমুদ্রে কোন মাছ সে বঁড়শিটি নিয়ে অগাধ জলের কোনখানে লুকিয়ে আছে, তিনি কেমন করে তা এনে দেবেন? রোজ দাদার কাছে বকুনি খান, মার খান,—অমন শখের শিকার ঘুচে গেছে, মনের দুঃখেই আছেন।

একদিন খুব ধমকানি খেয়ে মনে ভারি দুঃখ হয়েছে,—বুক ফেটে কান্না আসছে,—সমুদ্রের তীরে নির্জন জায়গায় বসে হাপুস-নয়নে কাঁদছেন, এমনসময় কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন; ঝিলিককুমারের দাড়িটি তুলে ধরে আদর করে জিজ্ঞাসা করলেন,—"রাজকুমার! কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?"

ঝিলিককুমারের সন্ন্যাসীকে বঁড়শি হারানোর সব কথা খুলে বললেন,—"দাদা সেই হারানো বঁড়শিটি চান, তা এখন তাঁকে কোত্থেকে এনে দি!"

সন্ন্যাসী বললেন,—"এসো আমি উপায় করে দিচ্ছি।" এই বলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে, সমুদ্রের জলে একটা জেলেডিঙি ভাসছে, সেইখানে আনলেন।

সন্ন্যাসী বললেন,—"রাজকুমার! এই ডিঙিতে ওঠ—কোনও ভয় নেই, সমুদ্র এখন বেশ ঠান্ডা, খুব আরামে যেতে পারবে। এই উত্তর মুখ করে বরাবর বেয়ে যাও,—যেতে-যেতে দেখতে পাবে, ঠিক সামনেই ঝিনুকে বাঁধানো এক প্রকাণ্ড বাড়ি—সে হচ্ছে শঙ্খরাজের প্রাসাদ। সেই প্রাসাদের সামনে একটা কুয়ো আছে, তারই ধারে এক বৃহৎ মুক্তলতার গাছ আছে; তুমি ডিঙি থেকে নেমে সেই গাছের মাথায় চড়ে বসে থেকো;—তা হলেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।"

ঝিলিককুমার তাই করলেন। সন্ন্যাসী যা-যা বলে দিয়েছিলেন, সব ঠিক মিলল। খানিক দূর গিয়েই দেখলেন, ধবধবে ঝিনুকপুরী, ফটকের সামনে কুয়ো, তার পাশেই সেই বৃহৎ মুক্তলতার গাছ।

ডিঙি থেকে তাড়াতাড়ি নেমে ঝিলিককুমার সেই গাছের উপর উঠে বসলেন। কতক্ষণ এমনি করে কেটে গেল।

মুক্তকেশী রাজকন্যার দাসীরা সোনার কলসী কাঁকে সেই কুয়োর জল নিতে এসেছে; দেখে, ফটিকের মতো যে সাদা জল, তার উপর একটা কালো ছায়া। কিসের ছায়া? উপর দিকে চেয়ে দেখে, মুক্তলতার গাছে বসে এক অপরূপ সুন্দর পুরুষ!

রাজপুত্র দাসীদের দেখে বললেন, "আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে, তোমরা কেউ আমাকে একটু জল দাও।"

এক দাসী সোনার কলসী থেকে ফটিকের মতো জল গড়িয়ে সোনার ঘটি ঝিলিককুমারের হাতে তুলে দিলে। রাজকুমার সেই সোনার ঘটি নিয়ে ডানহাতে মুখের কাছে ধরে বাঁহাতে গলার মুক্তোর মালা থেকে বড় দেখে একটা মুক্তো ছিঁড়ে নিয়ে সেই গেলাসে টপ করে ফেলে দিলেন। মুক্তোসুদ্ধ সোনার ঘটি দাসীরা রাজকন্যার কাছে নিয়ে গেল। মুক্তকেশী রাজকন্যা সেই মুক্তো দেখে বললেন, "এ মুক্তো কোথায় পেলি, কার গলায় মালা থেকে নিয়ে এলি? এ যে মানুষ-মানুষ গন্ধ করে? সমুদ্রের মাঝে ঝিনুকপুরী, এখানে কি মানুষ এল!"

দাসীরা বললে, "আজ সকালে জল আনতে গিয়েছিলুম; কুয়োর ভিতর চেয়ে দেখি, ধব্‌ধবে সাদা জলে কালো ছায়া! এ দিক দেখি, সে দিক দেখি, নিচে চাই, উপরে চাই, সাদা জল কালো হল কিসে! ওমা! চেয়ে দেখি না, কুয়োর পাশে মুক্তলতার গাছে বসে এক রাজকুমার! মানুষের মতো ধরন, বিদ্যুতের প্রায় বরণ, মেঘের মতো কেশ, মণিমুক্তোর বেশ, হীরের মতো দাঁত, চুনির মতো ঠোঁট, ঝিনুকের মতো নখ। জল খেতে চাইলেন, সোনার কলসী থেকে সোনার ঘটিতে জল গড়িয়ে দিলুম; হাতে নিলেন, কিন্তু জল খেলেন না, গলার মালা থেকে মুক্তো ছিঁড়ে ঘটিতে ফেলে দিলেন।"

মুক্তোকুমারী দাসীদের বললেন, "চল্, আমায় নিয়ে চল; কেমন সে রাজকুমার, একবার দেখে আসি।"

মুক্তোকুমারী খিড়কির দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে রাজকুমারকে দেখছেন, মুক্তোকুমারীর গা থেকে জোছনার মতো আভা এসে ঝিলিককুমারের মুখে পড়ল। রাজকুমার চমকে উঠে খিড়কির দিকে চেয়ে দেখলেন; চার চোখে মিলন হল! মুক্তোকুমারী লজ্জা পেয়ে সরে গেলেন; সঙ্গে-সঙ্গে রাজকুমারের মুখের উপর থেকে জোছনার আভাও মিলিয়ে গেল। ঝিলিককুমারের মুখ মলিন হল।

শঙ্খরাজের কাছে খবর গেল, ঝিনুকপুরীতে মানুষের দেশ থেকে এক রাজপুত্র এসেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি এসে ঝিলিককুমারকে প্রাসাদের মধ্যে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। মখমলের মতো কোমল পদ্মপাতার আসনে বসালেন; ঝিনুকের বাসনে সমুদ্রের মাছ খাওয়ালেন; হাঁসের ডিমের মতো এক ছড়া মুক্তোর মালা ভেট দিলেন।

ঝিলিককুমারকে দেখে অবধি মুক্তোকুমারীর কি হয়েছে,—খান না, দান্ না, আনমনে সর্বদা কি ভাবেন। মৎস্য-রাণির এই এক মেয়ে। তাঁর বড় ভাবনা হল। কত হাকিম এল, বদ্যি এল, কত ওষুধপত্র দিয়ে গেল। কিন্তু কিছুতে কিছু হল না। মুক্তোকন্যা দিন-দিন ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগলেন।

রাজকুমার মুক্তোকন্যাকে সেই খিড়কির আড়ালে চকিতের মতো একবার দেখেছেন,

আর তাঁর দেখা পান্‌নি; মুক্তোকুমারীকে দেখবার জন্য তাঁরও মন ছটফট করে, কিন্তু দেখা আর হয় না।

একদিন শঙ্খরাজ সভায় এসে বসেছেন, মুখটা ভার-ভার, মনটা আনচান।

ঝিলিককুমার জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ! আজ আপনাকে এমন বিমর্ষ দেখছি কেন?"

শঙ্খরাজ বললেন,—"রাজকুমার! আমার একটিমাত্র কন্যা; সে আজ কদিন থেকে কি এক অসুখে ভুগছে, কেউ কিছু কর্ত্তে পাচ্ছে না; মা আমার দিনে-দিনে চাঁদের মতো ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে!"

মুক্তোকুমারীকে দেখবার এই একটা সুযোগ বুঝে ঝিলিককুমার বললেন, "মহারাজ! যদি অনুমতি দেন, আমি রাজকন্যাকে একবার দেখি, যদি আরাম কর্ত্তে পারি।"

ঝিলিককুমার মুক্তোকুমারীকে দেখতে গেলেন। তাঁকে দেখে মুক্তকেশী রাজকন্যার অর্দ্ধেক অসুখ তখনই সেরে গেল।

রোজ দুবেলা ঝিলিককুমার মুক্তোকন্যাকে দেখতে যান। তাঁর সঙ্গে মানুষের দেশের কত গল্প করেন; মুক্তোকন্যা অবাক হয়ে শোনেন। এমনি করে কিছু দিন যায়। মুক্তোকুমারী একেবারে সেরে উঠলেন। শঙ্খরাজ সন্তুষ্ট হয়ে নিজের মেয়ের সঙ্গে ঝিলিককুমারের বিয়ে দিতে চাইলেন।

হাঙর কুমীরের জুড়িতে ঝিনুকের গাড়িতে বর বেরুল; কচ্ছপ আর কাঁকড়ার পিঠে চড়ে বরযাত্রীরা গমন করলেন; ব্যাঙ মশায় সানাইয়ে পোঁ ধরলেন; হাঁস-পক্ষীতে মাছের নাচ সঙ্গে-সঙ্গে চলল। মুক্তোকন্যাকে বিয়ে করে রাজকুমার ঝিনুকপুরীতে সুখে আছেন, হঠাৎ একদিন বাড়ির কথা মনে পড়ল। ঝিলিককুমার এক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কি দুঃখ স্বামীর বুকের ভিতর পোষা আছে? তা দূর করবার কি কোনও উপায় নেই? এই মনে করে মুক্তোকুমারী জিজ্ঞাসা করলেন, "রাজকুমার! তোমার দুঃখ কিসের, আমায় বলো।"

রাজকুমার বললেন, "অনেক দিন দেশ ছাড়া, একবার দেশে যাবার ইচ্ছে হয়েছে।"

মুক্তোকুমারী বললেন, "তার আর ভাবনা কি, তুমি এখুনি যাও না।"

ঝিলিককুমার স্ত্রীকে তখন দাদার সেই বঁড়শি হারানোর কথা সব খুলে বললেন, "দাদার সে বঁড়শিটি নিয়ে যেতে না পারলে তিনি আমায় আস্ত রাখবেন না।"

শঙ্খরাজের কানে এ কথা উঠল। তিনি সমুদ্রের সব মাছকে তলব করে পাঠালেন। কে সেই বঁড়শি নিয়েছে, খোঁজ পড়ে গেল।

এক দূত মাঝ-সমুদ্র থেকে খবর এনে বললে, "মহারাজ! 'তাই' মাছের বুড়ি দিদিমার আজ তিন বছর থেকে গলায় কি আটকে আছে, ভালো করে খেতে পারে না, গলায় ব্যথা, খুক্-খুক করে কাশে। তার গলাটা একবার সন্ধান করুন।"

'তাই' বুড়ি একে বুড়ো বয়সে জ্বরে থরথর করে কাঁপে, তার উপর রাজা ডেকে পাঠিয়েছেন। বুড়ি আর কাঁপতে-কাঁপতে মুক্তোরাজের সামনে এসে হাজির হল, বললে,— "দোহাই মহারাজ! আমি কিছু জানি না।" শঙ্খরাজ বদ্যি ডেকে পাঠালেন। তিনি এসে তাই বুড়ির গলাটা ভাল করে দেখে একটা শোন্না দিয়ে একটা রক্তমাখা বঁড়শি টেনে বার করে আনলেন। ঝিলিককুমার দেখে চিনলেন, এ সেই দাদার বঁড়শি।

রাজপুত্র এইবার দেশে যাবার জন্য উদ্যোগ কচ্ছেন। শঙ্খরাজ এসে বললেন, "দেখো রাজকুমার! দেশে যাচ্ছ, সাবধানে থেকো;—তোমার দাদা যখন একটা বঁড়শির জন্য তোমাকে এত কষ্ট দিলেন, তখন তিনি সব কর্ত্তে পারেন। তুমি এই দুটো মুক্তো নাও;—এটার নাম জোয়ারি মুক্তো, এটার নাম ভাটাই মুক্তো। যখন দেখবে, দাদা রাগ করে তোমাকে মারতে আসছেন; তখন এই জোয়ারি মুক্তো হাতে করে তুলে ধোরো, অমনি সমুদ্র থেকে জোয়ারের জল গিয়ে তাঁকে ডুবিয়ে দেবে; তাতে ভয় পেয়ে যদি তিনি ক্ষমা চান, তাহোলে এই ভাটাই মুক্তো তুলে ধোরো, অমনি সে জল ভাটার টানে সমুদ্রে গিয়ে পড়বে।"

সাত নৌকা ভরা সাত হাজার ঝিনুক, সেই সিন্দুকের ভিতর সাত লক্ষ মুক্তো, তাই নিয়ে ঝিলিককুমার দেশে ফিরলেন। রাজা-রানি পুত্রশোকে কেঁদে-কেঁদে অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন, আবার ছেলের মুখ দেখে তাঁদের চোখে দৃষ্টি এল, মুখে হাসি ফুটল। রাজ্য এতদিন বিষাদময় ছিল; এখন ঘরে-ঘরে আনন্দধ্বনি উঠল। রাজা দীন-দুঃখীকে অর্থবিতরণ করলেন, রানি দেবতার পূজো দিলেন।

ঝিলিককুমার যেখানে যান, সেইখানেই আদর পান। রাজা আদব করেন, রানি আদর করেন, বাড়ির যে যেখানে আছে সকলে আদর করে। পথে-ঘাটে সব জায়গায় ঝিলিককুমারের কথা। ঝিলিককুমার যে ঝিনুকপুরী থেকে সাত লক্ষ হাঁসের ডিমের মতো মুক্তো এনেছেন, সে কথা চারিদিকে প্রচার হয়ে গেল; দেশ-বিদেশ থেকে সেই মুক্তো দেখবার জন্য লোক ভেঙে পড়তে লাগল।

এইসব দেখে-শুনে ঝলককুমারের বুক রাগে ফেটে যেতে লাগল।

ঝলককুমার ভাবলেন, সেই বঁড়শিটা নিয়ে ঝিলিককুমারকেও দেশছাড়া করেছিলুম; আবার আপদ এসে জুটেছে। এবারও কেন সেই বঁড়শি নিয়ে তাকে জব্দ করি না। এই না-ভেবে তিনি ঝিলিককুমারের কাছে বঁড়শির দাবি করতে গেলেন, কিন্তু যদি সেটা নিজের বঁড়শি বলে স্বীকার করেন, তা হলে ভাইকে তো আর জব্দ করা হয় না। তিনি তাড়াতাড়ি থতমত ভাবটা সামলে নিয়ে খুব রাগ দেখিয়ে, খাপ থেকে তরোয়ালটা খুলে ফেলে বললেন, "আমার সঙ্গে জোচ্চুরি?"

তরোয়ালটা মাথার উপর পড়ে আর কি, এমন সময়ে ঝিলিককুমার সেই জোয়ারি মুক্তো তুলে ধরলেন; দেখতে-দেখতে কোত্থেকে পর্বতপ্রমাণ ঢেউ নিয়ে সমুদ্রের জল এসে হাজির হল;—ঝলককুমারকে ডুবিয়ে ফেললে; ঝলককুমার একটু সামলে নিয়ে ভেসে উঠলেন,—সাঁতার কাটতে লাগলেন। কিন্তু তাতেই কি রক্ষা আছে? ঢেউয়ের উপর ঢেউ এসে তাঁকে একেবারে অস্থির করে তুললে; নাকানি-চোবানি খেয়ে প্রাণ হাঁপাই-হাঁপাই করে উঠল;—নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ পাচ্ছেন না,—প্রাণ যায়।—ঝিলিককুমারকে ডাক দিয়ে বললেন,—"ভাই রক্ষে কর, রক্ষে কর; আর এমন কাজ করব না।"

ঝিলিককুমার ভাটাই মুক্তো তুলে ধবলেন; হুস করে সমুদ্রের জল সমুদ্রে গিয়ে পড়ল; ঝলককুমার রক্ষা পেলেন।

সেই দিন থেকে জোয়ারের জলে বড় কুমারের রাগের ঝলক চিবদিনের মতো নিভে গেল। ঝিলিককুমারের সঙ্গে আর কখনও ঝগড়া হয়নি।

॥ কাঠুরের গল্প ॥

এক বুড়ো কাঠুরে, তার গালে এক আব্, মস্ত যেন ডাব! একদিন সে কাঠ কাটতে এক পাহাড়ে গেছে। বাড়ি ফেরবার মুখে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি, আর তার সঙ্গে গাছের ডাল-পালা উড়িয়ে পাথরের কুচি ছড়িয়ে এলোমেলো হাওয়া উঠল। সেই দুর্যোগে তো আর বাড়ি ফেরা যায় না, পথের মাঝে অনেকদিনকার এক প্রকাণ্ড গাছ আছে, সেই গাছের গুঁড়ি ফোঁপরা হয়ে একটা কোটরের মতো হয়েছে, তারই ভিতর সে আশ্রয় নিলে।

ঝড়বৃষ্টি থামে না; ক্রমে রাত অনেক হয়ে গেল; তখনও কাঠুরে সেই কোটরের মধ্যে বসে; এমন সময় শুনতে পেলে, অনেক লোক একসঙ্গে মিলে গণ্ডগোল করতে-করতে যেন অনেক দূর থেকে তার দিকে ক্রমে-ক্রমে এগিয়ে আসছে। সে ভাবলে,—"তাই তো! আমি মনে করেছিলুম, এই পাহাড়ের মধ্যে আমি একলাই বুঝি ঝড়-বৃষ্টিতে পড়েছি, কিন্তু তা তো নয়, আরও ঢের লোক রয়েছে যে।"

তখন তার মনে একটু সাহস হল। কোটরের ভিতর থেকে উঁকি মেরে সে দেখলে, একদল লোক সেই দিকে আসছে;—কিন্তু তারা ঠিক মানুষের মতো নয়। তাদের চেহারা কেমন এক রকমের—কারুর মোটে একটা চোখ; কারুর হাত আছে, পা নেই; কারুর শুধু মুণ্ডটা, আছে ধড়টা নেই; কারুর মুখটা একেবারেই নেই। তারা কেউ সাদা, কেউ নীল, কেউ হলদে, কেউ বেগুনি, কেউ লাল, কেউ কালো, কেউ অন্য রঙের রং-বেরং পোশাক পরা।

একটা অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করে' তারা কি এক রকম কাঠ দিয়ে আগুন তৈরি করলে। ঝমাঝম বৃষ্টি, তবু দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল;—সেই আলোয় সমস্ত পাহাড়টা দিনের মতো হয়ে গেল। তখন কাঠুরে দেখলে, সে একটা দৈত্যের দল।

অগ্নিকুণ্ডর চার পাশে সার দিয়ে ঘিরে বসে তারা মদ খাচ্ছে, হাসি ঠাট্টা চলছে, গল্পগুজব জমে উঠেছে, এমন সময় তাদের মধ্যে থেকে একজন ছোকরা লাফিয়ে উঠে ধেই-ধেই করে নাচ শুরু করে দিলে; তার দেখাদেখি আরও অনেকে নাচবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। সকলকার নাচের চোটে পাহাড়টা টলমল করতে লাগল।

কাঠুরে কোটরে বসে-বসে এই সব ব্যাপার দেখছে,—নাচ দেখে তার মনটাও নেচে উঠল। 'যা-থাকে-কপালে' এই না-বলে, কাঠুরে কুড়ুলটা ফেলে, পাগড়িটা মাথায় এঁটে, কোটর থেকে ছুটে বেরিয়ে দৈত্যদের মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে, তাদের সঙ্গে মিলে মহা ফূর্তি করে নাচতে আরম্ভ করলে। তার সে নাচন দেখে কে! —ঘুরে-ঘুরে, পা তুলে-তুলে, হাত নেড়ে-নেড়ে, কোমর বেঁকিয়ে-বেঁকিয়ে নাচ! দৈত্যেরা তার সে নাচ দেখে ভারি খুশি হল—মানুষের নাচ তারা আর কখনও দেখেনি।

নাচ শেষ হয়ে গেলে তারা সকলে মিলে বাহবা দিয়ে বললে,—"কাঠুরে ভাই! তুমি নাচো বেশ! কিন্তু একদিন নাচ দেখিয়ে সরে পড়লে হবে না, রোজ এসে আমাদের সঙ্গে এমনি করে নাচতে হবে।"

কাঠুরে বললে,—"তা বেশ তো!"

একজন দৈত্য তখন বলে উঠল,—"বিশ্বাস নেই, আমরা দৈত্য, আর ও মানুষ; ছাড়া পেলে আমাদের ভয়ে হয়তো আর এ-মুখো হবে না। ও যে আমাদের কাছে নিশ্চয় আসবে, তার প্রমাণের জন্য একটা কিছু জিম্মে রেখে যাক।"

সকলে চেঁচিয়ে উঠল,—"ঠিক বলেছ!"

একজন বললে,—"ও ওর কুড়ুলটা রেখে যাক।"

আর-একজন বললে,—"না, না, ওর টুপিটা।"

আর-একজন বাধা দিয়ে বললে,—"দুর! টুপি-কুড়ুল তো ভারি জিনিস! একটা গেলে দশটা হবে। তার চেয়ে ওর একটা পা কেটে রাখা হোক।"

টুপিটা রাখবার কথা যে বলেছিল, সে তখন চটে উঠে বললে,—"তোর যেমন বিদ্যে! পা কেটে নিলে আমাদের কাছে ফিরে আসবে কি করে? আমাদের মতো ও তো আর দত্যি নয় যে, এক পায়ে হাঁটবে!

কি জিম্মে রাখা হবে, তা আর কিছুতে ঠিক হয় না; তখন এক কন্ধ-কাটা দৈত্য পেটের ভিতর থেকে কথা কয়ে বললে,—"ঠিক হয়েচে, ঠিক হয়েচে!"

সেই কথা শুনে সকলে একসঙ্গে বলে উঠল,—"কি? কি?"

কন্ধ-কাটা তখন বললে,—"ওই যে ওর গালে একটা মাংসের ঢিবি রয়েছে, ওইটে নিয়ে রাখ না। হাত, পা, চোখ, মুখ—সব মানুষেরই আছে; ওই মাংসর ঢিবি বড় চট করে দেখতে পাওয়া যায় না;—ওটা নিয়ে রাখলে কাঠুরেভায়াকে নিশ্চয়ই ফিরে আসতে হবে।"

কাঠুরের কাছ থেকে তার গালের আবটি তাবা জিম্মে চাইলে। কাঠুরে বললে,—"এ আর বেশি কথা কি! প্রাণ চাইলে তাও দিতে পাবি।"

একজন দৈত্য তখন কি একটা মন্তর আউড়ে কাঠুরের গালের আবটা আস্তে আস্তে মুচড়ে, তাকে কোনও কষ্ট না-দিয়ে ছিঁড়ে নিলে। সে জিনিসটা কি, তাই দেখবার জন্যে তখন তাদের মধ্যে একটা কাড়াকাড়ি পড়ে গেল—এ ওর হাতে ছোঁ মারে, সে তার হাতে ছোঁ মারে।

এমনসময় গাছের মাথায় মাথায় পাখি ডেকে উঠল, পূবদিক থেকে সোনার আলোয় বন ছেয়ে গেল; অন্ধকারের সঙ্গে-সঙ্গে দৈত্যগুলোও কোথায় মিশিয়ে গেল।

তখন কাঠুরে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরছে। ফিরতে-ফিরতে বেলা হল। গ্রামের লোক-জন সব যে যার কাছে যাচ্ছে, পথের মাঝে কাঠুরের সঙ্গে দেখা। কাঠুরের গালে আব নেই দেখে তারা ভারি আশ্চর্য হয়ে গেল। কেউ বললে, "কাঠুরে মামা!" কেউ বললে, "কাঠুরে দাদা!" কেউ বললে, "কাঠুরে খুড়ো! তোমার আবটি কি হল?" কাঠুরে উত্তর করলে, "সে অনেক কথা, কাজ সেরে সাঁঝের বেলা আমাব ঘরে আসিস, সব কথা বলব।"

কাঠুরে পাহাড়ে কাঠ কাটতে গিয়েছিল, ঝড়-বৃষ্টিতে পড়ে দৈত্যদের সঙ্গে নেচেছিল, তার পর তারা কেমন করে তার আবটি খসিয়ে নিয়েছে, এই সব কথা দেখতে-দেখতে গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল। সেই গ্রামে আর-একজন বুড়ো ছিল, তার গালেও একটা আব। সে তখন ভাবলে, যাই না কেন, আমার আবটাও খসিয়ে আসিগে।" এই না ভেবে সেও সেই রাত্রে সেই পাহাড়ে গিয়ে কাঠুরে যেখানে বসেছিল, সেই কোটরে গিয়ে বসে রইল। দৈত্যরা আগের রাত্রে যেমন এসেছিল, সে রাত্রেও তেমনি এল, তেমনি আগুন জ্বাললে, খেলে-দেলে, তারপর নাচতে লাগল। বুড়োটা এই সব বীভৎস ব্যাপার আর দৈত্যদের বিকট চেহারা দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। সে যে গিয়ে তাদের সঙ্গে নাচবে, তার আর সাহস হচ্ছে না; কিন্তু না নাচলেও নয়, গালের আবটি তা না হলে খসবে না।

প্রাণে ভয়ও আছে, আবটি হতে মুক্ত হবার ইচ্ছেও আছে! কি করে, বলিদানের পাঁঠার মতো ভয়ে-ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে কোনও রকম করে দৈত্যদের মাঝে গিয়ে হাজির হল। বুড়োকে দেখে দৈত্যরা কাঠুরে এসেছে মনে করে আনন্দে হল্লা করে উঠল, বললে, "কাঠুরে ভায়া! আর কেন, নাচ শুরু করে দাও।"

বুড়ো তখনও কাঁপছে। সেই সব ভয়ঙ্কর মূর্তি চোখের সামনে দেখে তার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেছে; সে কি তখন নাচতে পারে? দেরি দেখে দৈত্যরা আবার চেঁচিয়ে বললে, "নাচ, নাচ; আমাদের ফূর্তি যে সব জল হয়ে গেল! রাত যে শেষ হয়!"

বুড়োর পা তখনও থর-থর করে কাঁপছে। নাচবার জন্যে যেই একপা তুলেছে, অমনি ধুপ করে মাটিতে পড়ে গেল,—উঠে নাচবার আর শক্তি রইল না। তাই দেখে দৈত্যরা ভারি চটে বললে, "যাও, তোমার আর নাচতে হবে না। এই নাও, তোমার জিম্মের জিনিস ফিরিয়ে নাও।" এই বলে বুড়োর আর-একগালে কাঠুরের আবটা চট্ করে বসিয়ে দিলে। দেখতে দেখতে সকাল হয়ে এল। দৈত্যরাও চলে গেল। তখন বুড়ো কি করে, একটি গালে আব ছিল, এখন দুগালে দুটি আব নিয়ে মনের দুঃখে কাঁদতে-কাঁদতে গ্রামে ফিরে এল। গ্রামের ছেলেরা এই মজা দেখে হো-হো করে হাততালি দিতে লাগল।

১৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩১৫



চিত্রলেখা

গিরিবালা দেবী

বাল্যকাল হইতেই শ্রীমান শিশিরকুমার অতিশয় স্ত্রী-বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের চৌদ্দপুরুষ হইতে ছাপান্ন পুরুষের মধ্যে একটি লোকও যে উক্ত জাতির উপর কোনওরূপ বিতৃষ্ণ ভাব মনের মধ্যে পোষণ করিয়া গিয়াছেন—এমন প্রমাণ বংশাবলীর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শিশিরের পূজ্যপাদ পিতামহ-প্রপিতামহগণ যে কৌলীন্যের দোহাই দিয়া নারীর প্রতি একটু বেশি রূপেই পক্ষপাত দেখাইয়া গিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন আজও সংসার হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। সেই বংশের একমাত্র বংশধর হইয়া তাহার এ রমণীবিদ্বিষ্টতায় আত্মীয়-বন্ধুরা নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন। মাতা দয়াময়ী কালীবাড়ি জোড়া পাঁঠা ও সিদ্ধেশ্বরীতলায় বুক চিরিয়া রক্ত বলিদানেব মানত করিয়াও পুত্রের দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে তাহাকে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না। শিশিবের ষোলো বৎসর বয়স হইতে বিবাহের উদ্যোগ আরম্ভ হইয়া তেইশ বৎসরও যখন অতর্কিতভাবে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল, তখনও নববধূ গৃহে আসিল না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের তৃষ্ণাতুর নয়ন-সম্মুখে এই ছেলেটি লেখাপড়া করিয়া, হাসিয়া-খেলিয়া দিব্য দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। পুত্রের বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে তাহাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য মার আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা আরও বর্ধিত হইতে লাগিল। মায়ের অনুযোগ অভিযোগ ও অশ্রুবর্ষণ দেখিয়া পুত্র, বন্ধুমহলে নিজের অভিমত প্রকাশ করিল, সে প্রাণান্তেও স্ত্রীজাতিকে শ্রদ্ধা করিতে পারিবে না; ভালোবাসিতে পারিবে না। শুধু মাকে সুখী করিবাব জন্য সে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু পাত্রী নোলক পরা অশ্রুভরা পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতা বালিকা হইলে চলিবে না। সে হেলেনার ন্যায় রূপসী হইবে; শেলী-বায়রন যাহার কণ্ঠে বিরাজ করিবে—যাহাব গতি উদ্দাম বসন্ত পবনের মতো চঞ্চল ও মনোমদ, যাহার হাসিতে চন্দ্রকিবণ বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে, তেমনি একটি নবযুবতী পাইলে তবেই সে তাহার মহামহিমান্বিত স্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে; নচেৎ নহে। ইংরাজিনবীশ পুত্রের অদ্ভুত খেয়ালের কথা শুনিয়া মা ইংরাজিশিক্ষার 'মুখে আগুন' এই অভিশম্পাত দিয়া নীরবে চক্ষু বুজিলেন।

॥ ২ ॥

বাঙালির আশাতীত চাকরি ডিপুটিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া শিশির যখন বারো গ্রামের তেরো নদীর জল পান করিয়া বেড়াইতে লাগিল, তখন আর শিশিরের শুভার্থী বন্ধুবর্গ ঘরের কোণে তাম্রকূট সেবনে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। মাসিক আড়াইশত টাকা উপার্জকের শূন্যগৃহের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্মরণ করিয়া তাঁহাবা বিচলিত হইয়া উঠিলেন। প্রোষিতপুত্রা পতিহীনা দয়াময়ীয় গৃহটি গ্রামের বৃদ্ধ পরামর্শদাতাদের কলধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। পুত্রের বিবাহে উদাসীন মাতা যে অচিরাৎ খাস বিলাতি মেমসাহেবের শ্বশ্রূপদে অধিরূঢ়া হইয়া পূর্বপুরুষগণের অনন্ত নরকের সুব্যবস্থা করিবেন; একথা বলিয়া স্নেহময়ী মাতার হৃদয়ে ভীতি ও ভাবনার সৃষ্টি করিতেও কেহ পশ্চাৎপদ হইলেন না। এতগুলি আত্মীয়স্বজনের প্ররোচনায় দয়াময়ী পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কয়েক দিনব্যাপী অনেক যুক্তিতর্কের পর বাড়িতে শুভ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

মার সাঙ্ঘাতিক পীড়ার সংবাদ দিয়া শিশিরের বাড়ি আসিয়া যাহা দেখিল ও শুনিল—তাহাতে তাহার ক্রোধবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই দিনই গোধূলিলগ্নে বিবাহ। কাজেই বিবাহ স্থগিত করিবার কোনও উপায় শিশিরের হাকিমী বুদ্ধিতে যোগাইল না। নিদারুণ লজ্জা ও অপমানের মধ্যে মাকে নিক্ষেপ করিয়া আশু বিপদের হাত হইতে পলায়নের ইচ্ছাও তাহাকে প্রণোদিত করিতে পারিল না। সে তুষের আগুনের মতো গুমরাইয়া-গুমরাইয়া মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিল, "আপাততঃ সে মার ইচ্ছাই পূর্ণ করিবে; বিবাহান্তে স্ত্রীর মুখের দিকে না-চাহিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিয়া মার ছলনার প্রতিশোধ লইবে"। কিন্তু শুভদৃষ্টির পর হইতে শিশিরকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হইল। চির-স্ত্রীবিদ্বেষী শিশির চতুর্দশী রমার নোলক-শোভিত চন্দনচর্চিত লজ্জাবনত সুন্দর শান্ত মুখখানি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সে মুখ এত কোমল, এত মধুর, স্নিগ্ধ-লাবণ্যে মণ্ডিত—একবার দেখিয়া তৃপ্তি হয় না। তাহার কর্ণাভরণের ঈষৎ দোলন, নোলকেব মৃদু সঞ্চালন, বিশাল নযনের সলজ্জ আনত বিলোকন, মধুনিষ্যন্দী কণ্ঠের অর্ধবিজড়িত সম্ভাষণ অবগুণ্ঠনাকর্ষণের বিচিত্র ভঙ্গিটুকু শিশিরের শিরায়-শিরায় ছুটিতে লাগিল। সে বিস্মিতহৃদয়ে ভাবিতে লাগিল—মানবদেহে এ নবীন সৌন্দর্যের মোহন সমাবেশ ভগবান কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন? সে সভয়ে উপেক্ষার সহিত যাহা হইতে এত কাল দূরে-দূরে কাটাইতে চাহিয়াছিল, তাহারই মধ্যে এ অমৃতপ্রস্রবন অনুভব করিয়া শিশির আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

"পাকস্পর্শ" "অষ্টমঙ্গল" প্রভৃতি বিবাহের অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদিত হইবার পর কর্মস্থলে যাইবার পূর্বদিন শিশির সঙ্কোচের সহিত মাকে গিয়া বলিল,—"বউকে আমি নিয়ে যেতে চাই। এখন ওর শিক্ষার সময়। আমি বাড়িতে মাস্টার রেখে ওর লেখা পড়ার ব্যবস্থা করব"। আত্মীয়-বান্ধবগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বামীর সহিত সুদুর বিদেশে যাইবার কথা শুনিয়াই হউক আর মাস্টারের নিকট নূতন করিয়া লেখা-পড়া শিখিবার আশঙ্কাতেই হউক, রমা শাশুড়ির কোলে মুখ লুকাইয়া অশ্রুসিক্তকণ্ঠে কহিল, "আমি তোমার কাছ থেকে কোথাও যাব না মা"! মা সস্নেহে বধূর মুখ চুম্বন করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া পুত্রকে কহিলেন,— "এখনই অতদূরে একটি বউকে পাঠাতে পারব না, যার বাপ টোলের বড় অধ্যাপক, তাঁর মেয়েকে লেখাপড়া শিখাবার জন্যে ভাবতে হবে না। আর গৃহস্থ ঘরের বউকে শুধু লেখাপড়া শেখানই কাজ নয়। রান্নাবান্না কাজকর্ম সবই যে শিখতে হবে।" মার কথায় নিরাশচিত্তে শূন্যহৃদয় শিশির কর্মস্থলে চলিয়া গেল।

॥ ৩ ॥

মানুষ সংসারে যে রসের আস্বাদ-হইতে একেবারেই বঞ্চিত থাকে, তাহাকে অল্পে-অল্পে সেই রসের আস্বাদ গ্রহণ না-করাইয়া হঠাৎ রসের সমুদ্রে ছাড়িয়া দিলে সে যেমন ঐকান্তিক আগ্রহে সেই রসসাগরে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে, নারী-বিদ্বেষী শিশিরের অবস্থাও তেমন হইয়া দাঁড়াইল। তাহার এখন আর কাজকর্মে তেমন উৎসাহ নাই। নিভৃতে বসিলেই মনে পড়ে;—পল্লীর শান্ত শীতল তরুশ্রেণীবেষ্টিত তাহাদের গৃহপ্রাঙ্গণে বিবাহসভা; সেই সান্ধ্য সুষমাভূষিত চন্দ্র-তারা খচিত কৌমুদীস্নাত নীলাম্বরতলে কিশোরী রমার প্রস্ফুটিত পদ্মসন্নিভ ক্রীড়াবিজড়িত অপূর্ব মাধুর্যময় সুন্দর মুখখানি; আর যুগল-নয়নের ঔৎসুক্যপূর্ণ আনত স্নিগ্ধ স্থির দৃষ্টি। আরও মনে পড়ে—সুসুপ্ত গভীর রজনীর নীরবতার মধ্যে দূরাগত বীণাধ্বনিবৎ রমার অর্ধস্ফুট অমিয়মধুব কথাগুলি।

ডিপুটিগিরি চাকরিতে ছুটির বড়ই অভাব। একবৎসরে যে কয়েকটি দিন ছুটি পাওনা ছিল, তাহাও বিবাহ ব্যাপারে শেষ হইয়া গিয়াছে। কাজেই বেচারি শিশির নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অগত্যা কাগজের বুকে—

'আমার প্রিয়ার মুখ, চাঁদের সমতুল,
হাসিতে ঝরিয়া পড়ে রাশি-রাশি ফোটা ফুল''। ইত্যাদি—

কবিতা লিখিয়া কোনরূপে মনমরা হইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। তার বড় সাধ হইত, খুব লম্বা-চওড়া করিয়া একখানি প্রেমলিপি প্রিয়তমার নিকট লিখিয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভাবরাশি কথঞ্চিৎ হালকা করিয়া ফেলে; কিন্তু সাহস হইত না। তাহার প্রিয়ার বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে শিশিরের মনের মধ্যে একটা খটকা ছিল। বিবাহের পর কয়েকটি বজনীর স্বল্প আলাপের মধ্যে স্ত্রীর বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় শিশির ভালোরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। সাধারণের নিকট তাহার যশঃসূর্য এখনও অস্তোন্মুখ হয় নাই, পরাজয়ের জল-জীয়ন্ত নিদর্শনও প্রকাশ পায় নাই। এরূপ অবস্থায় বর্ণজ্ঞানশূন্যা মূর্খ স্ত্রী যদি তাঁহার প্রেমপত্রেব মর্ম নিজে উপলব্ধি করিতে না-পারিয়া অপরের হাতে অর্পণ করে, তাহা হইলে লজ্জা রাখিবার যে ঠাঁই থাকিবে না। এই সব ভাবিয়া-চিন্তিয়া একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও শিশির প্রেমপত্র লিখিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল। কিন্তু বেশিদিন বিরহী শিশিবকে বিরহবেদনা উপভোগ করিতে হইল না। হঠাৎ বাড়ি হইতে খবর আসিল "তোমার মাতা অত্যন্ত কাতর, অবিলম্বে চলিয়া এস।" এবার মার অসুস্থ সংবাদের শিশির ততটা বিচলিত হইল না, কারণ মাব কাতরতার সংবাদের ফল একবার সে হাতে-হাতেই লাভ করিয়াছে। সে কুলীনের ছেলে, লক্ষ্মীলাভের পর এবার তো সরস্বতীলাভেব সম্ভাবনা নহে? মনে-মনে কৌতূহলী হইয়া শিশির বাড়ি আসিয়া দেখিল, সত্যই মা কঠিন রোগশয্যায় শায়িতা। রমার অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষা—শিশিরের চেষ্টা-যত্ন, কিছুতেই দয়াময়ীকে সংসারে বাঁধিয়া রাখা গেল না। মাতৃবিয়োগজনিত শোক শিশিরের বক্ষে বড়ই বিষম হইয়া বাজিল, কিন্তু ভূলুণ্ঠিতা রমার "মা" "মা' রবে আকুল আর্তনাদে নিজের হৃদযব্যথা ভুলিযা তাহাকে প্রকৃতিস্থ হইতে হইল। যাহারা ইংরাজি লেখাপড়া শিখিয়া মনকে প্রশস্ত করিতে পারে নাই, একটি বৎসরের ঘনিষ্ঠতায পরের মাকে তাহারা এমন করিয়া যে ভালোবাসিতে পারে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া শিশির বিস্মিত হইল। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "কেঁদনা রমা, মা যেমন তোমায় স্নেহ-যত্ন করতেন, আমিও তাই করব"।

॥ ৪ ॥

মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটাইয়া শিশির রমাকে লইয়া কার্যক্ষেত্রে প্রস্থান করিল। দুই দিন না যাইতে-যাইতে তাহার বিশৃঙ্খল ঘরকন্নার মধ্যে এমন একটি লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়া উঠিল—শিশির তাহা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল। রান্না হইতে চাযের পেয়ালাটিতে—মায পান সাজার মধ্যেও নূতন একটি আস্বাদ অনুভব করিয়া সে তৃপ্তিপূর্ণহৃদয়ে ভাবিত—"আহা এমন গুণবতী স্ত্রী, লেখাপড়া শিখিয়া ইহার মন যদি উদারতা ও প্রশস্ততা লাভ করিবার অবসর পাইত, তাহা হইলে কত আনন্দের কারণ হইতে পারিত।" সেদিন নিভৃতে স্ত্রীকে নিকটে বসাইয়া শিশির স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল,—'রমা, আমার বড় সাধ হয় তুমি লেখাপড়া শেখো। খুব ভালো করে ইংরাজি শিখলে দেখতে পাবে, তার ভিতর কত আনন্দ কত সৌন্দর্য লুকান আছে—তাতে মন কত উন্নত হবে।" রমা সলজ্জ হাসি হাসিয়া

মৃদুকণ্ঠে কহিল "তুমি আমায় যা শিখতে বলবে তাই শিখব; কিন্তু মাস্টারের কাছে পড়তে পারব না। তোমার কাছেই পড়ব। আমার সংস্কৃত খুব ভালোলাগে, মনে হয় ওর ভিতর যা আছে, আর কোথাও বুঝি তা নেই।" স্ত্রীর কথায় শিশিব একটু বিজ্ঞতার হাসি হাসিল মাত্র। কিন্তু কয়েক দিনের পর কোনও কারণবশত স্ত্রীর বাক্স খুলিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। কালিদাসের "বাণভট্টের" ও "ভবভূতির" বাছা-বাছা সংস্কৃত কাব্যগুলি রমার বাক্সের অভ্যন্তরে সযত্নে সজ্জিত রহিয়াছে। এককলম বাংলা লিখিতে বসিলে সাতবার অভিধান না-খুলিয়া যে কথার ভাবার্থ শিশিরের উর্বর মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবার পথ পায় না, সেই বড়-বড় শব্দ লইয়া সংস্কৃত বাংলা-সংমিশ্রিত কত গদ্য-পদ্য রমা রচনা করিয়াছে। শিশির যাহাকে বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ ভাবিয়া রাখিয়াছিল—আজ তাহার এ গুপ্ত বিদ্যার পরিচয় পাইয়া সে পুলকিতান্তরে মায়ের কথা স্মরণ করিল—"যার বাপ টোলের বড় অধ্যাপক"—ইত্যাদি।

॥ ৫ ॥

একটি ডাকাতি মোকদ্দমার তদন্ত করিবার জন্য শিশিরকে মফঃস্বলে যাইতে হইল। দশ-বার দিন পর সে ফিরিয়া আসিলে তাহার সদাপ্রফুল্ল মুখখানিতে চিন্তার ছায়াপাত দেখিয়া রমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে আশঙ্কার ঝটিকা বহিল। সে উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "তোমার শরীরটা কি ভালো নেই? না—মনটাই খারাপ হয়েছে? আমায় বলবে না?" রমার ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা দেখিয়া-দেখিয়া শিশির যাহা বলিল, স্বামীর চরিত্রের প্রতি অপরিসীম বিশ্বাসবতী সরলহৃদয়া রমা প্রথমে তাহা উপহাস বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেও সেটা উপহাস হইয়া দাঁড়াইল না। শিশির অনুতাপজীর্ণ সকরুণকণ্ঠে যা বলিল, তাহার সারমর্ম—" সে মফঃস্বলে তাহার চিত্রকর বন্ধু যতীনদার বাড়ি গিয়া তাঁহার অনূঢ়া ভগিনীটিকে দেখিয়া হৃদয়খানি হারাইয়া আসিয়াছে। সে বহু যত্ন বহু চেষ্টায় কিশোরী চিত্রলেখাকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে পারিতেছে না। কয়েক দিনের দর্শনেই শিশিরের হৃদয়ে পরতে-পরতে চিত্রলেখার অবয়ব গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তাহাকে না-পাইলে শিশিরের সবই বৃথা—সবই তুচ্ছ। হৃদয় ভাঙিয়া গেলেও সে চিত্রলেখাকে হৃদয় হইতে মুছিতে পারিবে না। তাহাকে এ জীবনে না-পাইলে সে পর জীবনের জন্য তাহারই চিন্তা করিতে-করিতে নিদাঘে শিশির বিন্দুর মতো শুকাইয়া যাইবে।" শিশিরেব কথা শুনিয়া প্রথমে রমা ভাবিয়াছিল—স্বামী বুঝি তাহার মনের প্রশস্ততার পরীক্ষা লইতেছেন। কিন্তু পরে বুঝিল, সত্যই তাহার কপাল পুড়িয়াছে। তাহার সৌভাগ্যসূর্য মেঘাবৃত হইয়াছে। রমা অনেক ভাবিল,—নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া অনেক অশ্রু বর্ষণ করিল। দেবতার উদ্দেশে হৃদয়ের অজস্র নীরব নিবেদন প্রেরণ করিল। কয়েকদিনব্যাপী ভাবনা চিন্তার পর তাহার মন অনেকটা প্রশান্ত হইল। সে মনে-মনে স্থির করিল—স্বামীর সুখের জন্য—স্বামীর তৃপ্তির জন্য সে চিত্রলেখাকে বিবাহ করিতে স্বামীকে সম্মতি দিবে। বলিবে,—"প্রভু আমার, তোমার সুখেই আমার সুখ,— তোমার শান্তিতেই আমার শান্তি; আমি কোন ছার যে আমার জন্যই, তোমার বাসনা অপূর্ণ রহিয়া যাইবে। আমি তোমাকে সুখী করিব। আমার জীবনযজ্ঞে আহুতি দিয়াও তোমার সাধ পূর্ণ করিব।"' স্বর্গীয় হাসিতে অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া ধীর শান্ত কণ্ঠে রমা যখন শিশিরকে চিত্রলেখার সহিত বিবাহের অনুমতি প্রদান করিল এবং ইহাতে একটুও দুঃখিত

হইবে না বলিল,—তাহার কথা শুনিয়া শিশির বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। রক্তমাংসে গড়া ক্ষুদ্র মানুষ কি এ সংসাবে এতটা স্বার্থ—শুধু একজনের সুখের জন্য পরিত্যাগ করিতে পারে? শিশির শ্রদ্ধা-ভক্তি-পূরিত হৃদয়ে ক্ষণকাল মহিমাময়ী দেবী প্রতিমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া স্ত্রীর হাতখানি আপনার হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া কোমলকণ্ঠে কহিল, "রমা, তুমি দেবী; আমি আজ চিত্রলেখাকে ভালোবেসেছি বটে; কিন্তু তোমাব এ স্বার্থত্যাগের জন্য তোমাকেও একদিন পুরস্কার দেব"।

॥ ৬ ॥

ছোট বোনটির বিবাহ উপলক্ষে রমাব পিতা যখন তাহাকে লইতে আসিলেন, সম্পূর্ণ ইচ্ছা না-থাকিলেও রমা পিতাকে ফিরাইয়া দিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত যাতনারাশি অন্তরের অন্তস্থলে লুকাইয়া তাহাকে হাসিমুখেই বোনের বিবাহে যাইতে হইল। বিদায়ের অনতিপূর্বে স্বামীর পায়ে প্রণতা হইয়া রমা অশ্রুপূরিত কণ্ঠে কহিল,—"তুমি চিত্রলেখাকে পেয়ে আমায় একেবারেই ভুলে যেয়ো না। একটু মনে করে আবাব এসো"। বমা আর বেশি কিছু বলিতে পারিল না। বার-বার করিয়া অশ্রুবিন্দু তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া ঝরিযা পড়িল। আদরে স্ত্রীর অশ্রু মুছাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া শিশির তাহাকে বিদায কবিল।

বোনের বিবাহব্যাপার মিটিয়া গেল, তবুও স্বামীর নিকট হইতে একখানা চিঠি আসিল না—বা একটু আহ্বানবাণী শুনিতে পাইল না; ইহাতে বমা মর্মে-মর্মে আহত হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর তো ভালো আছে? তিনি কি চিত্রলেখার চিন্তায় সত্যই রমাকে বিস্মৃত হইয়াছেন? কিন্তু হায়, রমা যে এখনও লক্ষ যোজন দূরে বসিয়া সূর্যমখী ফুলেব মতনই তাহার প্রিয়তমের আশাপথ চাহিয়া উন্মুখ হইযা রহিয়াছে। যাঁহার সুখের জন্য রমা সর্বস্ব ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে,—যাঁহার হাসি মুখের জন্য রমা স্বহস্তে হৃৎপিণ্ডছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছে,—তিনি যদি রমাকে একবারও মনে না করেন—তাহা হইলে সে বাঁচিবে কেমন করিয়া?

সেদিন অপরাহ্নে রমার বাঞ্ছিত দ্রব্য মিলিল। নিভৃতে বসিয়া কম্পিতবক্ষে রমা স্বামীর পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। শিশির লিখিয়াছে,—"আমার হৃদয়রাজ্যের রানি রমা, তোমার ইচ্ছায় ও আদেশে আমি চিত্রলেখাকে বিবাহ করিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছি। এই সব গোলমালে যথাসময় তোমাকে চিঠি লেখা হইয়া উঠে নাই। রাগ করো না লক্ষ্মী? তুমি কাছে না থাকিলে আমার সব শূন্য, সব বৃথা। চিত্রলেখা আমার গৃহের আনন্দরূপিণী হইলেও তুমিই আমার হৃদয়ের যত্ন। তুমি সত্বর চলিয়া এসো। তোমাকে অবিলম্বে রাখিয়া যাইবার কথা তোমার দাদাকেও লিখিলাম। ইতি একান্ত তোমারই শিশির"।

রমা চিঠিখানা বার-বার পাঠ করিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল। ধীরে-ধীরে তাহার দুইটি নয়ন হইতে অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। স্বামীর এ অমৃতসাগরে এত স্নেহ—এত সোহাগ-মাখানো চিঠিখানা,—হায়, চিত্রলেখার কথা যেন হলাহল ঢালিয়া দিল।

রাত্রে আহারের পূর্বে অসময়ে কন্যাকে শয্যায় শয়ানা দেখিয়া মা ভাবিলেন—মেয়ে বুঝি মাতৃবক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কায় ব্যথিত হইয়াছে। স্নেহময়ী মার চক্ষেও জল আসিল। তিনি কন্যার মস্তকে হস্ত বুলাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "সেখানে যেতে হবে বলে দুঃখ কি মা, সেই যে তোমার আপন ঘর-সংসার—আমরা আর ক'দিন"?

॥ ৭ ॥

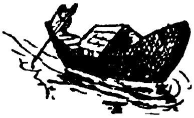
নিজেব চিরন্তন ঘর-সংসারের মধ্যে রমা আজ শঙ্কিত-কম্পিত-চরণে প্রবেশ করিয়া দেখিল—সম্মুখেই স্বামী। তাহার হৃদয় ও মন বিষম বেদনাভারে নিপীড়িত হইয়া উঠিল। ইনি সেই স্বামী এক চন্দ্রোজ্জ্বল সন্ধ্যায় মুগ্ধা কিশোরী যাঁহাকে তাহার সর্বস্ব অর্পণ করিয়া মনে-মনে যাঁহাকে আপনার—একমাত্র অতি আপনার—জগতের সর্বাপেক্ষা আপনার ভাবিয়া যাঁহার তরুণ মূর্তি হৃদয়ের নিভৃত আবাসে অঙ্কিত করিযাছিল;—তখন কে জানিত—তাহার কল্পনার স্বর্গ, ধূলি-ধূসরিত হইয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইবে? কে জানিত—তাহার হাস্যোজ্জ্বল বদন মলিনতায় ঢাকিয়া ফেলিবে?

রমার চিন্তাপূর্ণ, ব্যথিত মুখের দিকে চাহিয়া শিশির কহিল, "এমন করে দাঁড়িয়ে কেন রমা? এসো, আমার ঘরে এসো"। রমা অস্ফুট কণ্ঠে কহিল,—"সে চিত্রলেখা কোথায়?" "চিত্রলেখা আমার ঘরেই আছে। সেখানে গেলে তাকে দেখতে পাবে" বলিয়া শিশির পুষ্পস্তবকের মতন সুকোমল হাতখানা ধরিয়া তাহাকে নিজের দিকে টানিয়া লইল। বেপমান অসংযত বক্ষে স্বামীর পশ্চাত তাঁহার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া রমা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শিশির দুইহাতে তাহার নত মুখখানি তুলিয়া বলিল, "চেয়ে দেখো রমা, চিত্রলেখা এসেছে—এই তোমার সতীন"। রমা চক্ষু তুলিয়া বিস্ময়বিজড়িত নয়নে দেখিল—তাহার পিছনের দেয়ালে রক্ষিত একটি অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরীর অপূর্ব তৈল চিত্র। সে ছবিখানি এতই অনির্বচনীয় সুন্দর যে, জীবন্ত বলিয়া উপলব্ধি হয়। সে যেন রমার পানে চাহিয়া সকৌতুকে হাসিতেছিল। একখানি সুনীল বসনে আলেখ্যের সুকুমার তনু বেষ্টিত রহিয়াছে। ভ্রমরকৃষ্ণকেশকলাপ গুচ্ছে-গুচ্ছে এলায়িত হইয়া বক্ষস্থল ও বদনমণ্ডলের কিয়দংশ আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। একটি পুষ্পিত বৃক্ষের নিকটে দাঁড়াইয়া—পুষ্প চয়ন করিতে যাইয়া তরুণী তাহার বঙ্কিম গ্রীবা ঈষৎ হেলাইয়া মৃদু-মন্দ হাসিতেছে। মাথার উপরে প্রভাতের নির্মল আকাশে সবে প্রথম অরুণোদয়ের সূবর্ণরেখা শাখাপত্রনিবদ্ধ তরুশ্রেণীর মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। দুইখানি পদপল্লব বক্ষে ধরিয়া শ্যামল তৃণদল কোমল আস্তরণ বিছাইয়া দিয়াছে। অদূরে তরঙ্গময়ী নদীটি আঁকিয়া-বাঁকিয়া ধীর মন্থরগমনে বহিয়া যাইতেছে। বিশ্ব যেন পুলকিত অন্তরে এই নিষ্পন্দ সুন্দরীর ধ্যানমূর্তির দিকে নির্নিমেষনয়ণে চাহিয়া আছে।

রমার বিমুগ্ধ নয়নের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া শিশির মৃদুস্বরে বলিল, "এই চিত্রলেখা, একে চিনতে পেরেছ রমা?" রমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—চিনিতে পারে নাই। শিশির হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠে বলিল, "তুমি এমন বোকা; চিনতে পার নাই? ভালো করে চেয়ে দেখ"। রমা মুগ্ধহৃদয়ে আবার সেই ভুবনমোহিনীর আলেখ্যটির দিকে চাহিয়া রহিল। সহসা তাহার বহুদিনের বিস্মৃত কথার একটি আভাস হৃদয়কোণে জাগিয়া উঠিল। বিবাহের অনতিপূর্বে একদিন সে প্রভাতে স্নান করিয়া সঙ্গিনীদের সহিত নদীর সন্নিকটে বাগানে মায়ের শিবপূজার ফুল তুলিতে গিয়াছিল। আসন্ন বিবাহের কথা লইয়া সখীরা তাহাকে উপহাস করায় সে অতিষ্ঠ হইয়া পালাইতে গিয়া দেখিতে পাইয়াছিল—বৃক্ষের অন্তরালে "ক্যামেরা" লইয়া একটি অপরিচিত যুবক দাঁড়াইয়া আছে। পরে তাহার পরিচয়ও পাইয়াছিল,—তিনি তাহার ভাবী স্বামীরই অন্তরঙ্গ বন্ধু। "বড় চিত্রকর" বলিয়া তাঁহার খ্যাতির জন্যই গ্রামের জমিদারতনয়ার চিত্র প্রস্তুত করিতে আসিয়াছিলেন। তিনিই কি রমার অজ্ঞাতসারে তাহার

ছবি লইয়া এ উপন্যাসের সৃষ্টি করিয়াছেন? কিন্তু এ কি রমার ছবি?—না—না, সে এত সুন্দর হইবে কেমন করিয়া? এ তাহার ছবি নয়! শিশির স্নেহবিগলিত কণ্ঠে কহিল, "তোমায় আর ভাবতে হবে না রমা এ ছবি তোমারই। যতীনদা আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে শুনেই গোপনে এ ছবি তুলে নিয়েছিলেন। অনেক দিন ধবে অনেক পরিশ্রমের পর কদিন হল এটা শেষ করে দিয়েছেন। বমা, তুমিই জয়লাভ কবেছ। স্ত্রী জাতির উপর আমার সন্দেহ ছিল,—তারা বুঝি নিজের স্বার্থ ভুলে ভালোবাসতে পারে না, এখন বুঝতে পেরেছি, এ অধঃপতিত দেশের এখনও তোমরাই গৌববের জিনিস। তোমরাই দেবী।" শিশির দুই বাহু মেলিয়া আনন্দে বোমাঞ্চিত স্ত্রীকে বক্ষে চাপিযা তাহাব ললাটে একটি স্নেহ চুম্বন মুদ্রিত করিয়া কহিল,—"রমা, চিত্রলেখা আমার, আজ তোমার এই পুরস্কার"।

৩১শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২৮



পরাজয়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"যোগেন! বাবা! তোমাকে এ কাজটি করতেই হবে—"এই বলিয়া বৃদ্ধা যোগেন্দ্রর মস্তকে ধীরে-ধীরে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

বৈশাখ মাস। নবপত্রকিশলয়ে, নবীন শ্যামলতায় প্রকৃতিদেবীর নীলাঞ্চল অরুণ-আলোকে ঝলমল করিতেছে। পল্লীপথে বটের ছায়ায় বসিয়া সূর্যের খরকর হইতে রাখালবালকেরা আত্মরক্ষা করিতেছে। ক্বচিৎ দুই-একটা কাক বা ফিঙের চিৎকারে মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল। পথের ধূলা তাতিয়া আগুন হইয়াছে। তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বৃদ্ধা শঙ্করী যোগেন্দ্রর গৃহে আসিয়াছেন। সে সময়ে যোগেন্দ্র পরীক্ষা দিয়া বাড়িতে বসিয়াছিল। বৃদ্ধা তাহাকে ধরিয়া বসিলেন, "তোমাকে বাবা! কমলকে তার শ্বশুরবাড়িতে রেখে আসতে হবে।"

কমল বৃদ্ধার একমাত্র কন্যা-পূর্ণযৌবনা। সে পিতৃগৃহে অবস্থান করে, ইহা কোনও ক্রমেই আর সঙ্গত বোধ হইতেছিল না; তাই বৃদ্ধা যোগেন্দ্রকে অনুনয় করিতেছিলেন।

যোগেন্দ্র বলিল, "মাসিমা, তুমি কেন তাহাকে আপনা হইতে পাঠাইয়া দিতেছ?" বৃদ্ধা যোগেন্দ্রের কথার উত্তর দিবার পূর্বে অঞ্চলে চোখের জল মুছিলেন। তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যেমন অদৃষ্ট করে এসেছি, তেমনই ভোগ তো করতে হবে বাবা।"

শৈশবে কমলের সহিত যোগেন খেলা করিয়াছে। কতদিন খেলাঘরে তার বর সাজিয়াছে। কমলও কতদিন গৃহিণীর অভিনয় করিতে গিয়া বহুমূল্য অলঙ্কার চাহিয়া যোগেনকে বিপন্ন করিয়া অভিমান করিতে ছাড়ে নাই। সেই কমলাকে আজ তার শ্বশুরালয়ে উপযাচক হইয়া রাখিয়া আসিবার ভার পড়িল কিনা যোগেনের উপর! সে অন্যমনস্ক হইয়া অনেকক্ষণ কত কি চিন্তা করিল। কমলের জননী গ্রাম-সম্পর্কে যোগেন্দ্রের মাসি হন। যোগেন্দ্র এখন বড় হইয়াছে—সংসারের ভালোমন্দ অনেকটা বুঝিতে শিখিয়াছে। এরূপ ভাবে কমলকে তাহার শ্বশুরবাড়িতে দিয়া আসিবার কোনও বিশেষ কারণ সে দেখিতে পাইল না; সে এই প্রস্তাবে একটা অমর্যাদার ভাব অনুভব করিল। সে দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, "না মাসিমা, তা কিছুতেই হতে পারে না। আমরা আপনা হতে কখনই কমলকে, তার শ্বশুরবাড়ি রেখে আসতে যাব না।" বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, "না, বাবা, তুমি বুঝ না। আমি বাকি দিন কটা কাশী গিয়া বাবা বিশ্বনাথের চরণসেবা করে কাটিয়ে দেব। কমলের শাশুড়ি যখন তাহার বউয়ের কোনও সংবাদই নিলেন না, আর কমল কিছু ছেলেমানুষটি নেই, তখন তাকে না পাঠাইয়া কি করি, বলো?" যোগেন্দ্র অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া ধীরে-ধীরে বলিল, "মাসিমা, না হয় তুমি আর দিন কতক থাকিয়া যাও। কমলকে দু'মাস-ছ'মাস, পরে তো তাঁহারা আপনারাই লইয়া যাইবেন।"

বৃদ্ধা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সে আশা বৃথা; আজ সাত বৎসর বিবাহ হয়েছে, এর মধ্যে সেই বিবাহের পর যা দুইবার অভাগীর ভাগ্যে শ্বশুর-ঘর ঘটিয়াছে।"

"তারা কমলকে নিয়ে যেতে চায় না কেন?"

'তাঁরা বলেন, জামাই যখন বাড়ি এসে থাকবে, তখন বউ লইয়া যাইবেন।"

"জামাই কি বাড়ি আসে না?"

"কি জানি বাবা? অনেকবার চিঠি দিয়েছি, কিন্তু একখানিও উত্তর পাই নাই। এক বৎসর পূর্বে একবার লিখেছিল, এবার বাড়ি যাইবার সময় আমাদের এখান হইতে কমলকে লইয়া যাইবে। তারপর আর কোনও সংবাদ পাঠায় নাই।"

॥ ২ ॥

বুধবার প্রাতঃকালেই নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকাখানি "দুচালা"। ভিতরে রহিলেন কমল, তাহার জননী শঙ্করী ও আর এক জন প্রতিবেশিনী। ইনি বৃদ্ধার সহিত কাশীবাস করিতে যাইতেছেন। তাহাদের গ্রাম হইতে কমলের শ্বশুবালয় প্রায ত্রিশ ক্রোশ দূর—সমস্ত পথ নৌকায় যাইতে হয়। নৌকা নাচিতে-নাচিতে চলিয়াছে। যোগেন্দ্র নৌকার ছাদের উপর বসিয়া ঊষার কনকরশ্মি-উদ্ভাসিত নদীতীরবর্তী শ্যামল বনরাজিব শোভা দেখিতে-দেখিতে ভাবিতেছে। কখনও বা তাহার মনে হইতেছে, কমলকে তাহাব শ্বশুবগৃহে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে। কখনও বা ভাবিতেছে, যদি তাঁহারা কমলকে প্রত্যাখান করেন? কমল কি তাহার বিধবা দরিদ্রা জননীর অপমাপ সহ্য করিয়া সেখানে থাকিতে চাহিবে? আবার মনে হইতেছিল, নিজের অধিকারে কেন সে বঞ্চিত হইয়া থাকিবে? যাঁহারা একদিন তাহাকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়াছেন তাঁহার আজ কোন অপরাধে তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিবেন?

মধ্যাহ্নে গঞ্জের ঘাটে গিয়া নৌকা লাগিল। ঘাটের উপর দুটি মন্দির। দূরে সারি-সারি ছোট বড় দোকান। এইখানে আহারাদির ব্যবস্থা হইল। অপরাহ্নে মাঝিরা আবার নৌকা খুলিয়া দিল। তখন মৃদুমন্দ বায়ু বহিতেছে। নদীবক্ষে অস্তমিত সূর্যের ক্ষীণরশ্মি ঝিকমিক করিতেছে। মাঝিরা মনের সুখে সাবি-গান গাহিতেছে। যোগেন্দ্র বাহিরে আসিয়া নৌকায় ছাদের উপর উপবেশন করিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বাতাস থামিয়া গেল। তখন অন্ধকার জমাট বাঁধিতেছিল। আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র কৃষ্ণমেঘ জমিতেছিল—ক্রমে সেখানি ধীরে-ধীরে বিদ্রোহীর দলের মতো বাড়িয়া উঠিল। অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল। যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "মাঝি, এখান হইতে কাঞ্চনপুর কত দূর?" কাঞ্চনপুরে কমলের শশুরবাড়ি। মাঝি উত্তর করিল, "এখনও বিশ কোশ—মোটে দশ কোশ আসিয়াছি।"

নিমেষের মধ্যে প্রবল ঝড় উঠিল। বাতাস সোঁ-সোঁ শব্দে দিগন্ত প্রকম্পিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ক্রমে ঝড় আরও ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিল। সেই ঝড়ে নৌকা তীরবেগে কোথায় ছুটিয়া চলিল। শঙ্করী মর্মভেদীস্ববে বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর! আর যন্ত্রণা দিও না। আজ নদীর গর্ভে টানিয়া লও, সকল অপমান, সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দাও। কমলকে বুকে করিয়া মরিতে পারিলে আজ আমার সুখের সীমা থাকিবে না।" তার পর মনে হইল, "না তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। পরেব বাছা যোগেন এই নৌকায় রহিয়াছে—সে কেন মরিবে? আমার এমন সুখের প্রয়োজন নাই। নারায়ণ! রক্ষা করো।"

নৌকা সহসা একটি দমকা বাতাসে জলের দিকে খুব হেলিয়া পড়িল। নৌকার উপর জল উঠিল।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে নৌকা তীরের সন্নিহিত হইল। একজন দাঁড়ি নৌকার দড়ি লইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অল্পক্ষণেব মধ্যেই একটি গাছেব গোড়ার নৌকা বাঁধিল।

দড়ি কড়কড় করিয়া উঠিল—নৌকা তীরে ভিড়িল। কমলকে লইয়া শঙ্করী কিনারায় উঠিয়া একটি বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যোগেন্দ্র ধীরে-ধীরে আসিয়া সেখানে উপবেশন করিল। দিগন্তপ্রসারিত মাঠ—নিবিড় অন্ধকার—প্রবল বাতাস—অজস্র বৃষ্টিপাত। এই দুর্যোগে চারিটি প্রাণী নিস্তব্ধ। কাহারও মুখে কথা নাই।—কেহ কাহাকেও ভালো করিয়া দেখিতে পাইতেছে না। বিদুৎস্ফুরণ কেবল অন্ধকার বাড়াইয়া দিতেছিল। কমল বলিল, "মা!"

"কেন মা? এই যে আমি, ভয় করছে?"

"না।"

"তবে কি?"

"তোরঙ্গটা, নৌকায় রয়েছে।"

শঙ্করীর মনে হইল, খানকতক কাপড়, গোটাকতক পুতুল ভিন্ন এমন কিছু মূল্যবান দ্রব্য তো তাহাতে নাই! কমল গায়ে-হলুদের দিন শ্বশুরালয় হইতে কতগুলি পুতুল পাইয়াছিল—তারপর একবার জামাতা শখ করিয়া কলিকাতা হইতে একখানি কাপড় ডাকে পাঠাইয়াছিলেন। সেইগুলি তোরঙ্গের ভিতর আছে। কাপড়খানি কমল বড় যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল। সেখানি সে পরিত না। অনেক টাকার জিনিস না থাকিলেও তোরঙ্গের জন্য মন চঞ্চল হইয়াছিল। কমলের কথা শুনিয়া যোগেন্দ্র তোরঙ্গটি আনিয়া সেখানে রাখিল। কমল সানন্দে বলিয়া উঠিল, "তুমি নিয়ে এলে যোগেনদাদা?"

ঝড়-বৃষ্টি থামিল। নৌকা আবার চলিল। পরদিন বেলা পাঁচটার সময় সকলে কাঞ্চনপুরে পঁহুছিলেন। কমলের শাশুড়ি আসিয়া কমলকে সাদরে গৃহে লইলেন। কমলের জননী সেখানে যান নাই। কমল আপনার ঘরে স্থান পাইয়া যতটা আনন্দিত হইল, জননীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তাহার অধিক দুঃখিত হইল। যোগেন্দ্র সে দিন সেখানে রহিল। পরদিন প্রভাতে কমল আসিয়া যোগেন্দ্রের সহিত দেখা করিল। যোগেন্দ্র বলিল, "কমল! আমি কলিকাতায় গিয়া তোমার স্বামীকে পাঠাইয়া দিব।" কমলের মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল সে যেন সঙ্কোচে মরিয়া গেল। বিদায়ের সময় কমল ধীরে-ধীরে বলিল, "যোগেনদাদা এঁদের বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজা হয়; সে সময় কি আসবে?" যোগেন বলিল, "আসব।"

॥ ৩ ॥

শঙ্করী কাশীবাস করিতেছেন। তিনি কাশীবাসে কমলের ভাবনা ভুলিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা বিশ্বেশ্বরই বলিতে পারেন। যোগেন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে পূর্বের ন্যায় পড়াশুনায় মন দিতে পরিতেছে না। কেবলই তাহার মনে হইতেছিল—কেন, আমি কমলের স্বামীকে পাঠাইয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলাম? এরূপ বলিবার আমার কি অধিকার আছে? আমি কমলের স্বামী শশাঙ্কবাবুর নামমাত্র শুনিয়াছি, কখনও তাঁহাকে দেখি নাই, তবে কোন সাহসে এমন আশ্বাস দিলাম? কমলকে দেখিলে বড় দুঃখ হয় আমি যেমন করিয়া পারি, শশাঙ্কবাবুর অনুসন্ধান করিব।

অনেক চেষ্টা করিয়াও সে কমলের চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিল না। ত্যাগ করিবার জন্য যতই সে চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই তাহার মন বেশি করিয়া সেই দিকে ঝুঁকিল এইরূপ অবস্থায় দুইমাস কাটিয়া গেল। যোগেন্দ্র কোনও কারণে বর্তমান বাসা ত্যাগ করিয়া আরএকটি নূতন মেসে গিয়া উঠিল! সে সময় আষাঢ় মাস। প্রায় বৃষ্টি হইতেছে। শনিবার

অনেকেই বাড়ি গিয়াছেন। দুই তিন জন লোক বাসায় আছেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে হরিহরবাবু ডাকিলেন, "ও শশাঙ্কবাবু! বেলা পড়ে এল, কখন থিয়েটারে যাবেন?"

"বড় বাদলা, কেমন করে যাই বলো? ভালো কথা, তুমি যে নীহারিকা কেমন প্লে করে দেখতে যাবে বলেছিলে, চলো না?"

"বাবা! যে বৃষ্টি!"

"না না, আজ চলো। নীহারিকার প্লে দেখলে—আর ফিরে আসতে ইচ্ছা হবে না।"

"তবে কাজ নেই ভাই, শেষে কি তোমার মতো থিয়েটারে থেকে যাব, আর তার নাম ইষ্টমন্ত্র হয়ে পড়বে।"

শশাঙ্ক থিয়েটারী সুর করিয়া বলিল, "দুর্গের ভিতরে অবস্থান করে অনেকেই যুদ্ধকৌশল ও বীরত্ব দেখিয়ে থাকে, কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করে, ফিরে আসাকেই বীরত্ব বলে।"

শশাঙ্কের নাম শুনিয়া যোগেন্দ্র মন্ত্রাকৃষ্টের ন্যায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ধীরে-ধীরে বলিল, "আপনারা কি থিয়েটারে যাবেন, বাসায় তাহলে আমি একাই থাকব?" শশাঙ্ক খুব আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিল, "না, না, আপনি একা থাকবেন কেন? আপনিও চলুন না।"

শশাঙ্গের মুখে অভিনেত্রীর প্রশংসাবাদ শুনিযা যোগেন্দ্র স্তম্ভিত হইল। বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে সে শশাঙ্কবাবুকে দেখিতে লাগিল; তাঁহার মুখে বিন্দুমাত্র লজ্জার চিহ্নও দেখিতে পাইল না। অম্লানবদনে শশাঙ্ক পুনরায় বলিল, "টিকিট কিনতে হবে না, আমি আপনাকে পাস দিব—কি বলেন?"

"আজ আমার শরীর তত ভালো নাই।"

শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি বেশভূষা শেষ করিল। জুতা পরিতে-পরিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এ বাসায় কতদিন এসেছেন?"

"দশ-বারো দিন—আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সময় পাই না—আপনাকে প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না"

"সে কথা সত্য, অনেক কাজ, বাসায় ফিরতে রাত্রি হয়ে যায়।"

"আপনি শনিবারে বাড়ি যান, বোধ হয়?"

"না—আমাদের বাড়ি অনেক দূর—শনিবার যাওয়া চলে না।"

"কোন গ্রাম?"

"কাঞ্চনপুর।"

কাঞ্চনপুর শুনিয়া যোগেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি কাঞ্চনপুর চেনেন?"

"একবার গিয়াছিলাম।"

"বটে, তবে তো আপনি আমাদের দেশ দেখেছেন।" শশাঙ্ক একাকী থিয়েটারে চলিয়া গেল।

॥ ৪ ॥

যোগেন্দ্র নিজের ঘরে গিয়া অনেকক্ষণ এই হতভাগ্যের কথা চিন্তা করিল। কমল পত্র লিখিয়া যে কেন উত্তর পায় না, তাহাও সে বুঝিতে পারিল।

ইহার কিছুদিন পরে, অনেক চেষ্টার পর একদিন সুযোগ পাইয়া সে শশাঙ্কের নিকট কমলের কথা উত্থাপন করিল। কিন্তু প্রবল বন্যার মুখে ক্ষুদ্র বাঁধের মতো, তাহার কথা কোথায় ভাসিয়া গেল। শশাঙ্ক মৃদু-মৃদু হাসিল; তাচ্ছিল্য করিয়া বলিল, "কই, আপনি থিয়েটারে যাবেন বললেন, গেলেন না?"

যোগেন্দ্র কোনও উত্তর না দিয়া নিজের ঘরে গিয়া বই খুলিয়া বসিল। কমলের কথা ভাবিয়া দুঃখে তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল—সে দোয়াত-কলম লইয়া পত্র লিখিতে বসিল। আধঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া লিখিল,—"কমল! কথা রাখিতে পারিলাম না। ক্ষমা করিও। তোমার স্বামীর সন্ধান করিয়াছি।"

যোগেন্দ্র এই অসমাপ্ত পত্রখানি ডাকে পাঠাইয়া দিল। তাহার পর ভাবিল, এরূপ পত্র লেখা ভালো হইল কি? শশাঙ্কের প্রতি তাহার অত্যন্ত ঘৃণা হইল। সেই দিন হইতে সে শশাঙ্কের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিল।

॥ ৫ ॥

তাহার পর অনেক দিন অতীত হইয়াছে। একদিন প্রভাতে যোগেন্দ্র একটি সংকীর্ণ গলির ভিতর দিয়া ছেলে পড়াইতে যাইতেছে। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলি প্রতিদিনের অভ্যাসমত চাকরের কোলে চড়িয়া, খাবারের দোকানের দিকে লইয়া যাইবার জন্য ঠেলিতেছে। দুই-একটা বড় বাড়ির দ্বারে কাকাতুয়া চিৎকার করিতে-করিতে দাঁড়ে দুলিতেছে। দরোয়ানগুলা দুলিতে-দুলিতে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়িতেছে। উড়ে বামুনগুলা গামছা স্কন্ধে ফেলিয়া চোখ রগড়াইতে-রগড়াইতে মেসের দিকে ছুটিয়াছে। যোগেন্দ্র দেখিল, একটি বড় বাড়ির দ্বারদেশে অনেকগুলি ফুটফুটে বালকবালিকা সমবেত হইয়াছে। কেহ করতালি দিতেছে, কেহ হাসিতেছে,—সেখানে যেন আনন্দের স্রোত বহিতেছে। সে দেখিল, দুই পার্শ্বে দুইটি ঘাটের উপর পূর্ণশীর্ষ সিন্দূর-চর্চিত নারিকেল ও দুই ধারে দুইটি কদলীবৃক্ষ সংস্থাপিত। বালকেরা ঠাকুরের নাম লইয়া তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে। কেহ বলিতেছে, কাল ঠাকুর আসবে। কেহ আপত্তি করিয়া বলিতেছে, না, পরশু আসিবে। আগামী পরশু যে জগদ্ধাত্রীপূজা তাহা যোগেনের মনে ছিল না। তাহার বৈশাখ মাসের কথা মনে পড়িল—তখনই যোগেন্দ্র বাসায় ফিরিল। সে যথাসময়ে কাঞ্চনপুরে যাত্রা করিল।

খুব সকালে নৌকা আসিয়া কাঞ্চনপুরের ঘাটে পঁহুছিল। সেদিন জগদ্ধাত্রীপূজা। তখন উষা। নদীর জল ছল্-ছল্ করিয়া গ্রামের তটে প্রতিহত হইতেছে। প্রভাবে পল্লীগ্রামখানি যেন লজ্জানম্র নববধূর মতো অবগুণ্ঠন দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যোগেন্দ্রের মনে পড়িল সেই দিনের কথা—কি ভয়ানক উদ্বেগ ও আকুলতা লইয়া কাঞ্চনপুরে কমলকে রাখিতে আসিয়াছিল। আজ সে ব্যাকুলতা নাই; কিন্তু আজ অন্য চিন্তায় তাহার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে।

যোগেন্দ্র মাঝির পাওনা চুকাইয়া হর্ষ-বিষাদ-জড়িত হৃদয়ে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল।

যোগেন্দ্র প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, দেবীকে প্রণাম করিল। কমলের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে, কমল তাহাকে বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দিয়া ধীরে-ধীরে বলিল, "দেরি দেখিয়া মনে হইল, বুঝি ভুলিয়া গিয়াছ।"

॥ ৬ ॥

এই সময়ে একটি অপূর্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন থিয়েটার ফেরত শশাঙ্ক নীহারিকার বাড়িতে গিয়া অত্যন্ত সুরা পান করিল। পরদিন নীহারিকার নেকলেসটি খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। নীহারিকা অম্লানবদনে শশাঙ্ককে বলিল,—"কি দেখ্‌ছ? মরণ আর কি? ভালো চাও তো হার ফেরত দাও।"

"আমি কি তোমার হার নিয়েছি, এ কথা তুমি মনে ভাবতে পার?"

"তুমি নিতে পার, আর আমি ভাবতে পারি না? ভাবলেই বুঝি যত দোষ?

"তবে আমি চোর?"

নীহারিকা বলিল, "আমি তো আর চোর বলিনি, তুমি নিজেই গায়ে পড়ে সে কথা বলছ। হার নিয়েছ, ফিরিয়ে দাও।"

"বেশ, আমায় দুদিন সময় দাও—আমি তোমার নেকলেস দিয়ে যাব।" শশাঙ্ক মুহূর্ত বিলম্ব না-করিয়া নীহারিকার গৃহ ত্যাগ করিল। দুঃখে, ক্ষোভে, ক্রোধে তখন তাহার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছিল।

জগদ্ধাত্রীপূজার ছুটিতে প্রায় সকলেই বাড়ি গিয়াছেন। বাসায় কেহই ছিল না। শশাঙ্ক আসিয়া শয্যা পাতিয়া শুইয়া পড়িল। আজিকার ঘটনা তাহার হৃদয়ে নির্দয়ভাবে আঘাত করিল। মরুভূমে মরীচিকার অনুসরণ করিয়া অবসন্নদেহে সে যেন তপ্ত বালুকায় বসিয়া পড়িল। সে "যোগেন্দ্রবাবু!" বলিয়া দুইবার চিৎকার করিয়া ডাকিল। কোনও উত্তর পাইল না। উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া দেখিল, যোগেন্দ্রের গৃহদ্বার রুদ্ধ। আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শয্যার উপর বসিয়া পড়িল। চিন্তা আর তাহার ভালোলাগিল না। অনমনস্ক হইয়া বাক্স খুলিয়া কমলের লেখা পত্রগুলি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। এখন বুঝিতে পারিল, সেগুলির ভিতর কি সরলতা—কি দীনতা—কি প্রাণস্পর্শী নিবেদন। এই সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া হাঁকিল,—"বাবু! চিঠি নিয়ে যান।" শশাঙ্কের প্রাণ অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল। আজ কি কমলের চিঠির প্রত্যাশা করা যায় না? অন্যমনস্কভাবে সে নিচে নামিয়া গেল। পত্রখানি তুলিয়া লইল। লেখাটি দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। চিঠির উপর যোগেনবাবুর নাম। শিরোনামে ঠিক কমলের হাতের অক্ষর ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে যোগেনবাবুর স্ত্রী কমলের মতো লেখেন! স্ত্রী হইলেই বুঝি কমলের মতো হইতে হয়। কমল যেমন মিনতি করিয়া পত্র লেখে, ইনিও বোধহয় তেমনই করিয়া লিখিয়াছেন। একটু সহানুভূতির জন্য—একটি করুণ আহ্বানের নিমিত্ত তখন তাহার মন ব্যাকুল হইয়াছে। একবার চিঠিখানি খুলিয়া দেখি, তারপর যেমন পত্র তেমনই করিয়া রাখিব। না, না, পরের চিঠি কোনও মতেই খোলা উচিত নয়; কিন্তু আমি তো ডুবিতে বসিয়াছি—আমার আর উচিত-অনুচিত কি? আমি পায়ে ধরিয়া যোগেন্দ্রবাবুর নিকট এই নীচ প্রবৃত্তির নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিব। এ চিঠি না পড়িলে আমি মরিয়া যাইব।

পত্র পড়িয়া শশাঙ্ক স্তম্ভিত হইয়া গেল। পত্রে লেখা ছিল—

"তোমার পত্র অনেক দিন পাইয়াছি। আমাকে পত্র দিবার প্রয়োজন ছিল না। স্বামী দেবতা—তিনি যেদিন ভালো বুঝিবেন, সেই দিন আসিবেন। আমার জন্য তুমি কষ্ট করিও না।—কমলা। কাঞ্চনপুর।"

পত্রখানি বুকে করিয়া শশাঙ্ক শয্যায় শুইয়া পড়িল। বিশ্বসংসারের সকল সৌন্দর্যে,

সকল মধুরতায়, সকল কমনীয়তায় বিভূষিতা হইয়া, পদদলিতা, অপমানিতা, উপেক্ষিতা কমল তাহার নয়নপটে ফুঠিয়া উঠিল। এত রূপ, এত মধুরতা, এমন বিনয়নম্রমূর্তি শশাঙ্ক আর কখনও দেখে নাই। একবার, দুইবার করিয়া সে বহুবার কমলের পত্রখানি পড়িল, নানারূপ চিন্তায় সে কেমন হইয়া গেল। কমল যোগেন্দ্রকে লিখিয়াছে, "স্বামী দেবতা, যখন ইচ্ছা হইবে আসিবেন।" আর আমি অসম্পূর্ণ জীবন লইয়া মাতার স্নেহে—স্ত্রীর প্রণয়ে বঞ্চিত! শশাঙ্ক ধীরে-ধীরে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। একদৃষ্টে আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। সে ভাবিল, কমলের নিকট গিয়া শাস্তি না লইলে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। সেই রাত্রেই সে কাঞ্চনপুর রওনা হইল।

॥ ৭ ॥

শশাঙ্ক পথে যাইতে-যাইতে কত কি ভাবিতে লাগিল। কতদিন পরে সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছে—কত অখ্যাতি, কত দুর্নাম মস্তকে লইয়া সেই নির্জন পল্লীপথে চিরপরিচিত গৃহে অপরিচিতের মতো সে আবার ফিবিতেছে।

তখন গোধূলির সন্ধ্যা মেঘহীন আকাশের প্রান্ত হইতে ধীরে-ধীরে ধরায় অবতীর্ণ হইতেছিল। গ্রামের বালকবালিকাগণ পূজাবাড়ির দিকে চলিয়াছে। ধূপধুনার গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। কমল আরতির নৈবেদ্য সাজাইতেছে। শশাঙ্ক চোরের মতো গৃহে প্রবেশ করিল। সমবেত প্রতিবেশিমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে তাহাকে চিনিতে পারিল; কিন্তু কেহ কিছু বলিল না। আরতির বাজনা যেমন বাজিতেছিল, তেমনই বাজিতে লাগিল।

আরতি শেষ হইল। বাজনা থামিল। একে-একে সকলে ভক্তিভরে দেবীকে প্রণাম করিল। শশাঙ্কের মা দেবীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার হারানিধি ঘরে ফিবিয়াছে। বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি আসিয়া পুত্রের হাত ধরিলেন, তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। শশাঙ্ক জননীর পদধূলি গ্রহণ করিল। উপেক্ষিতা কমল তাহাকে প্রণাম করিল। শশাঙ্ক লজ্জায় কমলের দিকে চাহিতে পারিল না।

দালানের অপর প্রান্তে স্তম্ভের ঈষৎ অন্তরালে দাঁড়াইয়া যোগেন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই মিলন উৎসব দেখিতেছিল। সে এতদিন যাহাদের জন্য দেবতার প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছে, আজ সেই কমল তাহার স্বামীর সহিত মিলিত হইতেছে দেখিয়া যোগেন্দ্রের মনে অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। আরব্য উপন্যাসের গল্পের মতো সকল অসম্ভব নিমেষের মধ্যে সম্ভব হইল; কিন্তু এত আনন্দেও যেন কি অভাব তাহাকে 'অভিভূত করিল। আজ যখন দেখিল, আর তাহার সহানুভূতির প্রয়োজন নাই, তখন ধীরে-ধীরে একটা গভীর বিষাদের ছায়া তাহার অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন করিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। যোগেন্দ্র নিঃশব্দে দালান হইতে নামিয়া আসিল, এবং ধীরে ধীরে রজনীর অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল।

২৪শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবন ১৩২০

তিনুর বুদ্ধি

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য



দামুর বড় দুঃখ যে, ছোটভাই তিনুর বুদ্ধি হইল না।

মা-মরা ছেলে, সুতরাং তিনু শুধু বাপের নয়, বড়ভাই দামুরও খুব আদরের ছিল। তারপর বাপ মারা গেল, কিন্তু তাহাতে তিনুর আদরের মাত্রা কম হইল না, বরং একটু বাড়িল। দামু নিজে নিরক্ষর ছিল, নাম সহি করিতে জানিত না। খাজনার দাখিলা অন্য লোককে দিয়া পড়াইয়া লইতে হইত। এ জন্য তিনু সাত বছরে পড়িলে দামু তাহাকে পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দিল। এক বৎসর পাঠশালায় যাতায়াত করিয়া তিনু 'আঙ্ক আঙ্ক'র দাগা, এবং বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ শেষ করিল। কিন্তু যখন দ্বিতীয়, তিগ্ম, বাগ্মী'র মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল, এবং পাড়ার সমবয়স্ক বালকগণকে কপাটি খেলা এবং পক্ষিশাবকের অন্বেষণে স্বচ্ছন্দচিত্তে দিন কাটাইতে দেখিল, তখন সে পাঠশালা ছাড়িয়া উহাদের মতো স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। দামু কিন্তু ছাড়িল না; নূতন কাপড় দিয়া, মোয়া-বাতাসার লোভ দেখাইয়া, তাহাকে পাঠশালায় দিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু পাঠে অমনোযোগিতার জন্য যেদিন গুরুমহাশয়ের নির্ম্মম বেত্রাঘাত-চিহ্ন তাহার পৃষ্ঠদেশে কালশিরা অঙ্কিত করিয়া দিল, সেইদিন লেখাপড়া অপেক্ষা প্রাণটা মূল্যবান জ্ঞান করিয়া দামু ভাইকে পাঠশালা হইতে ছাড়াইয়া লইল। তিনুর যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল।

দামু চাষার ছেলে, চাষই তাহার উপজীবিকা। সুতরাং তিনু একটু বড় হইয়া উঠিলে দামু তাহাকে চাষের কাজটা ভালোরকমে শিখাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। তিনু কিন্তু তখন ছিপ, বঁড়শি, পাখির খাঁচা, তাস ও বাঘবন্দী খেলা প্রভৃতি লইয়া এতই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, চাষের কাজে সে আদৌ মনোযোগ দিতে পারিল না। বড়ভায়ের পীড়াপীড়িতে দুই-চারিদিন মাঠে গেল বটে, কিন্তু সেই দুই-চারিদিনের রোদে-জলে এমন সর্দি ও জ্বরে পড়িল যে, দামুকে খোরাকীর ধান বেচিয়া ডাক্তারের দেনা শোধ করিতে হইল। ইহার ফলে তিনু মাঠের খাটুনি হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সে এমনই স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল যে, পাড়ার অনেককে বাধ্য হইয়া বলিতে হইল, 'ওহে দামু, ভাইকে শাসন করো।'

দামুও যে তখন ভ্রাতার শাসনের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করে নাই, এমন নহে, কিন্তু শাসন করিবার উপযুক্ত সবলতা তাহার ছিল না। ভাইকে শাসন করিতে গিয়া দামু নিজেই শাসিত হইয়া পড়িত। একটা চড়া কথা বলিলেই তিনু কাঁদিয়া ভাষাইয়া দিত; তিরস্কার করিতে গেলে সে খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করিত। তখন একগুণ শাসনের পরিবর্তে দশ গুণ আদর করিয়া, একটা চড়া কথার জন্য বিশটা মিষ্ট কথা বলিয়া তাহাকে শান্ত করিতে হইত। কোনও দিন বা মাঠ হইতে ফিরিয়া, বাড়া-ভাত ফেলিয়া, তিনুকে পাড়ায়-পাড়ায় খুঁজিয়া বেড়াইতে হইত। এইরূপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দামু শেষে শাসনের সঙ্কল্প ছাড়িয়া দিল। ভাবিল, 'দূর হোক, যার কপালে যা আছে, তাই হবে। আমার কেন মিছে এ কর্ম্মভোগ।''

দামু শাসনের রাশ ছাড়িয়া দিল বটে, কিন্তু ভ্রাতার পরিণাম-চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিল না। দামু অনেক ভাবিয়া, স্ত্রীর সহিত যুক্তি করিয়া স্থির করিল, তিনুর বিবাহ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত; সংসারের বোঝা ঘাড়ের উপর চাপিয়া পড়িলে তাহাকে বাধ্য হইয়া সংসারের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। দামু একটা বড়গোছের মেয়ে দেখিয়া, খরচপত্র করিয়া, ভ্রাতার বিবাহ দিল। কিছু দেনাও হইল, কিন্তু দামু সেজন্য ভয় পাইল না, দুই ভাইয়ে খাটিলে দেনা শোধ করিতে কয়দিন লাগিবে? দামুর আশা কিন্তু সফল হইল না। বিবাহ হইল, বউ ঘর করিতে আসিল, কিন্তু তিনুর স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হইল না। বরং বিবাহের পর হইতে তিনুর বাবুগিরির মাত্রা যেন একটু বাড়িল। সে একটু বেশি ফিটফাট হইল; মাথায় টেরি কাটিল; পাখি পোষা, কপাটি খেলা ছাড়িয়া-গান বাজনার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। দামু ভ্রাতার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পড়িল। কি করিলে যে ভ্রাতার স্বভাবের পরিবর্তন হইবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।

শুধু একজন দামুকে সহজ উপায় দেখাইয়া দিলেন। তিনি নিকটবাসী উমেশ ঘোষাল। গ্রামের মধ্যে ঘোষালমহাশয়ের মতো পরোপকারী ও ন্যায়নিষ্ঠ লোক আর-একজনও ছিল না। তিনি দিবারাত্র গ্রামের ইতর-ভদ্র সকলেরই হিতচিন্তা করিতেন, এবং কাহাকেও ন্যায়মার্গ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত দেখিলেই অযাচিতভাবে উপস্থিত হইয়া যে কোনও উপায়ে তাহাকে ন্যায়ের সূক্ষ্মপথে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। এ জন্য তাঁহাকে অন্যায়কারীর বিপক্ষে কত মোকদ্দমার তদ্বির করিতে হইত, আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সত্য-মিথ্যা কত কথাই বলিতে হইত। কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ ঘোষালমহাশয় ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জনাই এই সকল কষ্ট অকাতরে সহ্য করিতেন, এবং ইহাতে তিনি যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিয়া সগর্বে বলিতেন, 'উমেশ ঘোষাল বেঁচে থাকতে কেউ যে অন্যায় করে পার পাবে, সেটি হচ্চে না।'

এতদৃশ ন্যায়নিষ্ঠ ঘোষাল মহাশয় ভ্রাতার উপর অন্যায় ব্যবহারকারী তিনুর উপর যে বিরক্ত ও দামুর জন্য ব্যথিত হইবেন, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক। সুতরাং তিনি দামুকে পরামর্শ দিলেন, 'ওহে দামু, ছোঁড়াকে পৃথক করে দাও, ঢিট হয়ে যাবে।'

দামু কিন্তু কথাটা শুনিয়াই এমন একটা বিস্ময়মিশ্র ভীতির ভাব প্রকাশ করিল যে, তিনু ইহা অপেক্ষা শতগুণে অন্যায় অত্যাচার করিলেও সে কখনও এমন কথার কল্পনাও করিতে পারে না।

দামু কল্পনা করিতে না পারিলেও ঘোষালমহাশয় কিন্তু অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারিলেন না। তিনি আর-একদিন দামুকে ডাকাইয়া বেশ একটু কড়া সুরে বলিলেন, 'ওহে, ভায়ের বিয়ে দিতে টাকা ধার নিলে, কিন্তু তিন বছরেও শোধ করবার নামটি নাই যে!'

দামু সবিনয়ে জানাইল যে, দুই বৎসর ফসল ভালো না হওয়ায় সে টাকাটা দিতে পারিতেছে না, কেবল সুদ মিটাইয়া দিয়া আসিতেছে। আগামী বৎসরে ফসল জন্মিলেই সে দেনা মিটাইয়া দিয়া দিবে। ঘোষালমহাশয় কিন্তু তাহার এই অনিশ্চিত আশার উপর নির্ভর করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, 'যদি একমাসের মধ্যে টাকা না দাও, আমাকে নালিশ করতে হবে।'

দামু কাঁদা-কাটা করিতে লাগিল। তখন ঘোষালমহাশয় তাহার উপর সদয় হইয়া, ঋণশোধের একটা সহজ উপায় নির্দেশ করিয়া দিলেন। বলিলেন, 'এক কাজ কর না কেন? তিনে ছোঁড়া তো বসে আছে। তাকে আমার বাড়িতে রেখে দাও, খোরাক-পোষাক

বাদে বছরে তিরিশ টাকা মাইনে হলে দুবছরে তোমারও দেনা শোধ যাবে, আমারও কাজ চলবে।'

বিস্ময়ে শিহরিয়া দামু বলিল, 'কও কথা খুড়োঠাকুর, ও হতভাগাকে রেখে আপনি করবে কি? না-জানে কাজ, না-জানে খাটতে, শুধু বসে-বসে আপনকার ভাত মারবে।'

ঘোষালমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, 'ভাত মারে মারবে, সে আমি বুঝব।' দামু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'ওরে বাপ রে, বামুনের ভাত ফাঁকি দিয়ে খাবে? না খুড়োঠাকুর, জেনেশুনে এমনতর কাজ আমি করতে পারব না।'

আসল কথা, ঘোষালমহাশয়ের বাড়ির ভাত খাওয়া যে কত শক্ত ব্যাপার, তাহা সে বাড়িতে যে চাকরি করিয়াছিল, সেই বুঝিয়াছিল। এজন্য তাঁহার কাছে চাকর প্রায় টিকিত না। দামু ইহা জানিত। জানিয়া-শুনিয়া সে ভাইকে এমন জায়গায় রাখিতে পারিল না।

ঘোষালমহাশয় ইহাতে দামুর উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তিনি যে একমাসের মধ্যেই টাকা আদায় না করিয়া ছাড়িবেন না, এমন ভয়ও দেখাইলেন। দামু অনন্যোপায় হইয়া দেড় বিঘা জমির প্রজা-স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ঘোষালমহাশয়ের টাকা ফেলিয়া দিল।

ঘোষাল টাকা পাইলেন বটে, কিন্তু দামুর মতো মূর্খ চাষাকে জব্দ করিবার উপায় অন্বেষণে বিরত রহিলেন না।

॥ ২ ॥

'তিনে, ওরে তিনে, ও হতভাগা!'

তিনে ওরফে তিনকড়ি তখন আহারান্তে তেঁতুল গাছের ছায়ায় বসিয়া খড়েব আগুন জ্বালিয়া ছিপ সেঁকিতে ব্যস্ত ছিল, এমন সময় বড়ভাই দামু মাঠ হইতে ফিরিয়া কাঁধের লাঙলটা নামাইতে নামাইতে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, 'তিনে, ওরে তিনে, ও হতভাগা!'

তিনকড়ি তখন ডানচোখ বুজিয়া বাঁচোখের সোজাসুজি ছিপটাকে ধরিযা তাহার কোনখানে কতটুকু বাঁক আছে, গভীর মনোযোগেব সহিত তাহাই পরীক্ষা করিতেছিল। সুতরাং সে জ্যেষ্ঠের আহ্বানে কর্ণপাত করিবার অবকাশ পাইল না। ভ্রাতার এই গভীর উপেক্ষায় ক্রুদ্ধ হইয়া দামু চিৎকার করিয়া বলিল, 'ওরে তিনে, ও মুখপোড়া, কানের মাথা কি খেয়েছিস?'

তিনকড়ি উদাসভাবে উত্তর দিল, 'হুঁ'।

দামু বলিল, 'হুঁ? নিজে পেট ঠান্ডা করে ছিপ নিয়ে বসেছ, আব গরুগুলো এই দুপুর-রোদে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে? দাঁড়াও হতভাগা, তোমাকে মাছ খাওয়াচ্চি।'

তিনু নির্বাণপ্রাপ্ত অগ্নিতে একমুঠা খড় গুঁজিয়া দিয়া তাহাতে ফুৎকাব প্রদান করিতে-করিতে বিরক্তির সহিত উত্তর দিল, 'আঃ, কেন বক্‌বক্‌ কচ্চো?'

মাঠের খাটুনি ও রোদে দামুর মাথাটা একেই গরম হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর অকর্মণ্য ভ্রাতার বিরক্তিপূর্ণ উত্তরে তাহা আরও গরম হইয়া উঠিল। সে রাগে চিৎকার করিয়া বলিল, 'কি আমি বক-বক কচ্চি? তবে রে মুখপোড়া?'

দামু দ্রুত গিয়া ছিপখানা তুলিয়া লইল। তিনুর চোখদুইটা খড়ের ধোঁয়ায় লাল হইযা উঠিয়াছিল; সেই লাল চোখদুটা তুলিয়া সে গর্জন করিয়া বলিল, 'দেখে, ছিপ ভাঙলে ভালো হবে না, বলচি।'

দামু দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ধরিল, এবং ছিপখানার মাঝে পা দিয়া মড়-মড় করিয়া তাহা ভাঙিয়া ফেলিল। বহু কষ্টে সংগৃহীত প্রস্তুতপ্রায় ছিপখানকে ভাঙিতে দেখিয়া তিনু রাগে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। সে লাফাইয়া উঠিয়া দামুকে একটা ধাক্কা দিল। দামু পড়িতে-পড়িতে রহিয়া গেল। তাহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত রাগে কাঁপিয়া উঠিল। সামনেই একটা বাঁশের মুগুর পড়িয়াছিল। মুগুরটা তুলিয়া লইয়া দামু সবলে ভ্রাতার মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। মুগুর আসিয়া তিনুর মাথায় পড়িল। তিনু দুই হাতে মাথা চাপিয়া, 'বাবা গো!' বলিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার হাতের পাশ দিয়া দর-দর করিয়া রক্তধারা গড়াইতে লাগিল। ছোটবউ বড়বউ—দুইজনেই সদর-দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ছোটবউ চিৎকার করিয়া উঠিল, 'ওরে বাবারে, খুন কল্লে রে!'

দামু ভয়ে-বিস্ময়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নিকটেই উমেশ ঘোষালের বাড়ি। ঘোষাল মহাশয় তখন মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে আচমন করিতেছিলেন। ছোটবউয়ের চিৎকার কানে গেনে তিনি বাঁহাতে গাড়ু এবং ডানহাতে খড়কে লইয়াই ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া তিনি তিনুর অবস্থা দর্শনে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বলিলেন, 'কি সর্বনাশ! মারলে কে? দামু?'

তিনু রক্তমাখা হাত দুইটা দিয়া ঘোষালমহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল; কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, 'খুড়োঠাকুর গো, আমাকে খুন করেছে গো!'

ঘোষালমহাশয় দামুর মুখের উপর ক্রুদ্ধ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'এ কি হে দামু, আমি তো তোমাকে সাদাসিধে লোক বলেই জানতাম। তুমি এমন খুনে-বদমাস?'

ভায়ের মাথা হইতে রক্তপাত হইতে দেখিয়া দামু হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। ভায়ের রক্তে তাহার রাগের আগুনটা একেবারে ছাই হইয়া গিয়াছিল। এখন ওই মুগুরটা তুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় মারিবে, কি তাহার আগে ডাক্তার ডাকিতে ছুটিবে, ইহাই স্থির করিতেছিল। এমন সময় ঘোষালমহাশয়ের কথা শুনিয়া তাহার ক্রোধাগ্নিটা আবার ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রাগে চোখ পাকাইয়া বলিল, 'দেখো খুড়োঠাকুর, মুখ সামলে কথা কও।'

ঘোষালমহাশয় গর্জন করিয়া বলিলেন, 'বটে? কেন হে বাপু, এটা মগের মুল্লুক নাকি? তুমি একজনকে খুন করবে, আর আমি দাঁড়িয়ে তাই দেখব? তুমি এত বড় বাহাদুর হয়ে পড়েছ নাকি?'

ক্রুদ্ধকণ্ঠে ঘোষাল মহাশয় ডাকিলেন, 'চিন্তে, চিন্তে।'

ঘোষালমহাশয়ের চাকর চিন্তামণি ছুটিয়া আসিল। ঘোষালমহাশয় তাহাকে আদেশ দিলেন, 'ছুটে গিয়ে একখানা ডুলি ডেকে নিয়ে আয়। যাবার সময় আমীর সাহেবকে আর নসে চৌকিদারকে ডেকে নিয়ে যাবি। শিগগির যা।'

চিন্তামণি ছুটিয়া চলিয়া গেল। দেখিতে-দেখিতে অনেক লোক আসিয়া জুটিল। নসীরাম চৌকিদার আসিল; পঞ্চায়তের প্রেসিডেন্ট আমীরুদ্দিন সাহেব আসিলেন। ডুলি আসিয়া পঁহুছিল। ঘোষালমহাশয় আহত তিনুকে ডুলিতে তুলিয়া মহকুমায় পাঠাইয়া দিলেন, এবং অল্পক্ষণ পরে নিজে ছাতা-চাদর লইয়া ডুলির অনুসরণ করিলেন।

লোকজন সব চলিয়া গেল। দামু তখনও নিঃস্পন্দভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। বড়বউ আসিয়া তাহার হাত ধরিল; বলিল, 'ঘরে এস।'

দামু শূন্য-উদাসদৃষ্টিতে বড়বউয়েব মুখের দিকে চাহিল। বড়বউ তাহাকে টানিয়া বাড়িতে লইয়া আসিল।

॥ ৩ ॥

দুই দিনেও তিনু ফিরিল না দেখিয়া দামু যখন তাহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং পরদিন সকালে উঠিয়া মহকুমায় যাইবে কিনা, বড় বউয়ের সহিত তাহার পরামর্শ করিতেছিল, তখন সন্ধ্যার সময় তিনু মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া গম্ভীরভাবে বাড়ি ফিরিল। দামু উল্লসিতভাবে ছুটিয়া তাহার কুশলসংবাদ ও বিলম্বের কাবণ জিজ্ঞাসা কবিল। তিনু বিরক্তভাবে সংক্ষেপে তাহার জিজ্ঞাসাব উত্তব দিযা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। রাত্রিতে বড়বউ তাহাকে খাইবার জন্য ডাকিলে, ছোটবউ আহ্লাদী উত্তর দিল, 'মাথা ধরেছে, কিছু খাবে না।' দামু খোকার দুধটুকু গরম কবিয়া তাহাকে দিতে বলিল।

পরদিন সকালে ঘোষালমহাশয তামাক টানিতে-টানিতে আসিয়া দামুব চালায বসিলেন, এবং তিনুকে একছিলিম কড়া তামাক সাজিবাব আদেশ দিয়া দামুকে জানাইলেন যে, তাহাব কনিষ্ঠ ভ্রাতা সকলেব নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাহাব নামে নালিশ রুজু করিয়াছে, এবং এইজন্যই সে আব এখানে থাকিতে ইচ্ছুক নহে। দামু ম্লানমুখে বসিয়া কথাগুলা শুনিতে লাগিল। ঘোষালমহাশয় তখন কলিকালে ধর্মেব তিরোভাব ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব কীর্তন করিয়া বলিলেন যে, তিনি এরূপ অপ্রিয় কার্যেব সহিত লিপ্ত থাকিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হইলেও তিনু কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়ে নাই, ভাগ বাঁটবা করিযা দিবার জন্য তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদা-কাটা কবিয়াছে। ঘোষালমহাশযের হৃদয় নিতান্ত কোমল; পরের ক্রন্দন তিনি সহ্য করিতে পারেন না, অগত্যা তিনি এই প্রস্তাবে বাজি হইযাছেন। দামু যেন এজন্য মনে কষ্ট অনুভব না কবে।

দামু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু-হাসিয়া উত্তর করিল, 'ও ছোঁড়ার কথা ছেড়ে দাও খুড়োঠাকুর, ছেলের বাপ হতে চলল, কিন্তু ওর বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছু হল না।'

গম্ভীরভাবে ঘোষালমহাশয় বলিলেন, 'বুদ্ধি নাই কেন হে, মামলার আর্জি লেখবার সময় মোক্তার যখন বললে, রাগের মাথায় ভাযে-ভাযে মারামারি, তা এর এমন কি সাজা হবে? তাতে ও বললে কি জান?'

সাগ্রহে দামু জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বললে খুড়োঠাকুর?'

একটু সোজা হইয়া বসিয়া ঘোষালমহাশয় বলিলেন, 'বললে, রাগের মাথায় মারামারি বলব কেন, আমি বিষয়ের ভাগ চেয়েছিলাম, তাইতে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। দেখলে একবার বুদ্ধিটা? ২০৮ ধারা হতে একেবারে ১১১ ধারা।'

উৎসুকদৃষ্টিতে ঘোষালমহাশয়ের দিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রফুল্লহাস্যে দামু বলিল, 'এমন কথা বললে?'

ঘোষালমহাশয় গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। দামু বলিল, 'তা হলে ওর একটু বুদ্ধি হয়েছে, কি বলো খুড়োঠাকুর?'

তিনু কলিকায় ফুঁ দিতে-দিতে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। দামু তাহার মুখের উপর প্রফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁরে তিনে, তুই আলাদা হ'বি?'

তিনু নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। দামু বলিল, 'কিন্তু খাবি কি?'

বিরক্তির সহিত তিনু উত্তর করিল, 'হাতি ঘোড়া।'

ঘোষালমহাশয় বলিলেন, 'আমি কি মিথ্যা বলছি হে দামু, না এতে আমার কোনও স্বার্থ আছে? তোমাব মনটা কিন্তু বড় অশুদ্ধ।'

দামু মস্তক নত করিল। ঘোষালমহাশয় তিনুর হাত হইতে কলিকা লইয়া হুঁকার মাথায় বসাইতে-বসাইতে বলিলেন, 'তিনু আমার উপরেই ভার দিয়েছে। এখন তোমার বিশ্বাসী লোক একজন ডাকতে পার।'

ঈষৎ ভগ্নস্বরে দামু বলিল, 'আজই?'

ঘোষালমহাশয় বলিলেন, 'হাঁ। তিনু বলছে কি জান? যখন তোমার সঙ্গে মামলা চলছে, তখন কি একসঙ্গে খাওয়া ভালো দেখায়? এতে শুদ্ধ চক্ষুলজ্জা নয়, মামলাটাও খেলো হয়ে যেতে পারে।'

তিনুর এই বুদ্ধিমত্তা-দর্শনে দামু চমৎকৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'ঠিক কথা খুড়োঠাকুর, আমার মাথায় এতটা আসেনি।'

দামু ভ্রাতার মুখের উপর প্রশংসাসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তিনু মুখ ফিরাইয়া লইল। দামু বলিল, 'আমার আর-কাউকে বিশ্বাস নাই খুড়োঠাকুর, তুমিই যা হয় করে দাও।'

হুঁকায় একটা জোর টান দিয়া ঘোষালমহাশয় বলিলেন, 'বেশ, আমার উপরেই যখন তোমার বিশ্বাস, তখন আমিই সব ঠিক করে দিচ্চি। পক্ষপাতটি আমার কাছে পাবে না দামু, আমার কাছে তুমিও যেমন, তিনুও তেমনই।'

সুতরাং সর্বত্র সমদর্শী ঘোষালমহাশয়ের কর্ত্তৃত্বে বিভাগ-কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল। ভাগের সময় তিনু তেমন উৎসাহ দেখাইল না, কিন্তু দামু খুব উৎসাহের সহিত তাহাতে যোগ দিল, এবং মনসাতলার আওল জমা তিন বিঘা ও বড় কেলে দামড়াটা তিনুর ভাগে ফেলিয়া দিল।

কয়েকদিন পরে দামুর নামে শমন আসিল। দামু ঢেরা সই দিয়া শমন লইল, এবং তিনুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাকে মুক্তার দেওয়া যায় বলতো তিনু?'

তিনু দাঁতে দাঁত চাপিয়া উত্তর করিল, 'যমকে।'

দামু হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, তিনু দ্রুতপদে বাড়ির বাহির হইয়া গেল। বড়বউ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া তীব্রস্বরে বলিল, 'আহা, হাসতে লজ্জাও করে না!'

দামু তথাপি হাসিয়া উত্তর দিল, 'বুঝছো না বড়বউ, তিনের এবার বুদ্ধি হয়েছে।'

'তোমাব মাথা হয়েছে' বলিয়া বড়বউ স্বকার্যে মনোনিবেশ করিল। দামু ভাবিতে লাগিল, তিনুর বুদ্ধির আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে বড়বোয়ের বুদ্ধিটা তিরোহিত হইল নাকি?

বড়বউ কিন্তু স্বামীর ন্যায় সহিষ্ণু ছিল না, এবং তিনুর বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্যদর্শনের নিমিত্তও তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। সুতরাং সে তিনুর সমক্ষেই দুগ্ধদানে পোষিত কালসর্পের সহিত তাহাকে তুলিত করিয়া যেসকল কথা বলিত, তাহাতে তিনু মনে মনে গর্জন করিয়া বড়বউকে কালসর্পের বিষের জ্বালা অনুভব করাইবার নিমিত্ত মনে-মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত।

নির্দিষ্ট দিনে আদালতে মোকদ্দমা উঠিল। ন্যায়পরায়ণ ঘোষালমহাশয়ের তদ্বিরের ত্রুটি ছিল না; সুতরাং সাক্ষ্য-প্রমাণাদি দ্বারা দামুর অপরাধ প্রমাণিত হইয়া গেল। দামুও অপরাধ অস্বীকার করিল না। সে যে ভাইকে মারিয়াছে, এবং অবাধ্য ভাইকে শাসন করিবার অধিকার তাহার রীতিমত আছে, ইহা বিচারকের সমক্ষে তাহা স্পষ্ট স্বীকার

করিল। বিচারক কিন্তু তাহার অধিকার-অনধিকারের বিচার করিলেন না, তিনি অবৈধ প্রহারের অপরাধে দামুর ত্রিশ টাকা অর্থদণ্ড করিলেন। অনাদায়ে ছয় সপ্তাহ সশ্রম কারাবাসের হুকুম হইল।

দামুর কাছে টাকা ছিল না। নিজমুখে অপরাধ স্বীকার করায় মোক্তার তাহার উপর চটিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি জামিন হইলেন না। প্রহরী দামুকে হাজতে লইয়া গেল। তিনু স্তব্ধভাবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আদালতের বাহিরে আসিল।

বাহিরে আসিয়া তিনু মাথায় হাত বুলাইয়া দেখিল, সেখানে আর আঘাতের বা বেদনার চিহ্নমাত্র নাই। আজ সে শুধু বুকের ভিতর একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। সে ঘোষালমহাশয়ের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে বাড়ির দিকে চলিল।

রাত্রি প্রায় একপ্রহরের সময় তিনু চোরের মতো পা টিপিয়া-টিপিয়া বাড়িতে ঢুকিতেই দেখিতে পাইল, বড়বউ আলো জ্বালিয়া দাবার উপর বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই বড়বউ জিজ্ঞাসা করিল, 'কে, ঠাকুরপো?'

গম্ভীরস্বরে তিনু উত্তর করিল, 'হুঁ।'

'তোমার দাদা আসছে?'

তিনু নিরুত্তরে আপনার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। বড়বউ তাড়াতাড়ি উঠানে নামিয়া উদ্বেগকম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার দাদা কোথায় রইলো ঠাকুরপো?'

বিকৃতকণ্ঠে তিনু উত্তর করিল, 'জেলে।'

উত্তর করিয়াই তিনু দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল; বড়বউ চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ছোটবউ স্বামীর সম্মুখীন হইয়া শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁ গা, সত্যি বড়ঠাকুরের জেল হইয়াছে?'

তিনু ঘরের দরজা বন্ধ করিতে-করিতে কর্কশকণ্ঠে বলিল, 'হাঁ হয়েছে, তার কি হবে?'

ছোটবউ আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

পরদিন সকালে ঘোষালমহাশয় মোকদ্দমার খরচপত্র বাবদ নিজ তহবিল হইতে প্রদত্ত টাকার হ্যান্ডনোট বা তমশুক লিখাইয়া লইবার জন্য, এবং সাক্ষীদের নিকট প্রতিশ্রুত একটা খাসির দাম আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনুকে ডাকিতে আসিয়া শুনিলেন যে, ভোরের সময় উঠিয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

সেই দিন কাছারি বন্ধ হইবার পূর্বেই তিনু জরিমানার টাকা জমা দিলে, দামু মুক্তি পাইল। বাহিরে আসিয়া দামু বলিল, 'আমি সারাটা দিন হাপিত্যেশ করেছিলাম তিনু, বলি তিনে এই আসে, এই আসে।'

তিনু কোনও উত্তর না দিয়া গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইল। দামু তাহার পশ্চাৎ যাইতে-যাইতে বলল, 'কিন্তু এতগুলো টাকা তুই কোথায় পেলি? খুড়োঠাকুরের কাছে খত দিয়েছিস্ নাকি?'

তিনু উত্তর করিল, 'না, ছোটবউয়ের হাতের রূপোর চুড়ি কগাছা, কানের পাশাদুটা, আর কোমরের রেটছড়াটা বদনগঞ্জের হরি পোদ্দারের দোকানে বেচে এসেছি।'

দামু বলিয়া উঠিল, 'করেছিস্ কি রে হতভাগা, একখানা জিনিস কত কষ্টে হয়, আর তুই তিন তিনখানা জিনিস বেচে এলি?'

জোরগলায় তিনু বলিল, 'বেশ করেছি—বেচেছি। তুমি আমাকে মারতে পার, আর আমি জিনিস বেচতে পারি না? তবু এখনো খুড়োঠাকুরের কাছে মামলার দেনা আছে।'

'সে দেনা শুধবি কিসে?'

'দু ভায়ে খেটে।'

উৎফুল্লকণ্ঠে দামু বলিল, 'অ্যাদ্দিনের পর দেখছি তোর বুদ্ধি হয়েছে।'

রোষ-গম্ভীরকণ্ঠে তিনু বলিল, 'তা হয়েছে, কিন্তু আবার যদি মার, তা হলে আবার আমি—'

দামু জিজ্ঞাসা করিল, 'আর তো বউয়ের গায়ে গয়না নাই, আর কি বেচবি?'

তিনু বলিল, 'আর কিছু না থাকে, বউকে বেচব।'

'দুর হতভাগা! নাঃ, তোর কোনওকালেই বুদ্ধি হবে না তিনে!'

দামুর উৎফুল্ল হাস্যধ্বনিতে প্রান্তর-পথ মুখরিত হইয়া উঠিল।

২৮বর্ষ ৯ম সংখ্যা, পৌষ